বাঙলার কথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক

শ্রীনিশীথ রঞ্জন রায়

কর্তৃক পরিদৃষ্ট ও পরিমার্জিত

শ্রী জে. চট্টোপাধ্যায় এম. এ. প্রণীত



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

BANGLAR KATHA

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়,
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : কার্ত্তিক, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :—
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
মুদ্রণ ভারতী প্রাইভেট লিমিটেড
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৯

নিবেদন

'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি'—এ অপবাদ অনেক দিনের। অবশ্য সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ সম্পর্কে ইতিহাস বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে সাধারণ পাঠক পাঠিকা, বিশেষতঃ কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী সমগ্র বাংলাদেশের ইতিহাস লিখিত হয় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের দেশ ও জাতির ইতিহাসের সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। পরিতাপের বিষয়, আমরা এতদিন আমাদের কিশোর-কিশোরীদের এই সুযোগ হইতে অনেকখানি বঞ্চিত রাখিয়াছি। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙলাদেশ আজ দ্বি-খণ্ডিত—সুতরাং সমগ্র বাঙ্‌লার চিত্র আমাদের মন হইতে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বাঙলা-বিভাগ নিঃসন্দেহেই এক কঠোর সত্য। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও মহত্তর সত্য বাঙালী জাতি এক ও অভিন্ন, তা' সে পূর্ব বা পশ্চিম যে-কোন বাঙলাতেই বাস করুক না কেন। বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতির সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যেই 'বাঙলার কথা' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল—ইহাতে স্বল্প আয়তনের মধ্যে এবং সহজ ভাষায় সমগ্র বাংলাদেশের ভূগোল ও ইতিহাসের কথা নিবেদিত হইয়াছে। কিশোর-কিশোরী ছাড়াও বাঙলাদেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার যাঁহারা অনুরাগী, এবং বাঙলাদেশের কথা জানিবার জন্য যাঁহারা আগ্রহশীল তাঁহারাও এই স্বল্পায়তন গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাঁহাদের কৌতূহল অনেকখানি নিবৃত্ত করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

"বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।"

বাঙলার কথা

প্রাচীন যুগ

সোনার বাঙলা

'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।'

এক সময়ে বাঙলা ছিল সত্যই সোনার বাঙলা। তখন বাঙলার উর্বর মাটিতে ফলিত অফুরন্ত সোনার ফসল। সে যুগে বাঙলার শস্যশ্যামল মনোহর রূপ লোকের মনে বিস্ময়-মিশ্রিত পুলকের সঞ্চার করিত। বাঙলার অপরিমেয় ধন-সম্পদ্ ও স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া কত বিদেশী পর্যটক উচ্ছ্বসিত ভাষায় উহার বর্ণনা করিয়াছেন। সে যুগে বাঙলার অনুপম সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের খ্যাতি শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে উহা সর্বত্র জনপ্রবাদের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি বাঙলার এই অফুরন্ত ঐশ্বর্যের লোভে আকৃষ্ট হইয়াই এ দেশে আধিপত্য স্থাপনের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিল। ইংরেজ যে একসময়ে সমগ্র পৃথিবীতে ঐশ্বর্যের দিক্ হইতে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা উহা লাভ করিয়াছিল কোথা হইতে? প্রধানতঃ বাঙলা রূপ কামধেনু দোহন করিয়াই তাহারা উহা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হায়, তাহাদের সীমাহীন লোভ ও নির্মম অত্যাচারের ফলে কামধেনুটির অপমৃত্যু ঘটিল। সোনার বাঙলা দেখিতে দেখিতে প্রায় শ্মশানে পরিণত হইল।

ইংরেজদের চক্রান্তে আজ বাঙলা দ্বিখণ্ডিত। তাই আজ আর বাঙলাকে দেখিয়া চেনার সাধ্য নাই। তাহার রূপ একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছে। ভারতের মানচিত্রে এতদিন বাঙলার নাম ছিল অনেকখানি স্থান জুড়িয়া। কিন্তু এখন আর বাঙলা নাম খুঁজিয়াই

পাওয়া যাইবে না। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান এই দুইটি নাম উহার স্থান অধিকার করিয়া আছে। কোন প্রাকৃতিক ব্যবধানই নাই বাঙলার এই দুইটি অংশের মধ্যে। তবুও আজ তাহারা পরস্পরের নিকট বিদেশ,—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, প্রভৃতি রাষ্ট্র যেমন বিদেশ ঠিক তেমনই বিদেশ।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী,—ভারত-রাষ্ট্রের নাগরিক। আমাদের সম্মুখে অসংখ্য সমস্যা,—উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সমস্যা এবং আরও বহু জটিল সমস্যা। ইহার প্রত্যেকটিই অত্যন্ত গুরুতর। এগুলির সন্তোষজনক সমাধানের উপর নির্ভর করিতেছে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি।

আমরা কি সমস্যার বিপুলতা ও জটিলতা দেখিয়া হতাশহৃদয়ে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিব? ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাপানের অস্তিত্বই পৃথিবীর বুক হইতে লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই মুমূর্ষু জাপান আবার কখনও মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিতে সক্ষম হইবে। আজ কিন্তু জাপান পৃথিবীর অন্যতম শক্তিমান্ ও সম্পদ্শালী দেশ বলিয়া স্বীকৃত। জাপান কিরূপে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করিয়া তুলিল? জাপানীরা যেমন পরিশ্রমী তেমনি অধ্যবসায়ী। ইহার চেয়েও বড় কথা, তাহারা অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিক। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তাহারা না করিতে পারে এমন কাজ নাই। এই স্বদেশপ্রেমিক, কর্মঠ জাতি "এক মন, এক প্রাণ" হইয়া বিধ্বস্ত জাপানের পুনর্গঠনের সুকঠিন কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। তাই তাহারা এ বিষয়ে অল্পকাল মধ্যে সাফল্যের গৌরব অর্জন করিল।

আমরা কি জাপানীদের এই মহৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হইব না? নিশ্চয়ই হইব।

বাঙলা নাই। কিন্তু পশ্চিম বাঙলা আছে, আমাদের সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই পশ্চিম বাঙলাই অদূর ভবিষ্যতে পরিচিত হইয়া উঠিবে 'সোনার বাঙলা' নামে।

বাঙলা নামের উৎপত্তি ঃ
বাঙলার প্রাচীনতম জাতি অস্ট্রিকদের কথা

প্রাচীন কালে সমগ্র বাঙলা জুড়িয়া একটি অখণ্ড রাজ্য ছিল না। বাঙলা ছিল তখন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই রাজ্যগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, বঙ্গ, রাঢ় ও গৌড়। ইহাদের সীমানা কিন্তু বরাবর এক ছিল না, কখনও ইহা বাড়িয়াছে কখনও কমিয়াছে। আবার একই অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে।

আমরা এখন আলোচনা করিব 'বঙ্গ' সম্বন্ধে। এক সময়ে এই 'বঙ্গ' রাজ্যের সীমানা ছিল পশ্চিমে ভাগীরথী নদী, উত্তরে পদ্মা নদী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র। বাঙলা নামের উৎপত্তি হইয়াছে সম্ভবত এই 'বঙ্গ' হইতে। সম্রাট্ আকবরের বিখ্যাত সভাসদ্ আবুল ফজল বলেন, বঙ্গ রাজ্যের রাজারা দেশের নানা স্থানে দশ ফুট উচ্চ এবং কুড়ি ফুট প্রস্থ এরূপ আল নির্মাণ করিতেন। এই কারণে 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল' যোগ করিয়া দেশটির নাম বঙ্গাল বা বাঙ্গাল, অর্থাৎ বাঙলা হইয়াছে। আবুল ফজলের এই উক্তি কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহা অবশ্য সঠিক বলা যায় না।

একটু আগে বলিয়াছি পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ), বরেন্দ্র (উত্তর বঙ্গ), রাঢ় (পশ্চিম বঙ্গ), গৌড় প্রভৃতি রাজ্যের নাম। এই নামগুলি ক্রমশ লুপ্ত হইয়া গেল এবং সমগ্র দেশটি বাঙলা নামে পরিচিত হইল। এক সময়ে গৌড় বলিতে পশ্চিমবঙ্গের কিছুটা অঞ্চলকে বুঝাইত। পরে কিন্তু গৌড় বলিলে লোকে সমগ্র বঙ্গদেশকেই বুঝিত।

অস্ট্রিকদের কথা—অতি প্রাচীন কালে বাঙলায় বাস করিত অস্ট্রিক নামে এক বলিষ্ঠ জাতি। ইহারা ছিল অনার্য। বর্তমান কালে বাঙলায় হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সব আদিম জাতি দেখা যায় তাহাদের পূর্বপুরুষেরা হইল এই অস্ট্রিক জাতির মানুষ। অনার্য হইলেও ইহারা কিন্তু বেশ কিছুটা সভ্য ছিল। হাড়, পাথর প্রভৃতি দিয়া ইহারা তীক্ষ্ণ অস্ত্র তৈয়ারী করিতে পারিত। তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহারও ইহারা জানিত। চাষ বাসের কাজে ইহারা ছিল খুবই নিপুণ, ব্যবসা বাণিজ্যেও ইহাদের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। আমাদের দেশে এক গণ্ডা, দুই গণ্ডা, এক কুড়ি, দুই কুড়ি—এই যে গণনার পদ্ধতি তাহা আমরা শিখিয়াছি অস্ট্রিকদের কাছ হইতে। বাঙ্গালী বিবাহিতা হিন্দু নারীরা সিঁথিতে সিন্দুর পরেন। সিন্দুর তাঁহাদের অঙ্গের একটি প্রধান ভূষণ। এই ভূষণ তাঁহারা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেন অস্ট্রিকদের কাছ হইতে। বিবাহের সময়ে যে-সব স্ত্রী-আচার আমাদের দেশে হিন্দু পরিবারে পালিত হয় তাহার অনেক-গুলিই এই অনার্য জাতির নিকট হইতে শেখা। সব চেয়ে বড় কথা, জ্যোতিষ শাস্ত্রের দুই একটি বড় বড় বিষয়, যেমন চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবৎসর গণনা পদ্ধতি, এই অস্ট্রিক জাতিই আবিষ্কার করে। সুতরাং এ কথা দৃঢ়তার সহিতই বলা চলে, বাঙলার প্রাচীন অধিবাসিগণ অনার্য ছিল সত্য, কিন্তু সভ্যতার মাপকাঠিতে তাহাদের স্থান ছিল বেশ কিছুটা উচ্চে।

আর্যদের বাঙলায় আগমন : বাঙলার অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক

আর্যেরা কখন ভারতে আসেন এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও নির্ণীত হয় নাই। ভারতে আসার পরে তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। পূর্বে ভাগলপুর পর্যন্ত আসিয়াই তাঁহারা থামিয়া গেলেন। এই সময়ে বাঙলা দেশে বাস করিত পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্ম প্রভৃতি অনার্য জাতি। ধীরে ধীরে ইহাদের

সঙ্গে আর্যদের ক্ষীণ পরিচয় ঘটিল। ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার সবই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তাই আর্যেরা ইহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে। ইহাদের সঙ্গে মেলা-মেশা ত দূরের কথা, তাঁহারা ইহাদের ছায়াও স্পর্শ করিতেন না। তীব্র অবজ্ঞাভরে তাঁহারা ইহাদের নাম দিলেন দস্যু। ইহাদের ভাষা ছিল তাঁহাদের নিকট দুর্বোধ্য, তাই তাঁহারা ইহাদের আর একটি নাম দিলেন ভাষাহীন পক্ষী।

সম্ভবত কিছু সংখ্যক আর্য খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বেই আর্যাবর্তের মধ্য দেশ হইতে আসিয়া বাঙলা দেশে বাস করিতে শুরু করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে তাঁহাদের সংখ্যা বেশ কিছুটা বাড়িল। ইচ্ছা না থাকিলেও এক দেশে এক সঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করিলে পরস্পরের মধ্যে জানাশুনা এবং মেলামেশা হইবেই। দেখিতে দেখিতে বাঙলায় আর্যে-অনার্যে অবাধ মেলামেশা শুরু হইল। ফলে একদিকে যেমন অনার্যেরা আর্যদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার শিখিয়া উন্নত হইল, অপর দিকে তেমনি অনার্যদের কতকগুলি রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার শিখিয়া আর্যেরা কতকগুলি বিষয়ে ভিন্নতর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ফলে আর্যাবর্তের আর্যেরা দারুণ ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহারা নির্দেশ দিলেন কেহ তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছাড়া অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি অনার্য দেশে গেলে তাহাদিগকে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বাঙলাকে আর্যেরা যে কতখানি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় এই একটি মাত্র নির্দেশ হইতেই।

কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের এই ঘৃণার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। আর্যদের কাছে বাঙলার মর্যাদা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। রামায়ণে উল্লিখিত কয়েকটি ঘটনাতেই আমরা ইহার প্রমাণ পাই। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবে। চতুর্দিকে মহা ধূমধাম। কিন্তু কুটিলা মন্থরার পরামর্শে দশরথের প্রিয়তমা মহিষী কৈকেয়ী

ক্রোধাগারে গিয়া বিষম কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিয়াছেন। দশরথ ত হতভম্ব! হঠাৎ এ কি হইল? কৈকেয়ীকে শান্ত করিবার জন্য তিনি অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন। এই সময়ে তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার কি ইচ্ছা আমাকে তা একবার খুলিয়া বল ত। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমার বাসনা অবশ্যই পূর্ণ করিব। 'পৃথিবীতে যতদূর চন্দ্র-সূর্য কিরণ দান করে, ততদূর পর্যন্তই ত আমার অধিকারে। সমৃদ্ধিশালী দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ এবং কাশী ও কোশল প্রভৃতি দেশ আমারই অধিকারে।" দশরথ তাঁহার অধীন অনেকগুলি দেশের মধ্যে মাত্র কয়েকটির নাম করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে বঙ্গ হইল অন্যতম। বঙ্গ যদি উন্নত এবং মর্যাদাসম্পন্ন দেশ না হইত তবে কি তিনি গর্বের সঙ্গে এই দেশের নাম মহিষীর নিকট উচ্চারণ করিতেন?

রামায়ণের কয়েকটি জায়গায় দেখিতে পাই অযোধ্যার অনেক বড় বড় পরিবার বাঙলার অনুরূপ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহাভারতের যুগে বাঙলার মর্যাদা কিরূপ ছিল তাহা এখন দেখা যাউক।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বড় বড় রাজারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন বাঙলার তিন জন রাজা। ইঁহারা হইলেন বঙ্গরাজ, পৌণ্ড্রাজ ও তাম্রলিপ্তরাজ। ইঁহারা বিশেষ খ্যাতিমান না হইলে নিশ্চয়ই এরূপ স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রিত হইতেন না। 'নীচ জাতীয়' এই অপরাধে কর্ণের ন্যায় মহাবীরকেও দ্রৌপদীর কাছে কি বিষ-বাক্যই না সহ্য করিতে হইয়াছিল!

কুরুক্ষেত্রের ভুবন-বিখ্যাত যুদ্ধে বাঙলার কয়েকজন রাজা পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহারা যে অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন মহাভারতে তাহার দীর্ঘ বর্ণনা আছে। ইহা পড়িলে কোন্ বাঙ্গালীর মন গর্বে ভরিয়া না উঠে?

আলেকজাণ্ডারের সময়ে বাঙলা

গ্রীকদের লেখা বিবরণী হইতে জানা যায়, আলেকজাণ্ডার যে সময়ে ভারত অভিযানে আসেন তখন প্রাচ্যে (পূর্বদেশে) গঙ্গারিডি নামে একটি রাষ্ট্র ছিল। এই রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন মহা পরাক্রমশালী। তাঁহার রাজ্য ছিল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজার ন্যায় এই রাজ্যের অধিবাসীরাও ছিলেন বীর যোদ্ধা। ভারতের অন্য কোন জাতিই তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহস পাইত না। তাঁহাদের খ্যাতির কথা গ্রীক্ সৈন্যদের কানেও গিয়া পৌছিল। পাঞ্জাবের রাজ্যগুলি জয় করার পরে আলেকজাণ্ডারের ইচ্ছা হইল তিনি গঙ্গারিডি রাষ্ট্র আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা কিছুতেই রাজী হইল না। ইহার কারণ দুইটি। প্রথম কারণ, গ্রীক সৈন্যেরা যুদ্ধ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ—গঙ্গারিডিদের ন্যায় যোদ্ধ-জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিলে তাহাদের পরাজয় সুনিশ্চিত, এই ভয় তাহাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাই আলেকজাণ্ডারের মুখের উপর তাহারা স্পষ্ট ভাষায়ই জানাইয়া দিল গঙ্গারিডিদের সঙ্গে তাহারা কিছুতেই যুদ্ধ করিবে না। আলেকজাণ্ডারকে তখন বাধ্য হইয়া গঙ্গারিডি-রাষ্ট্র জয়ের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইল।

এই গঙ্গারিডি কাহারা? গ্রীক্ লেখকেরা পশ্চিমবঙ্গের অধি-বাসীদের এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং গঙ্গারিডি বলিতে বুঝায় বাঙ্গালী জাতিকে। বিশ্ববিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর আলেক-জাণ্ডারের সাহস হইল না আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে। ইহা আমাদের পক্ষে কত বড় গৌরবের কথা!

মৌর্যযুগে বাঙলা

হিন্দুযুগে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে মগধ ছিল নানা দিক্ হইতে বিশেষ বিখ্যাত। মৌর্যদের আমলে মগধ-শক্তির ত তুলনাই ছিল না। কোন একজন মৌর্য সম্রাট্ নিজ বাহুবলে বাঙলার উত্তর

অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেন। ইনি কে তাহা সঠিক জানা যায় না। যতদূর মনে হয় অশোকই ছিলেন উত্তরবঙ্গ-বিজয়ী মৌর্য-সম্রাট্।

সে যুগে উত্তরবঙ্গের একটি অঞ্চলের নাম ছিল পুন্দনগল, অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধন। বগুড়া জিলার মহাস্থানগড়ে (প্রাচীন পুণ্ড্রনগরে) একটি ভাঙ্গা শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা। এই লিপিতে জনৈক রাজা পুন্দনগলের শাসনকর্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—পুন্দনগলের ধনাগারে প্রচুর ধন ও শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখা হইল। ভবিষ্যতে কখনও যদি বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অগ্নিদাহ কিংবা এই ধরনের কোন বিপদ আপদ দেখা দেয় তবে উহা হইতে যেন অবশ্যই প্রয়োজন মত ধন ও শস্য ঋণ দিয়া প্রজাদের সাহায্য করা হয়। কে এই মহাপ্রাণ রাজা যিনি প্রজার ভাবী বিপদ সম্বন্ধেও এতটা সচেতন ছিলেন? পণ্ডিতগণ শিলালিপিটি বিশেষ যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইনি আর কেহ নন, প্রজাদরদী মহাপ্রাণ সম্রাট্ অশোক।

শুঙ্গ রাজাদের শাসন কালে বাঙলার কতকাংশ তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাঙলার সর্বত্র শুঙ্গ-শাসন প্রচলিত ছিল—এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সম্রাট্ অশোকের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙলার কোন কোন অঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

মৌর্যোত্তর বাঙলা—পুষ্করণ রাজ্যের কথা

মগধের কাণ্ব ও কুষাণ রাজাদের আমলেও বাঙলার রাজারাই বাঙলা দেশ শাসন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সামান্য। বাস্তবিক পক্ষে এই যুগের ইতিহাস গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

বাঁকুড়া জিলায় সুসুনিয়া নামে একটি পাহাড় আছে। এই পাহাড়ে একটি ক্ষোদিত লিপি দেখিয়া দর্শকগণ চমৎকৃত হন। এই

ধরনের লিপি লুপ্ত হইয়াছে বহু শত বৎসর আগে। তাই ইহার একটি অক্ষরও বুঝিয়া পড়ার উপায় ছিল না। কয়েকজন পণ্ডিত বহু কষ্টে উহা পড়িতে সক্ষম হন। এই লিপি হইতে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে পুষ্করণ নামক রাজ্যের রাজা ছিলেন সিংহবর্মন। তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁহার পুত্র চন্দ্রবর্মন। ইনি ছিলেন বিশেষ শক্তিশালী রাজা। পূর্বদিকে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল ফরিদপুর পর্যন্ত। তিনি চন্দ্রকোট নামক স্থানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজাদের রাজধানী ছিল বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত পোখর্ণায় (প্রাচীন পুষ্করণ)।

প্রাচীন বাঙলার সমৃদ্ধি

এতক্ষণ যে যুগের কথা বলিলাম সে যুগে বাঙলার সম্পদের অন্ত ছিল না। বাঙলার ধন-সম্পদের একটি কারণ হইল, ইহার অফুরন্ত শস্যসম্ভার। দ্বিতীয় কারণ হইল, বৈদেশিক বাণিজ্য। জনৈক গ্রীক লেখকের গ্রন্থ হইতে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গঙ্গারিডিদের প্রধান নগর গাঙ্গে ছিল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। এই বন্দর হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র এবং অন্য নানাবিধ দ্রব্য বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। এই সহরের নিকটেই ছিল অনেকগুলি স্বর্ণখনি। তাই সে-যুগে বাঙলা ছিল সত্য সত্যই সোনার বাঙলা।

বিখ্যাত গ্রীক ভূগোল-বিজ্ঞানী টলেমীর গ্রন্থ হইতে জানা যায় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকেও গাঙ্গে ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী।

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, আর্যদের বাঙলায় আগমনের বহু পূর্ব হইতেই বাঙলা এতটা ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে উহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল দেশ-দেশান্তরে।

গুপ্তযুগে বাঙলা

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগে মগধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। গুপ্ত সম্রাট্‌গণ ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তাঁহাদের আমলে বাঙলা দেশ পুনরায় মগধের অধীন হয়। সম্ভবত দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং বাঙলা দেশের অধিকাংশ অঞ্চল জয় করেন। প্রাচীন ভারতের রাজাদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে তুলনা করেন মহাবীর নেপোলিয়নের সঙ্গে।

গুপ্ত সম্রাট্‌গণ ছিলেন হিন্দু ধর্মের অনুরাগী। তাঁহারাই সর্বপ্রথম বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সমাদর করিয়া বাঙলায় নিয়া আসেন এবং এ দেশে তাঁহাদের বসবাসের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই সময়ে অনেক সুশিক্ষিত কায়স্থও বাঙলায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন।

গুপ্তযুগের পরের কথা

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে বাঙলায় একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ এবং পশ্চিম বঙ্গেরও কিছুটা অংশ ছিল এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ কোটালিপাড়া ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। এই রাজ্যের অন্ততঃ তিনজন রাজার নাম জানা যায়—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব। কোটালি-পাড়ায় এবং বর্ধমানে এই রাজাদের কয়েকখানি তাম্রশাসন* পাওয়া গিয়াছে। এগুলি হইতে জানা যায়, তাঁহাদের উপাধি ছিল রাজাধিরাজ। তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থা ছিল চমৎকার, রাজ্যের সর্বত্র বিরাজ করিত নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও সমৃদ্ধি।

*তাম্রশাসন হইল তামার পাতে খোদাই করা দান-পত্র। সে যুগের রাজারা তামার পাতে দান-পত্র লিখিতেন, কেননা কাগজে কিংবা অন্য কিছুতে লিখিলে উহা সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। তাম্রশাসনে রাজারা শুধু দানের বিষয়ই লিখিতেন না, নিজেদের এবং পূর্বপুরুষদের পরিচয় এবং নানা কীর্তির কথাও লিখিতেন। ফলে ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য তাম্রশাসনগুলি হইতে জানা যায়।

রাজা শশাঙ্ক

এতক্ষণ বাঙলার যে সব রাজার কথা বলিলাম তাঁহাদের অনেকেরই খ্যাতি ছিল শুধু নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাহিরের জগৎ তাঁহাদের বড় একটা জানিত না। বাঙলার প্রথম যে রাজার নাম দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তিনি হইতেছেন কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক। কর্ণসুবর্ণ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জিলায়। দুঃখের বিষয় শশাঙ্কের বংশ-পরিচয় কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ক্ষুদ্র একটি রাজ্যের সামন্ত অর্থাৎ অধীন রাজা। পরে তিনি শক্তি সঞ্চয় করেন এবং বাহুবলে নিজ রাজ্যসীমা অনেক দূর পর্যন্ত বাড়ান। তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল বর্তমান উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত।

শশাঙ্কের সমকালে থানেশ্বরের রাজা ছিলেন রাজ্যবর্ধন, কনৌজের রাজা ছিলেন গ্রহবর্মা এবং মালবের রাজা ছিলেন দেবগুপ্ত। গ্রহবর্মা রাজ্যবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবগুপ্তের সঙ্গে তাঁহার দারুণ শত্রুতা ছিল। দেবগুপ্ত তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন এবং তাঁহার মহিষী রাজ্যশ্রীকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন। দেবগুপ্ত ও গ্রহবর্মার মধ্যে এই যে ভীষণ যুদ্ধ হইল, ইহাতে শশাঙ্ক অবলম্বন করিয়াছিলেন দেব-গুপ্তের পক্ষ।

দেবগুপ্ত গ্রহবর্মাকে হত্যা করিয়াছেন, এই সংবাদে রাজ্যবর্ধন ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। দেবগুপ্তের উপর প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে তিনি অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি রাজ্যশাসনের ভার দিয়া গেলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের উপর। যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে নিদারুণরূপে পরাস্ত করিয়া তাঁহার প্রাণের জ্বালা কিছুটা দূর করিলেন। এই ব্যাপারের পরেই শশাঙ্ক নাকি রাজ্যবর্ধনের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া তাঁহাকে গোপনে নিজ শিবিরে ডাকিয়া নিয়া নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় হত্যা করেন। এই

ঘটনাটি সত্য হইলে বড়ই লজ্জার কথা। কিন্তু যতদূর মনে হয়, ইহা আদৌ সত্য নয়। এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। আমরা ঐ বিষয়ে যাবতীয় সংবাদ জানিতে পাই হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন সাঙের লেখা হইতে। শশাঙ্ক ছিলেন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, ইঁহারা দু'জনে ছিলেন গোঁড়া বৌদ্ধ। সে যুগে এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। তাছাড়া এই দুইজনের লেখার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাই কোন কোন পণ্ডিতের বিশ্বাস, শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে নিজ ভবনে ডাকিয়া আনিয়া হত্যা করেন নাই, প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন।

শশাঙ্ক সম্বন্ধে বাণভট্ট এবং হিউএন সাঙ আরও বলিয়াছেন, তিনি বৌদ্ধদের দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তিনি কুশীনগরে বৌদ্ধদের সেখান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, বুদ্ধগয়ার সুবিখ্যাত বোধি বৃক্ষটি উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং সেখানকার বিহার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। এসব কথাও সত্য নয় বলিয়া পণ্ডিতদের বিশ্বাস।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পরে হর্ষবর্ধন থানেশ্বর এবং কনৌজ এই দুই রাজ্যেরই রাজা হইলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাজ্যশ্রী দেবগুপ্তের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর হর্ষবর্ধন তাঁহার সন্ধান পাইলেন বিন্ধ্য পর্বতে। সেখানে রাজ্যশ্রী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে হর্ষ আসিয়া তাঁহাকে বাধা দেন এবং সঙ্গে করিয়া নিজ রাজ্যে লইয়া যান।

এখন হর্ষের কর্তব্য হইল শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লওয়া। তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া যুদ্ধ-

যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধের ফলাফল কিন্তু কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। এই ঘটনার বহু পরেও শশাঙ্ক যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবত ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তাহার কাছাকাছি কোন এক সময়ে বাঙলার এই ক্ষণজন্মা বীরের মৃত্যু হয়।

কাশ্মীর-রাজদের সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক

কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। রাজতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে তাঁহার বীরত্ব সম্বন্ধে বহু কাহিনীর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়, ললিতাদিত্য উত্তর ভারত জয় শেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতেরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন। ইহার পরে তিনি গৌড় অর্থাৎ বঙ্গদেশ জয় করার জন্য অগ্রসর হন। গৌড়ের রাজা এই দিগ্বিজয়ী বীরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং উপহারস্বরূপ তাঁহার নিকট বহু হাতী ও সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। ললিতাদিত্য খুশী হইয়া তাঁহাকে কাশ্মীরে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। গৌড়রাজের মনে কিন্তু ভয় হইল, কাশ্মীরে গেলে হয়ত তাঁহার বিপদ্ হইতে পারে। ললিতাদিত্য তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বিষ্ণুমূর্তি স্পর্শ করিয়া বলিলেন, তাঁহার একটি কেশও কেহ স্পর্শ করিবে না। গৌড়রাজ তখন নিশ্চিন্ত মনে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি কাশ্মীর পৌছা মাত্র ললিতাদিত্য ন্যায়-ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া গৌড়রাজকে হত্যা করিলেন। এই হত্যার সংবাদ গৌড়ে পৌছিলে গৌড়বাসিগণ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। কয়েকজন তেজস্বী গৌড়বাসী তৎক্ষণাৎ কাশ্মীরের দিকে ছুটিলেন এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে। তাঁহারা কাশ্মীরে পৌছিলে শুরু হইল মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙ্গালী সৈন্যের সঙ্গে কাশ্মীররাজের বিপুল

বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ। সে এক অতি বিস্ময়কর যুদ্ধ। বাঙ্গালী সৈন্যেরা সকলেই অপূর্ব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন। তাঁহাদের অসামান্য বীরত্বের প্রশংসাচ্ছলে রাজতরঙ্গিণীর গ্রন্থকার কহ্লন লিখিয়াছেন, এই গৌড়বাসিগণ যে বীরত্বের পরিচয় দিলেন তাহা স্বয়ং বিধাতার পক্ষেও অসাধ্য বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তাই আজ পর্যন্ত তাঁহাদের বীরত্ব-গাথায় জগৎ মুখরিত।

জয়াপীড়ের পুণ্ড্রবর্ধনে আগমন

ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় ছিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা। তিনি নানা দেশ জয় করিয়া সৈন্যদের বিদায় দিয়া ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পুণ্ড্রবর্ধন নগর ছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজধানী। এই রাজ্যের রাজধানীর অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিয়া জয়াপীড় মুগ্ধ হইলেন। একটি মন্দিরে তখন চলিতেছিল সুমধুর নৃত্যগীত। জয়াপীড় মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই নৃত্যগীত উপভোগ করিলেন। সুদর্শন জয়াপীড়কে দেখিয়া সকলে সবিস্ময়ে বলাবলি করিতে লাগিল,—কে ইনি? কিন্তু কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

এই সময়ে সহরে চলিতেছিল একটি সিংহের দারুণ উপদ্রব। ইহার ভয়ে সকলেই ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় দিন কাটাইতেছিল। জয়াপীড়ের কানে এ সংবাদ পৌঁছিলে তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন সিংহটিকে হত্যা করিয়া রাজধানীকে বিপন্মুক্ত করিবেন। পরদিন নগরবাসীরা যখন দেখিল যমতুল্য সিংহটি মরিয়া পড়িয়া আছে তখন সকলের আনন্দ দেখে কে? এই অসাধ্য কাজ কে সম্পন্ন করিল? জানার জন্য তাহারা অধীর হইয়া পড়িল। একটু পরেই তাহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিল সিংহের দাঁতের মধ্যে একটি বাজু। তাহাতে 'জয়াপীড়' এই নামটি লেখা। এই নামের কোন লোক সহরে আছে তাহা ত কাহারও জানা নাই। তবুও এই অজ্ঞাত ব্যক্তির

সন্ধানে চতুর্দিকে লোক ছুটিল, কারণ তাঁহাকে বীরের সম্মান অবশ্যই দেখাইতে হইবে। বহুক্ষণ ছুটাছুটির পরে তাঁহার সন্ধান মিলিল কমলা নামে এক নর্তকার গৃহে। ইনি সেই বিদেশী গতরাত্রে যাঁহাকে মন্দিরে দেখিয়া সকলে বিস্ময়মুগ্ধ হইয়াছিল। পুণ্ড্রনগরের অধিবাসিগণ খুব ঘটা করিয়া জয়াপীড়কে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইল। পুণ্ড্রনগরের রাজা জয়ন্ত স্বয়ং মন্ত্রী ও রাজপরিবারের সকলকে লইয়া কমলার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জয়াপীড়কে জ্ঞাপন করিলেন তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম কৃতজ্ঞতা। জয়াপীড়কে তিনি রাজপ্রাসাদেও আমন্ত্রণ জানাইলেন। যথাসময়ে জয়াপীড় রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলে সেখানে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। কিছুদিন পরে মহা ধূমধামের সঙ্গে রাজকন্যা কল্যাণদেবীর সঙ্গে জয়াপীড়ের বিবাহ হইল।

কয়েক মাস বিশ্রামের পর জয়াপীড়ের মন আবার যুদ্ধজয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি পুণ্ড্রনগর ত্যাগ করিলেন। এবার তিনি যে যুদ্ধাভিযানে বাহির হইলেন ইহার ফলে তিনি পঞ্চগৌড় অর্থাৎ গৌড় সারস্বত (পূর্ব পাঞ্জাব), কান্যকুব্জ, মিথিলা (উত্তর বিহার) ও উৎকল জয় করিলেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য তিনি দান করিলেন স্বীয় শ্বশুর জয়ন্তকে।

উপরের কাহিনীটি রাজতরঙ্গিণী ছাড়া আর কোন গ্রন্থেই নাই। জয়ন্ত নামে কোন রাজা পুণ্ড্রবর্ধনে রাজত্ব করিতেন এরূপ কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। তাই অনেকে মনে করেন এই কাহিনীটি কাল্পনিক। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মনে করেন এই কাহিনীটি সত্য। তাঁহার মতে জয়ন্ত হইলেন আদিশূর। এই আদিশূরের নাম প্রাচীন বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। আদিশূর নাকি কনৌজ হইতে পাঁচজন শাস্ত্রজ্ঞ

ব্রাহ্মণ* আনাইয়া বঙ্গদেশে তাঁহাদের বসবাসের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

আদিশূরের কথা

আদিশূর নামে সত্যই কোন রাজা বাঙলা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা এ বিষয়েও কোন সন্দেহাতীত প্রমাণ নাই। তাঁহার সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ আমরা জানি কয়েকখানি কুলজী গ্রন্থ হইতে। এই গ্রন্থগুলি অনেকেই নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। আজ পর্যন্ত আদিশূরের কোন তাম্রশাসন, শিলালিপি, মুদ্রা কিংবা এই ধরনের অন্য কোন কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। এই জন্যই পণ্ডিতেরা তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ন'ন। তবে যতদূর মনে হয়, আদিশূর নামে সত্যই বাঙলায় একজন রাজা ছিলেন। তাহা না হইলে তাঁহার নামে এত সব কাহিনী প্রচারিত হইল কেন?

আদিশূর নিজরাজ্যে কি উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের কাহিনী প্রচলিত আছে। এখানে দুইটি কাহিনী বলিতেছি।

(১) কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতু ছিলেন পরম ধার্মিক। তাঁহার কন্যা চন্দ্রমুখীও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা। চন্দ্রকেতু চন্দ্রমুখীকে সমর্পণ করিলেন যশস্বী রাজা আদিশূরের হস্তে। একদিন চন্দ্রমুখীর ইচ্ছা হইল চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। এই উদ্দেশ্যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হইল। রাণী ব্রাহ্মণদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আপনারা মুখ হইতে আগুন বাহির করিয়া বরুণকে আহ্বান করুন এবং তাঁহাকে ঘটস্থ করুন। ব্রাহ্মণেরা রাণীর মুখে অদ্ভুত কথা শুনিয়া ত অবাক্। মুখ হইতে আগুন বাহির করা কিরূপে সম্ভব? ব্রাহ্মণদের অক্ষমতার পরিচয় পাইয়া রাণীর মনে

*এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণের নাম হইল ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি। আবার অন্য মতে তাঁহাদের নাম হইল শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দড়, ভট্টনারায়ণ ও বেদগর্ভ। ইঁহাদের সঙ্গে মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ, দশরথ বসু, পুরুষোত্তম দত্ত ও কালিদাস মিত্র নামে পাঁচজন কায়স্থও নাকি আসিয়াছিলেন।

ভারী দুঃখ হইল। তিনি বলিলেন, "এই ব্রাহ্মণহীন দেশে বাস করা আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব? রাজা যতই বলুন না কেন, আমার মন এ দেশে থাকিতে কোন মতেই রাজী নয়।" রাজার কানে এ সংবাদ পৌঁছিলে তিনি লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন। তিনি অবিলম্বে কনৌজ হইতে পাঁচজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া রাণীর বিষণ্ণ মুখে আবার হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিলেন।

(২) রাজা আদিশূর যজ্ঞ করাইবার উদ্দেশ্যে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইলেন। ইঁহারা নানা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া পান চিবাইতে চিবাইতে রাজপ্রাসাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের এরূপভাবে আসিতে দেখিয়া রাজা যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন। ব্রাহ্মণদের অস্ত্রের কি প্রয়োজন? এরূপভাবে পান চিবাইতে চিবাইতে আসা কিরূপ শিষ্টাচার? রাজার মন এই ব্যাপারে এতটা তিক্ত হইয়া উঠিল যে, তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দেখাই করিলেন না। রাজার মনের ভাব বুঝিতে ব্রাহ্মণদের দেরী হইল না। তাঁহারা যে সামান্য লোক নন, এ কথা রাজাকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটি মরা গাছের উপর কয়েকটি মন্ত্র-পড়া ফুল ছুঁড়িয়া দিলেন। কি আশ্চর্য, অমনি সেই মরা গাছটি পত্র-পুষ্পে বিভূষিত হইয়া নবীন বেশ ধারণ করিল। রাজা বুঝিতে পারিলেন এই ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই মুহূর্তে ব্রাহ্মণদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের বিস্ময়কর ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর সম্মান দেখাইলেন। আদিশূরের অনুরোধে তাঁহারা শাস্ত্রের বিধান অনুসারে যজ্ঞ করিলেন এবং আদিশূর বহু ধনরত্ন দিয়া তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিলেন।

পাল রাজবংশ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে বাঙলায় দেখা দিল দারুণ দুর্দিন। তিব্বতের রাজা জয়বর্ধন, কনৌজের রাজা যশোবর্মন, কামরূপের রাজা ভাস্কর-বর্মন প্রভৃতির আক্রমণে বাঙলার অধিবাসীদের দুর্দশার আর সীমা রহিল না। এই সময়ে শক্তিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই শুরু করিল দুর্বলদের উপর নির্মম অত্যাচার। এই চরম অরাজক অবস্থাকে রাজনীতির ভাষায় বলে মাৎস্যন্যায়।

অত্যাচারের মাত্রা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল তখন বঙ্গবাসীদের মনে সুবুদ্ধির উদয় হইল। তাঁহারা গোপাল নামে এক সুযোগ্য ব্যক্তিকে রাজপদে বরণ করিলেন। বাঙলার সুবিখ্যাত পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা এই গোপাল। গোপাল কিরূপে রাজা হইলেন এসম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। গল্পটি এই।

বাঙলা দেশে তখন স্থায়ী রাজা বলিয়া কিছু ছিল না। রাজ্যের লোকেরা প্রত্যেক দিন সূর্যোদয় হইলে একজন লোককে সিংহাসনে বসাইত। রাত্রে রাজার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইত এক কুৎসিত বিধবা রমণী। রাজাকে হত্যা করিয়াই নরঘাতিনী চলিয়া যাইত। এমনি ভাবে একে একে বহু রাজা নিহত হইলেন। তখন গোপাল নামে একজন দুঃসাহসী ব্যক্তি নিজে আসিয়া যাচিয়া রাজপদ গ্রহণ করিলেন। গোপাল ছিলেন দেবী চণ্ডীর একান্ত ভক্ত। দেবীর অনুগ্রহে তিনি একটি যষ্টি পাইয়াছিলেন। এই যষ্টির কতকগুলি অদ্ভুত শক্তি ছিল। গোপাল এই যষ্টির এক প্রহারেই রাজঘাতিনীর জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া দিলেন। বাঙলার আকাশ হইতে দীর্ঘ দিনের মেঘ কাটিয়া গেল। বাঙলার অধিবাসীরা গোপালকেই তাঁহাদের স্থায়ী রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

ইহা যে নিছক গল্প এ কথা অবশ্য কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

গোপাল রাজা হইয়া অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ফলে দীর্ঘ দিন পরে বাঙলায় আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। পর পর অনেকগুলি যুদ্ধে জয়ী হইয়া গোপাল সমগ্র বাঙলা নিজ অধিকারে আনিলেন।

গোপাল এবং তাঁহার বংশধরগণ সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

গোপালের পরে রাজা হইলেন তাঁহার পুত্র ধর্মপাল (আ: ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দ)। ধর্মপালের মাতার নাম দেদ্দ দেবী। যোদ্ধা হিসাবে ধর্মপাল বেশ খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি মগধ, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই সময়ে কনৌজের রাজা ছিলেন চক্রায়ুধ। ইন্দ্রায়ুধ নামে এক ব্যক্তি তাঁহাকে যুদ্ধে হারাইয়া কনৌজের সিংহাসন অধিকার করিলেন। রাজ্যহারা চক্রায়ুধ ধর্মপালের নিকট সাহায্যের আবেদন লইয়া বিনীতভাবে উপস্থিত হইলেন। ধর্মপাল অবিলম্বে তাঁহার পক্ষ লইয়া ইন্দ্রায়ুধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ভারতের বহু রাজাই এই যুদ্ধে ইন্দ্রায়ুধের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল বাঙলার বীর রাজা ধর্মপালের নিকট। ধর্মপাল মহা জাঁকজমকের সহিত চক্রায়ুধকে আবার কনৌজের সিংহাসনে বসাইলেন। এই উপলক্ষে তিনি কনৌজে রাজাদের একটি বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারতের বহু রাজা এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া ধর্মপালের নির্দেশে চক্রায়ুধকে কনৌজের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ধর্মপাল সমগ্র ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা,—এই সম্মেলনে সুস্পষ্টরূপে তাহা প্রমাণিত হইল। বাঙ্গালীর পক্ষে এ কি কম গৌরবের কথা ?

ধর্মপাল জীবনে অনেক যুদ্ধই করিয়াছিলেন। কয়েকটি যুদ্ধে তাঁহার পরাজয়ও হইয়াছিল। কিন্তু কখনও তাঁহাকে শত্রুর নিকট লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই। তিনি ছিলেন ভাগ্যদেবীর বরপুত্র।

ধর্মপালের সাম্রাজ্য ছিল বহু দূর বিস্তৃত। কিন্তু সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণটাই যে তিনি নিজে সাক্ষাৎভাবে শাসন করিতেন তাহা নয়। শুধু বঙ্গ এবং বিহারের শাসনভার ছিল তাঁহার নিজের হাতে। বিহারের পশ্চিম সীমা হইতে পাঞ্জাবের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসনভার তিনি ন্যস্ত করিয়াছিলেন চক্রায়ুধের উপর। চক্রায়ুধ ধর্মপালের সামন্তরূপে বিশ্বস্ততার সহিত এই অঞ্চল শাসন করিতেন। পাঞ্জাব, পূর্ব রাজপুতনা, মালব, বেরার এবং নেপালের রাজারাও ধর্মপালকে অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার সামন্ত-রূপে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁহার প্রতাপ ছিল অখণ্ড।

ধর্মপাল বৌদ্ধ হইলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী গর্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ মন্ত্রীই প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসন করিতেন।

ধর্মপাল অকৃত্রিম বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি মগধে বিক্রমশীল নামে একটি বিরাট বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মঠের খ্যাতি ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখানে ১১৪ জন বিখ্যাত অধ্যাপক শিক্ষার্থীদিগকে নানা শাস্ত্র শিখাইতেন।

দেবপাল (আঃ ৮১০-'৫০)

ধর্মপালের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র দেবপাল। দেবপালের মাতার নাম রন্না দেবী। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই দেবপাল আসাম ও উৎকল জয় করার উদ্দেশ্যে সেনাপতি জয়পালকে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। জয়পাল অনায়াসে এই দুইটি দেশ জয় করিয়া পাল সাম্রাজ্যের আয়তন অনেকটা বাড়াইলেন। জয়পাল ছিলেন দেবপালের খুড়া বাক্‌পালের পুত্র।

দেবপাল নিজেও ছিলেন বীর যোদ্ধা। তাঁহার দিগ্বিজয়ের কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আসাম হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভূভাগ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। সিন্ধুনদ

হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ তাঁহার অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, প্রত্যেকটি যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরাজিত রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করেন নাই, তাঁহাদিগকে তাঁহার অধীন সামন্তরূপে রাজ্য শাসন করার অধিকার দিয়াছিলেন। শুধু বঙ্গ এবং বিহার তিনি রাখিয়াছিলেন নিজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে।

দেবপালের খ্যাতি ভারতের সীমা ছাড়াইয়া দূরদূরান্তরে পৌঁছিয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা এবং মালয় উপদ্বীপের শৈলবংশীয় বৌদ্ধ রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের অনুমতি লইয়া নালন্দায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি দূত পাঠাইয়া দেবপালকে অনুরোধ করিলেন, এই মঠের স্থায়ী ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি কয়েকখানি গ্রাম দান করুন। দেবপাল সানন্দে তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়া।

দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন গর্গের পুত্র দর্ভপাণি। দর্ভপাণির মৃত্যুর পরে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন দর্ভপাণির পৌত্র গুরব মিশ্র।

দিনাজপুর জিলার বাদল নামক গ্রামে একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তম্ভের নাম হরগৌরী স্তম্ভ বা গরুড় স্তম্ভ। কেহ কেহ উহাকে বাদল স্তম্ভও বলেন। এই স্তম্ভে ক্ষোদিত লিপি হইতে গর্গ-প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রি-বংশ সম্বন্ধে বহু সংবাদ জানা যায়।

প্রথম শূরপাল (আঃ ৮৫০-'৫৪)

দেবপালের মৃত্যুর পর রাজা হন প্রথম বিগ্রহপাল বা শূরপাল। কাহারও মতে তিনি দেবপালের পুত্র, আবার কাহারও কাহারও মতে তিনি সেনাপতি বাক্‌পালের পুত্র। তিনি ছিলেন তাঁহার বীর পূর্ব-পুরুষদের নিতান্ত অযোগ্য বংশধর। যুদ্ধ বিগ্রহের নাম শুনিলেই তিনি ভয় পাইবেন। তাঁহার মন ছিল শুধু ধর্ম-কর্মে। বৌদ্ধরা যাগ-যজ্ঞের বিরোধী কিন্তু তিনি ছিলেন যাগ-যজ্ঞের একান্ত অনুরাগী।

পুণ্যার্জনের আশায় তিনি যজ্ঞের শান্তিজল ভক্তিভরে নিজ মস্তকে ধারণ করিতেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী কেদারমিশ্রও বৃদ্ধবয়সে রাজ-কার্য ছাড়িয়া দিয়া যাগ-যজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। ফলে রাজ-কার্যে দেখা দিয়াছিল দারুণ বিশৃঙ্খলা। কয়েক বৎসর রাজত্ব করার পরে বিগ্রহপাল নিজ ইচ্ছায় ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে পুত্র নারায়ণপালকে সিংহাসন দিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন।

যুদ্ধবিমুখ বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পাল-সাম্রাজ্যের আয়তন ইঞ্চি পরিমাণও বাড়িল না। শুধু তাই নয়। এই সময় হইতেই পাল-শক্তির পতন শুরু হইল।

নারায়ণপাল (আঃ ৮৫৪-৯০৮)

নারায়ণপালও ছিলেন পিতার ন্যায় সমরবিমুখ। তিনি সুদীর্ঘ ৫৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্বলতার ফলে মগধ, এমন কি উত্তর বঙ্গও পালদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। পরে শত্রুপক্ষের দুর্দিনের সুযোগ লইয়া তিনি মগধ এবং উত্তরবঙ্গ পুনরায় জয় করিয়া লইয়াছিলেন। নারায়ণপাল যোদ্ধা হিসাবে যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারিলেও সৎ এবং ন্যায়-পরায়ণ বলিয়া সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রাজ্যপাল (আঃ ৯০৮-'৪০)

নারায়ণপালের মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল। রাজ্যপাল যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক বড় বড় দীঘি খনন করিয়া এবং সু-উচ্চ মন্দির নির্মাণ করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় গোপাল (আঃ ৯৪০-'৬০)

রাজ্যপালের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গোপাল রাজা হন। এই সময়ে মধ্য ভারতে চন্দেল্ল এবং কলচুরী নামে দুইটি জাতি

অত্যন্ত প্রবল হইয়া ওঠে এবং বহু রাজ্য জয় করে। ইহাদের আক্রমণের ফলে পাল সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (আঃ ৯৬০-'৮৮)

দ্বিতীয় গোপালের মৃত্যুর পরে রাজা হন দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে পশ্চিম দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত বাণগড়ে। এই তাম্রশাসনের লেখা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন দ্বিতীয় বিগ্রহপাল কোন শত্রুর হাতে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন। পরে প্রথম মহীপাল পিতার সেই শত্রুকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়া লন। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের এই শত্রু যে কে তাম্রশাসনে কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। আভাসে-ইঙ্গিতেও কিছু বোঝার সাধ্য নাই। অথচ ইহা অজানা থাকিলে ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে ফাঁক থাকিয়া যায়। পণ্ডিতেরা এই নিয়া অনেক গবেষণা শুরু করেন। পরে দৈবাৎ বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে একটি ক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ায় জানা গেল দ্বিতীয় বিগ্রহপালের এই শত্রু ছিলেন কাম্বোজ বংশীয় নরপতি রাজ্যপাল। কাম্বোজদের দেশ যে কোথায়, কখন এবং কি ভাবে যে তাঁহারা দ্বিতীয় বিগ্রহপালকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন সে সব কিছুই এখন পর্যন্ত জানা যায় নাই। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন কাম্বোজদের দেশ ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

বিদেশীদের নিকট এই পরাজয়ের ফলে বঙ্গদেশে পাল সাম্রাজ্যের চিহ্নমাত্র রহিল না। শুধু অঙ্গ ও মগধ রহিল তাঁহাদের শাসনাধীন।

এই সময়ে দক্ষিণ এবং পূর্ব বঙ্গে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যও গড়িয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে হরিকেলের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দশম শতাব্দীতে চন্দ্রবংশীয় রাজগণ হরিকেলে রাজত্ব করিতেন। চন্দ্রদ্বীপ (বাখরগঞ্জ) ছিল এই রাজাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম মহীপাল (আঃ ৯৮৮-১০৩৮)

প্রথম মহীপাল ছিলেন পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে অন্যতম। আগেই বলিয়াছি কাম্বোজদের হাতে পরাজয়ের ফলে দ্বিতীয় বিগ্রহপাল রাজ্যভ্রষ্ট হন এবং কিছুদিন বঙ্গদেশে পালশক্তির চিহ্নমাত্রও ছিল না। পরে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল পিতৃসিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হইয়া উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং রাঢ়ের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইলেন। ইহা ছাড়া তিনি উত্তরে ত্রিহুত এবং পশ্চিমে কাশী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহা নিশ্চয়ই সামান্য কৃতিত্বের কথা নয়।

পাল সাম্রাজ্যের চরম দুর্দিনের সময় কাশী, সারনাথ, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগুলি সংস্কারের অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। মহীপাল প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া এগুলির সংস্কার করাইলেন। তিনি এই কাজের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতা স্থিরপাল এবং বসন্তপালের উপর।

নরপালদেব (আঃ ১০৩৮-'৫৫)

মহীপালের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নরপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। যোদ্ধা হিসাবে তিনি তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের সীমানা বেশ কিছুটা হ্রাস পাইয়াছিল। শাসক হিসাবে নরপালদেব কিন্তু যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রজার কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁহার জীবনের স্থির লক্ষ্য। বৌদ্ধ হইলেও তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন। একটি ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায়, তাঁহার রাজত্ব কালে হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ গয়ায় অবিরাম বেদগান চলিত যাহার ফলে সেখানে কাহারও পক্ষে অপরের কথা শোনা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার।

মহাপণ্ডিত অতীশের নাম কে না জানে? তিনি ছিলেন নরপাল দেবের সমসাময়িক। নরপালদেব তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে সুবিখ্যাত চিকিৎসক চক্রপাণিদত্তের চেষ্টায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

তৃতীয় বিগ্রহপাল (আঃ ১০৫৫-'৭৫)

নরপালদেবের মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ-পালদেব। নরপালদেব কলচুরীরাজ কর্ণের নিকট এক যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাস্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল পিতার এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইলেন কর্ণকে এক যুদ্ধে নিদারুণ ভাবে পরাস্ত করিয়া। কর্ণ নিজ কন্যা যৌবনশ্রীকে বিজয়ী বিগ্রহপালের হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

বিগ্রহপালের এই গৌরব কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হইল না। তাঁহার রাজত্বকালের মধ্যেই পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ পালরাজদের হাত ছাড়া হইল। শুধু মগধে তাঁহাদের আধিপত্য কিছু পরিমাণে রহিয়া গেল।

তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-'৭৫)। শূরপাল এবং রামপাল নামে তাঁহার দুই ভ্রাতা ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার কিছুদিন পরেই মহীপালের মনে সন্দেহ হইল তাঁহার ভ্রাতা রামপাল সিংহাসন অধিকার করার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইহা কত দূর সত্য এ বিষয়ে কোন প্রকার অনুসন্ধান করাও তিনি প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি অবিলম্বে রামপাল এবং অপর ভ্রাতা শূরপালকেও কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার এই অন্যায় আচরণে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দিব্য নামে এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন এই বিদ্রোহের নেতা।

তিনি ছিলেন জাতিতে কৈবর্ত। তাই দিব্য-পরিচালিত এই বিদ্রোহ ইতিহাসে কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে খ্যাত। দিব্য মহীপালকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন।

দ্বিতীয় মহীপাল এবং তাঁহার সময়কার বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস আমরা কিছুটা জানিতে পারি 'রামচরিত' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে। এই গ্রন্থখানির লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী ছিলেন মহীপালের ভ্রাতা রামপালের একজন মন্ত্রী। রামচরিতে মহীপালকে শঠ, নির্দয়, অত্যাচারী প্রভৃতি বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছে। মহীপাল সত্যই এতটা খারাপ ছিলেন কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সন্ধ্যাকর নন্দী যে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন রামচরিতে তাহা বেশ স্পষ্টই ধরা পড়ে। এই বিদ্বেষভাবের জন্যই যে তিনি মহীপালকে কৃষ্ণ তুলিকা দিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, এরূপ সন্দেহই স্বাভাবিক।

রামচরিত গ্রন্থখানি একদিক হইতে বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। একখানি কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের প্রতিটি শ্লোকের দুইটি করিয়া অর্থ। একভাবে পড়িলে মনে হইবে যেন অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী পড়িতেছি। আর একভাবে পড়িলে মনে হইবে যেন বাঙলার পালরাজ রামপালের সমকালীন বাঙলার ইতিহাস পড়িতেছি।

এ ধরনের গ্রন্থ লেখা কি কম পাণ্ডিত্যের কথা?

দিব্য ও কৈবর্তগণ

দিব্য সম্বন্ধে রামচরিত হইতে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। তবে যেটুকু জানা যায় তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা। রাজা হইয়া তিনি বিশেষ পরাক্রমের সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহীপালের হত্যার পরে রামপাল কারাগার হইতে মুক্ত হন এবং মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। অবিলম্বে বরেন্দ্রের সিংহাসন অধিকার করার উদ্দেশ্যে তিনি

দিব্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে দিব্যের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে।

দিব্যের মৃত্যুর পরে বরেন্দ্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার সহোদর ভ্রাতা রুদোক। রুদোক নির্বিঘ্নেই রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁহার পুত্র ভীম। রামচরিতে ভীমকে পণ্ডিত, উদার, ধর্মপ্রাণ, প্রজাবৎসল প্রভৃতি বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বহুগুণসম্পন্ন রাজা রামপালের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাজ্য ও প্রাণ দুই-ই হারান।

ভীমের কতকগুলি কীর্তি আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। ভীম তাঁহার রাজধানীটি সুরক্ষিত করেন এক সুদৃঢ় ডমর নির্মাণ করিয়া। মহাস্থান-গড়ের নিকটে ইহার ধ্বংসাবশেষ আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। ইটালির গোলদুর্গ একটি ইতিহাস-বিখ্যাত দর্শনীয় বস্তু। জনৈক ইংরেজ ভীমের ডমরটিকে তুলনা করিয়াছেন এই গোলদুর্গের সঙ্গে। ভীম তাঁহার রাজ্যের কয়েকটি দিক্ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি বিরাট জাঙ্গাল নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার ধ্বংসাবশেষও অদ্যাবধি বর্তমান। ভীমের জাঙ্গাল নামে ইহা পরিচিত।

রামপাল (১০৭৭-১১২০)

আগেই বলিয়াছি রামপাল নিজ চেষ্টায় কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া বরেন্দ্র উদ্ধারের জন্য দিব্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হয়। দিব্য তখন রামপালের রাজ্য মগধ আক্রমণ করিয়া তাঁহার শক্তি চূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ভীম বরেন্দ্রের রাজা হইলে রামপাল বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধের সময় অর্থ ও সম্পত্তির লোভে বহু সামন্তরাজ রামপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যুদ্ধে রামপালের জয় হইল। অত্যন্ত লজ্জার কথা, রামপাল বিজয়গর্বে মত্ত হইয়া এই সময়ে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেন। ভীমকে বন্দী করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল।

তাঁহার একান্ত আপনজনদের হত্যা করা হইল তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে। পরে এক সঙ্গে অনেকগুলি তীর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইল।

আশ্চর্য, সন্ধ্যাকর নন্দী এই রামপালকে তুলনা করিয়াছেন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে!

ভীমের সঙ্গে বর্বরতুল্য আচরণ করিলেও রাজা হিসাবে রামপাল যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি প্রজাদের করের পরিমাণ অনেক কমাইয়া দিয়াছিলেন। কৃষির উন্নতির জন্য কতকগুলি ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং অন্য নানাভাবে প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল সাধন করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

যোদ্ধা হিসাবেও তাঁহার কৃতিত্ব সামান্য নয়। এই সময়ে বিক্রমপুরে বর্ম বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। বর্মরাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাঢ়ের কয়েকজন সামন্ত রাজা এবং কামরূপের রাজাও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ের ফলে কলিঙ্গ, অঙ্গ এবং মগধ প্রভৃতি দেশও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

যিনি যৌবনে ভ্রাতার চক্রান্তে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল তিনি এইরূপে ভারতের অন্যতম শক্তিমান রাজা রূপে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। শুধু রণদক্ষতাগুণেই যে ইহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা নয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসামান্য কর্মদক্ষতা বলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

রামপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন প্রায় ৪২ বৎসর। তিনি তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন রামাবতী নগরে। রামচরিতে এই নগরীর সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির উচ্ছ্বসিত বর্ণনা আছে।

রামপাল তাঁহার মাতুল মথন বা মহনকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কথিত আছে, তিনি মাতুলের মৃত্যু হইলে শোকে অধীর হইয়া

পড়িলেন, সমগ্র জগৎ তাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া মনে হইল। জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিল। অবিলম্বে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মৃত্যু বরণ করিয়া তিনি পরলোকে মাতুলের সঙ্গী হইলেন।

তৃতীয় গোপাল (১১২৫-'৪০)

তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য অতি দ্রুতগতিতে পতনের দিকে চলিল। সম্ভবতঃ তাঁহার দুর্বলতার সুযোগেই কর্ণাটদেশীয় বিজয়সেন উত্তর দক্ষিণ রাঢ়ে একটি নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

মদন পাল (১১৪০-'৫৫)

মদনপালের পরে আর কোন পাল রাজার কথা শোনা যায় না। সম্ভবতঃ তিনিই এই সুবিখ্যাত বংশের শেষ রাজা।

সেন বংশ

সেন বংশীয় রাজগণের নাম বাংলা দেশে অমর হইয়া আছে। অথচ ইঁহারা বাঙ্গালী ন'ন। দাক্ষিণাত্যের সুদূর কর্ণাট ছিল ইঁহাদের আদি বাসস্থান। ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করায় ইঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইলেন।

সামন্তসেন

সেন বংশের সামন্তসেন সর্বপ্রথম স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বাঙলায় আসেন এবং গঙ্গাতীরে ঈশ্বর আরাধনায় নিমগ্ন হন। যতদূর মনে হয় তাঁহার পুত্র হেমন্তসেনই বাঙলা দেশে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন রাঢ়ে। ইহা ছিল আয়তনে নিতান্তই ক্ষুদ্র।

বিজয়সেন

হেমন্তসেনের মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁহার পুত্র বিজয়সেন (১০৯৫-১১৫৮)। বিজয়সেন ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। মিথিলা,

কোটাটবী, কৌশাম্বী, গৌড়, কামরূপ প্রভৃতি দেশের রাজারা তাঁহার নিকট যুদ্ধে নিদারুণ রূপে পরাস্ত হন। ফলে বাঙলার সীমা ছাড়াইয়াও তাঁহার রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

বিজয়সেনের রাজ্যজয়ের চমকপ্রদ কাহিনী জানা যায় রাজসাহী জিলার দেওপাড়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত একটি স্তম্ভলিপি হইতে। এই লিপিটি রচনা করেন বিজয়সেনের পৌত্র লক্ষ্মণসেনের রাজকবি উমাপতিধর। ভাষার লালিত্যের ও অর্থগৌরবের দিক্ হইতে এই লিপিটির মূল্য অপরিমেয়। কিন্তু ইহাতে বাড়াবাড়ির মাত্রা বড়ই বেশী। কি রকম বাড়াবাড়ি তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। বিজয়সেনের বীরত্বের প্রশংসা করিতে গিয়া উমাপতি বলিতেছেন—'অসংখ্য বানরের নেতা রামচন্দ্র এবং পাণ্ডবপতি ধনঞ্জয়ও (অর্জুন) বীরত্বে তাঁহার সঙ্গে তুলনায় পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন।' এমন কথা কাহারও লেখনীতে সহজে ওঠে কি? বিজয়সেন একটি সুউচ্চ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সূর্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে সূর্য, তুমি অগস্ত্যকে দক্ষিণবাসী করাইয়াছ, কিন্তু তাহাতে তোমার কোন লাভই হইবে না, কারণ এই সু-উচ্চ প্রাসাদের জন্য তোমার অশ্ব আর অগ্রসর হইবার পথ পাইবে না।" বিজয়সেন মস্ত বড় দাতা ছিলেন। দাতা হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে গিয়া উমাপতি বলিতেছেন,—'এই রাজার অনুগ্রহে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যারপর নাই ধনী হইয়া পড়িয়াছিলেন, ফলে তাঁহাদের পত্নীদের অলঙ্কার পরাইবার জন্য নগরবাসী রমণীদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।' এই উক্তিটি অবশ্য অসম্ভব কিছু নয়। সে যুগের ব্রাহ্মণেরা অধ্যাপনা এবং শাস্ত্র চর্চা নিয়াই থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল সরস্বতীর সঙ্গে, লক্ষ্মীর সঙ্গে নয়। সুতরাং ধনী রমণীরা যে ধরণের অলঙ্কার পরেন, সে ধরণের অলঙ্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-পত্নীদের পরিচয় না থাকারই কথা।

বল্লাল সেন (আঃ ১১৫৮-'৭০)

বিজয়সেনের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন রাজা হন। বল্লাল সেনের নাম বাঙলায় যতটা পরিচিত প্রাচীন বাঙলার আর কোন রাজার নামই ততটা নয়। বাঙ্গালী হিন্দুদের বিশ্বাস তিনি বাঙলার রাঢ় অঞ্চলে (পশ্চিম বঙ্গে) কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

এই প্রথা প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে বল্লাল নাকি ভাগীরথী নদী তীরে যোগিনী ভট্ট নামক স্থানে দীর্ঘ এগারো বৎসর কাল এক মনে কুললক্ষ্মীর আরাধনা করেন। দেবী তাঁহার ঐকান্তিক তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদান করিয়া চলিয়া যান। দেবীর নির্দেশমত বল্লাল প্রচার করেন—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, চিন্তা, বৃত্তি, তপ ও দান এই নয়টি সৎকুলের লক্ষণ। ইহার পরে তিনি রাজধানীতে একটি সভা ডাকিয়া যাঁহারা ঐ সব গুণের অধিকারী বলিয়া তাঁহার মনে হইল তাঁহাদের তিনি কুলীন বলিয়া ঘোষণা করেন। সমাজে কুলীনদের স্থান হইল সকলের উপরে। শুধু তাঁহাদের নয়, তাঁহাদের বংশধরগণ পর্যন্ত শত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। আধুনিককালে অবশ্য কুলীনদের সে সম্মান দিতে কেহ বড় একটা রাজী নয়।

বল্লাল প্রকৃতই কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার নানাযুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন, কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক বল্লাল নয়।

বল্লাল সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্রত সাগর, আচার সাগর, প্রতিষ্ঠা-সাগর, দানসাগর এবং অদ্ভুতসাগর এই পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি অক্ষয়খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

বল্লালের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট ছিলেন সে যুগের একজন মহাজ্ঞানী পণ্ডিত।

বল্লালের রাজধানী ছিল তিনটি—গৌড়পুর বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রাম।

লক্ষ্মণ সেন (আঃ ১১৭৯-১২০৫)

বল্লালসেনের মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন। তখন তিনি ষাট বৎসরের বৃদ্ধ।

তবকৎ-ই-নাসিরী নামে পারস্য ভাষায় লেখা একখানি ইতিহাস গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থের লেখক মিনহাজ উদ্দীন ছিলেন দিল্লীর কাজী (বিচারক)। লক্ষ্মণসেনের জন্ম সম্বন্ধে তিনি এই অদ্ভুত কাহিনীটি বলেন—লক্ষ্মণসেনের জন্মের পূর্বে বল্লালের আদেশে জ্যোতিষিগণ তাঁহার ভাবী সন্তান সম্বন্ধে গণনা শুরু করেন। গণনা শেষ হইলে তাঁহারা বলিলেন—দুর্ভাগ্যক্রমে এখনই যদি রাণী সন্তান প্রসব করেন তবে সন্তানের জীবনে কলঙ্কের আর শেষ থাকিবে না। কিন্তু দুই ঘণ্টা পরে প্রসব করিলে তাঁহার জীবন হইবে গৌরবোজ্জ্বল। রাজা বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এখন প্রসব করিলে তাহা ঠেকান যাইবে কিরূপে? রাজাকে চিন্তিত দেখিয়া মহাবুদ্ধিমান জ্যোতিষীরা বলিলেন, সেজন্য চিন্তা কি মহারাজ? এখনই রাণীর পা দু'টি বাঁধিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখার ব্যবস্থা করুন। অশুভ সময় শেষ হইয়া গেলে বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেই ত হইল। এই পরামর্শে রাজা ত মহা খুশী। তৎক্ষণাৎ রাণীব পা দু'টি বাঁধিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখা হইল। দুই ঘণ্টা পরে যেই বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল অমনি রাণী একটি পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। পুত্রের দিব্যকান্তি রাজার প্রাণে অসীম আনন্দের সঞ্চার করিল। কিন্তু এই কাহিনীটি সত্য হওয়া সম্ভব কি?

লক্ষ্মণ সেন ছিলেন পিতামহের ন্যায় বীর যোদ্ধা। তিনি গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কাশী জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বরূপ সেনের একটি তাম্র-শাসন হইতে জানা যায়, তিনি তাঁহার

বিজয় কাহিনী চিরস্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে পুরী, কাশী ও প্রয়াগ (এলাহাবাদ) এই তিন স্থানে সমরজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেন শুধু যে যোদ্ধা হিসাবেই বড় ছিলেন তাহা নয়। তিনিও ছিলেন সুপণ্ডিত। তাঁহার পিতা অদ্ভুতসাগর গ্রন্থখানির মাত্র কিছুটা অংশ লিখিয়াছিলেন। বাকী অংশ লক্ষ্মণসেন বিশেষ যোগ্যতার সহিত শেষ করেন।

একদা রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন তাঁহার রাজসভা যেরূপ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নও তাঁহার সভা অনুরূপভাবে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই পঞ্চরত্ন হইলেন—গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি ও কবিরাজ।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের নাম কে না জানে? সংস্কৃতে লেখা এই বইখানির প্রত্যেকটি শ্লোকের মধ্য দিয়া যেন মধু ঝরিয়া পড়ে। সমগ্র পৃথিবীতে এমন শ্রুতিমধুর কাব্য আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ।

অত্যন্ত দুঃখের কথা, যে লক্ষ্মণ সেন অসামান্য বীর বলিয়া ভারত-ব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহারই রাজত্বকালে হিন্দু বাঙলা মুসলমানদের পদানত হইল।

মুসলমানেরা কিরূপে বাঙলা দেশ জয় করিলেন নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস গ্রন্থ হইতে সে কাহিনী জানা যায় না। মিনহাজের তবকৎ-ই-নাসিরীতে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটি আছে।

ইক্তিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খলজী মগধ জয় করিলে সে সংবাদ বাঙলাময় রাষ্ট্র হইল। ফলে বাঙলায় দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হইল। কয়েকজন পণ্ডিত ও জ্যোতিষী আসিয়া লক্ষ্মণ সেনকে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন—শাস্ত্রে আছে মুসলমানেরা অবিলম্বে বাঙলা দেশ জয় করিবে। সুতরাং এস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য এখনই প্রস্তুত হউন। লক্ষ্মণ সেন তীব্র ঘৃণার সহিত এই হীন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু শত শত ভীতি-বিহ্বল লোক

প্রাণের ভয়ে পূর্ব বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি দেশে পলাইয়া গেল। পরের বৎসরের কথা। লক্ষ্মণ সেন তখন নদীয়ায় বাস করিতেছিলেন। হঠাৎ বক্তিয়ার মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ নদীয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুচতুর বক্তিয়ার নদীয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন যোদ্ধার বেশে নয়, অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে। কাহারও মনে অণুমাত্র সন্দেহ হইল না যে, ইহারা সৈন্য। বক্তিয়ার কিন্তু সত্যই বাঙলায় মাত্র এই ১৮ জন সৈন্য লইয়া আসেন নাই। তাঁহার বাহিনীতে ছিল বহু সহস্র সৈন্য। কিন্তু তিনি এত দ্রুতগতিতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন যে শুধু ১৮ জন সৈনিকই তাঁহার সঙ্গে সমান তালে আসিতে পারিয়াছিল। বাকী সৈন্যেরা সব পিছনে পড়িয়া রহিল। বক্তিয়ার এই ১৮ জন সৈন্য লইয়া রাজপ্রাসাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হঠাৎ তরবারি বাহির করিয়া প্রহরীদের হত্যা করিতে শুরু করিলেন। প্রহরীরা ত হতভম্ব। এরূপ আক্রমণের জন্য তাহারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। শত্রু সৈন্যকে বাধা দেওয়া ছিল তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহারা তুমুল আর্তনাদ শুরু করিল। লক্ষ্মণ সেন তখন অন্তঃপুরে বসিয়া আহার করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট মুহূর্তমধ্যে মুসলিম আক্রমণের সংবাদ পৌঁছিল। অতি-বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন দিশাহারা হইয়া পড়িলেন এবং খিড়কির দরজা দিয়া পলায়ন করিয়া পূর্ব বঙ্গের দিকে রওনা হইয়া গেলেন। এদিকে বক্তিয়ারের অবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া পড়িলে তাহারা বিনা বাধায় নদীয়া সহরটি অধিকার করিয়া লইল। পরে ক্রমশঃ তাহারা পশ্চিম বঙ্গ জয় করিল। লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া পূর্ব বঙ্গ শাসন করিতে লাগিলেন।

মাত্র ১৮জন বিদেশী সৈন্য আসিয়া একটা শহর জয় করিয়া লইল। কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করিতে পারে কি? ইহা অসার কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। মিনহাজ এই কাহিনী লিখিয়াছেন স্বচক্ষে দেখিয়া নয়, লোক-মুখে শুনিয়া।

ঘটনার পঞ্চাশ বৎসর পরে দুই জন মুসলমান সৈনিক সগর্বে তাঁহার নিকট এই কাহিনী বলিয়াছিল। তাহারা নাকি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। অধিকাংশ লোকেরই স্বভাব হইল, শত্রুকে লোকচক্ষে হেয় করা এবং নিজেদের গৌরব মিথ্যা করিয়া বাড়াইয়া প্রচার করা। এই নিরক্ষর সৈনিক দুইটিও যে তাহাই করিয়াছিল এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যে লক্ষ্মণ সেন বহু যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিভিন্ন স্থানে সমরজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন তিনি শত্রুর ভয়ে নিতান্ত কাপুরুষের মত নিজ রাজধানী হইতে পলাইয়া গেলেন, এ কথার সত্যতা বিনা দ্বিধায় মানিয়া লওয়া সহজ নয়।

পশ্চিম বঙ্গ জয় করার পরে মুসলমানেরা পূর্ব বঙ্গ জয় করার জন্য কম চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু লক্ষ্মণ সেন সাফল্যের সহিত তাহাদের বাধা দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন যদি সত্যই কাপুরুষ হইতেন তাহা হইলে দুর্ধর্ষ মুসলমানদের পক্ষে পূর্ব বঙ্গ জয় করা হইত নিতান্তই সহজ-সাধ্য ব্যাপার।

পূর্ব বঙ্গে তিন-চার বৎসর রাজত্ব করার পরে লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু হয়। তাঁহার পরে পূর্ব বঙ্গের রাজা হন তাঁহার পুত্র **বিশ্বরূপ সেন**। সম্ভবত তিনি ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। বিশ্বরূপ সেনের মৃত্যুর পরে রাজা হন লক্ষ্মণ সেনের আর এক পুত্র **কেশব সেন**। এই দুই ভ্রাতাকেই মুসলমানদের সঙ্গে বারংবার লড়াই করিতে হইয়াছিল। প্রতিবারই তাঁহারা জয়ের গৌরব অর্জন করিয়া পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেশব সেনের মৃত্যু হয় সম্ভবত ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার পরেও সেন বংশের কয়েকজন রাজা ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁহাদের সম্বন্ধে নীরব। এমন কি তাঁহাদের নাম পর্যন্ত আমাদের নিকট অজ্ঞাত।

প্রাচীন বাঙলার অর্থ নৈতিক অবস্থা

প্রাচীন কাল হইতেই বাঙলার ধন-দৌলতের খ্যাতি। ইহার উর্বর জমিতে ফলিত প্রচুর শস্য। ফলে এ দেশে অন্নকষ্ট বড় একটা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের মারফৎ বহু লোক উপার্জন করিত প্রভূত অর্থ। একজন গ্রীক লেখকের গ্রন্থ হইতে জানা যায় বাঙলা দেশ হইতে পশ্চিম এশিয়া, মিশর ও দক্ষিণ ইউরোপে প্রচুর এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি মসলা দ্রব্য রপ্তানি হইত। বিনিময়ে বাঙলায় আসিত অপরিমেয় ধন-রত্ন। বংশীদাসের মনসামঙ্গল ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-রামের চণ্ডী মঙ্গলকাব্যে দেখিতে পাই বাঙ্গালী বণিকেরা জাহাজ বোঝাই করিয়া পান, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি লইয়া পশ্চিম ভারতের গুজরাট প্রভৃতি দেশে যাইতেন। সুপারির পরিবর্তে তাঁহারা নাকি মাণিক্য আনিতেন এবং পানের বিনিময়ে আনিতেন মরকত!

অর্থ যেখানে সেখানেই বিলাসিতা। সে যুগে বাঙলার নাগরিকেরা কিরূপ বিলাসী ছিলেন তাহার সুস্পষ্ট চিত্র আমরা পাই পাল-রাজাদের রাজধানী রামাবতী শহরের বর্ণনা হইতে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে এ সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ বিবরণ আছে তাহা পড়িলে স্পষ্টই মনে হয়, এ যেন হারুণ-আল-রসিদের বগদাদ সহর। এই গ্রন্থে আছে—

রামাবতীর রাজপথ যেমন দীর্ঘ তেমন প্রশস্ত। রাজপথের দু' পাশে শত শত সু-উচ্চ অট্টালিকা। প্রত্যেকটি অট্টালিকায় হীরা, বৈদূর্যমণি ও নীলপদ্মের কত আভরণ। কস্তুরী, অগুরু, চন্দন প্রভৃতির সুগন্ধে প্রতিটি গৃহ আমোদিত। সঙ্গীতের সুমধুর স্বর-লহরীতে চতুর্দিক পুলকিত।

নগরটির শোভা বৃদ্ধির জন্য ইহার স্থানে স্থানে নির্মিত হইয়াছিল কত সুরম্য মন্দির, স্তূপ, পুষ্পোদ্যান, ক্রীড়া শৈল প্রভৃতি। নির্মল জলপূর্ণ দীঘিরও অভাব ছিল না।

এই গেল পালদের অন্যতম রাজধানী রামাবতীর কথা। সেনদের অন্যতম রাজধানী বিজয়পুর সম্বন্ধেও অনেকটা এই ধরণের বিবরণই আমরা পাই।

এখন প্রশ্ন হইল সে যুগে সমগ্র বাঙালী জাতিই কি ধনী ছিল? দুঃখ-দারিদ্র্যের অভিশাপ হইতে বাঙলা কি সম্পুর্ণরূপেই মুক্ত ছিল? অনেকে ঐরূপ অভিমতই পোষণ করেন। কিন্তু সে যুগের কোন কোন কবির রচনা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, আজকালকার মত সে যুগেও বহু লোককে নিদারুণ দুঃখকষ্টে দিন যাপন করিতে হইত।

একজন কবি একটি দরিদ্র পরিবারের গৃহকর্ত্রী সম্বন্ধে বলিতেছেন —দুঃখকষ্টে তাঁহার দেহ শীর্ণ। তাঁহার পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র। অসহ্য ক্ষুধায় তাঁহার শিশুদের চক্ষু ও উদর বসিয়া গিয়াছে। অতি ব্যাকুল ভাবে তাহারা বলিতেছে,—খেতে দাও, খেতে দাও। দুঃখিনী গৃহিণী চোখের জলে গাল ভাসাইয়া বলিতেছেন—হে ঠাকুর! একমণ চাউলে যেন আমাদের একশত দিন যায়।

সদুক্তিকর্ণামৃত নামক একটি পুস্তকে একখানি ঘরের শোচনীয় অবস্থার এরূপ বর্ণনা আছে—কাঠের খুঁটি পড়ে পড়ে। মাটির দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িতেও আর বাকী নাই। চালে আর ক'টি খড়ই বা আছে? আমার শূন্য ঘরে এখন ব্যাঙ্ কেঁচোর খোঁজে ছুটাছুটি করিতেছে।

আর একজন কবির রচনায় পাই—শিশুরা ক্ষুধায় দারুণ কষ্ট পাইতেছে। আত্মীয়স্বজনগণ তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না …কিন্তু ইহাতেও প্রাণে ততটা বেদনা পাই নাই যেমন পাইয়াছিলাম যখন দেখিলাম, আমার গৃহিণী মুখে করুণ হাসি ফুটাইয়া ছেঁড়া কাপড় সেলাই করার জন্য নির্মম গর্বিতা প্রতিবাসিনীর নিকট একটি সুঁচ চাহিতেছে।

প্রাচীন যুগের বাঙ্গালীদের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার

আজকাল পোশাক-পরিচ্ছদের কত পরিপাট্য! মাথা হইতে শুরু করিয়া পা পর্যন্ত প্রায় প্রতি অঙ্গেরই পৃথক্ পৃথক্ পোশাকের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সে যুগে এ সকলের বালাই ছিল না। পুরুষেরা মালকোঁচা দিয়া খাটো ধুতি পরিতেন। উহা হাঁটুর নীচে বড় একটা পৌঁছিত না। মেয়েদের শাড়ী গোড়ালি পর্যন্ত নামিত সত্য, কিন্তু উহা নাভির উপরে উঠিত না। তবে কেহ কেহ শরীরের উপরের অংশ ঢাকার জন্য ওড়না ব্যবহার করিতেন, কিংবা বডিসের মত জামা পরিতেন।

পোশাকের পারিপাট্য না থাকিলেও সে যুগে অলঙ্কারের প্রাচুর্য ছিল। শুধু মেয়েরা নয় পুরুষেরাও অসঙ্কোচে অলঙ্কার পরিতেন। অলঙ্কারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল আংটি, কুণ্ডল, হার, বাজু, বালা, মেখলা, মল প্রভৃতি।

সে যুগেও সধবা নারীদের মধ্যে সীমন্তে সিন্দূর ও পায়ে আলতা পরার চল ছিল। বিলাসিনী নারীরা অধরেও আলতা পরিতেন। তরুণীরা অনেক সময় খোঁপায় ফুলের তোড়া গুঁজিয়া দিত। সে যুগে কুঙ্কুম এবং গন্ধ দ্রব্য ব্যবহারেরও চল ছিল।

আজকাল পুরুষেরা কদাচিৎ লম্বা চুল রাখেন। কিন্তু সে যুগে পুরুষেরা সকলেই লম্বা চুল রাখিতেন। কেহ কেহ বড় নখ রাখিয়া তাহাতে রং লাগাইতেন।

সে যুগে খুব কম লোকেই জুতা ও ছাতা ব্যবহার করিতেন।

শরীর সবল ও সুস্থ রাখা একান্ত প্রয়োজন, এ কথা সে যুগের লোকেরা বিশেষভাবেই বুঝিতেন। তাই তাঁহারা শিকার করিতেন এবং মল্লযুদ্ধ, জলক্রীড়া ও অন্য নানারকমের ব্যায়াম করিতেন। মেয়েরা বাড়িতে বাগানের কাজ করিয়া শরীর সুস্থ রাখিতেন।

নাচ-গান, অভিনয় প্রভৃতির দ্বারা সে যুগেও লোকেরা নিজের জীবন আনন্দময় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল বীণা বাঁশী, মৃদঙ্গ, করতাল, ঢাক ও ঢোল।

সে যুগের বাঙ্গালীদের খাদ্য কি ছিল? অনেকটা আজ-কালকারই মত। ভাত, মাছ-মাংস ও শাকশব্জী ছিল প্রধান খাদ্য। দুধ, ঘি, ক্ষীর, পায়স প্রভৃতি ছিল তাঁহাদের অতি প্রিয়।

সে যুগে শুধু শহরের ধনী লোকেরা বিরাট বিরাট প্রাসাদে বাস করিতেন। কিন্তু গ্রামবাসিগণ খুব ধনী হইলেও মাটির ঘরেই বাস করিতেন। মাটি ছাড়া এই ধরনের গৃহের প্রধান উপকরণ ছিল বাঁশ ও খড়।

বাঙলা ভাষা ও লিপির জন্মকথা

কবি অতুলপ্রসাদ গাহিয়াছেন—'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাঙলা ভাষা'। যে বাঙলা ভাষা আমাদের বড় আদরের মাতৃভাষা এবং যাহার জন্য আমাদের গর্বের অন্ত নাই সেই বাঙলা ভাষা কিন্তু খুব বেশী দিনের পুরানো নয়। ইহার বয়স বড় জোর এগারো শত বৎসর। কিন্তু তখনকার বাঙলার সঙ্গে বর্তমান বাঙলার এতই পার্থক্য যে, উহার অর্থ বোঝা বর্তমানে সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এই বিষয় নিয়া যে সব পণ্ডিত বিশেষ ভাবে চর্চা করেন তাঁহারাই উহা বুঝিতে পারেন।

বৌদ্ধদের একটি সম্প্রদায়ের নাম সহজিয়া। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন কবির আবির্ভাব হয়। ইহারা সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত। ইঁহাদের কিছু কিছু কবিতা মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল রাজপ্রাসাদের গ্রন্থাগার হইতে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। এগুলি চর্যাপদ নামে খ্যাত। এই চর্যাপদই বাঙলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে ইহা বইএর আকারে টীকাশুদ্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। চর্যাপদের

অর্থ বোঝা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এখানে দুইটি পদ উদ্ধৃত করিলাম।

(১) কায়া তরুবর পঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চিএ পৈঠো কাল।
দিঢ় করিয় মহা সুহ পরিমাণ
লুই ভনই গুরু পুছিঅ জান॥

(২) মোহবিমুক্কা জই মণা
তবেঁ তুটই অবণা-গমণা।
ন উ দাঢ়ই ন উ তিমই ন চ্ছিজ্জই
পেখ লোঅ মোহে বলি বলি বাঝই॥

অর্থ কিছু বোঝা গেল কি? এখন প্রশ্ন হইল বাঙলা ভাষা কোন্ ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মগধে মাগধী অপভ্রংশ নামে এক ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল মাগধী প্রাকৃত হইতে। এই মাগধী প্রাকৃত হইতেই বাঙলা ভাষার সৃষ্টি। প্রাকৃত এবং পালি এই দুইটি ভাষারই সৃষ্টি হইয়াছিল সংস্কৃত হইতে। সুতরাং বাঙলা ভাষার আদি জননী সংস্কৃত।

আর্যেরা বাঙলায় আসার আগে বাঙলার অধিবাসীরা কথা বলিত অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায়। আজ পর্যন্ত বাঙলায় এই দুইটি ভাষার কতকগুলি শব্দ বর্তমান। লাউ, লেবু, কলা, জাম্বুরা, পাগল, লাঙল, তু তু, চু চু, খাঁ খাঁ করা, প্রভৃতি শব্দ এই জাতীয়।

আমরা যে বাঙলা হরফে লিখি তাহার বয়সও খুব বেশী নয়। পাল সম্রাট্ মহীপালের একটি লিপিতে দেখিতে পাই উ, ক, খ, গ, ধ, ন, ম, ল এবং ক্ষ এই দশটি বর্ণ বর্তমান বাঙলার মত। সেন রাজাদের আমলে দেখিতে পাই প্রায় ২৪টি বর্ণ বর্তমান বাঙলার বর্ণেরই মত। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা হরফ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। মুদ্রা যন্ত্রের প্রবর্তনের পর এই পরিবর্তন বন্ধ হইয়া যায়।

প্রাচীন বাঙলায় শিক্ষার অবস্থা

শিক্ষার প্রতি বাঙ্গালী জাতির আগ্রহ বরাবরই অতি প্রবল। সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে বাঙলার নানা অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সমতটের (পূর্ব-বঙ্গের), কর্ণসুবর্ণের এবং পুণ্ড্রবর্ধনের (উত্তরবঙ্গের) অধিবাসীদের বিদ্যানুরাগের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আজকাল বাঙ্গালীরা বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতের বাহিরে নানা দেশে বহু সংখ্যায় যান। সে যুগে ভারতের বাহিরে না হইলেও তাঁহারা কাশ্মীর পর্যন্ত যাইতেন।

দুঃখের বিষয় কাশ্মীরে বাঙ্গালী ছাত্রদের আচরণের দিক হইতে সুনাম ছিল না। কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র বলেন, গৌড়ের ছাত্রেরা এমন ক্ষীণদেহ লইয়া কাশ্মীরে আসে যে মনে হয় স্পর্শ মাত্রই বুঝি তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু কাশ্মীরের জলবায়ুর গুণে তাহারা অচিরেই বলশালী হইয়া ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দাম্ভিকতা, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষগুলি তাহাদের চরিত্রকে নষ্ট করিয়া দেয়। তাহারা জিনিস কিনিবে ত দাম দিবে না। দাম চাহিলে দোকানীকে ছোরা মারিবে বলিয়া ভয় দেখায়।

সে যুগে বাঙলা দেশে কতকগুলি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল পুণ্ড্রবর্ধনের ভাসুবিহার, রামাবতীর জগদ্দল বিহার, বিক্রমপুর পরগণার বিক্রমপুরী বিহার, চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার, পট্টিকেরার কনকস্তুপ বিহার এবং উত্তরবঙ্গের দেবীকোট বিহার।

সোমপুর বিহারের খ্যাতি ছিল বিশ্ববিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেই রাজসাহী জিলার পাহাড়পুরের নাম কে না জানে? এই পাহাড়পুরই ছিল সে যুগে সোমপুর নামে খ্যাত। সোমপুর বিহার কিরূপ বিশালায়তন ছিল পাহাড়পুর খনন করার ফলে তাহা

স্পষ্টরূপে বোঝা গিয়াছে। বিখ্যাত পাল সম্রাট ধর্মপাল এই বিহারের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বিহারগুলি বৌদ্ধদের হইলেও সেখানে শুধু যে বৌদ্ধ শাস্ত্রই শেখানো হইত তাহা কিন্তু নয়—ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, যোগশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হইত।

শিক্ষাদানের ব্যাপারে বৌদ্ধদের স্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন মন্দিরে কিংবা নিজ নিজ গৃহে নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যাপনা করিতেন। সেযুগে বাঙলার সিদ্ধল ও ভূরিশ্রেষ্ঠ নামক গ্রামে দুইটি ছিল সংস্কৃত শিক্ষার সুবিখ্যাত কেন্দ্র। সিদ্ধলের অধিবাসী ভবদেব ভট্ট ছিলেন বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক।

বাঙ্গালীর সাহিত্য-প্রতিভা

সুবিখ্যাত কবি বাণভট্ট, দণ্ডী, এবং কয়েকজন চৈনিক পর্যটকের রচনা হইতে জানা যায়, হিন্দুযুগে বাঙলায় অনেক বড় বড় কবি ও পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। ইঁহাদের খ্যাতি ছিল ভারতময়। ইঁহাদের রচনার একটা বিশেষ রীতি ছিল। ইহা পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল গৌড়ীয় রীতি নামে। দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের লিখিত অধিকাংশ পুস্তকেরই খোঁজ পাওয়া যায় না।

সে যুগের যশস্বী বাঙ্গালী গ্রন্থকারদের মধ্য হইতে মাত্র কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিলাম।

চক্রপাণিদত্ত—ইনি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। **শূরপাল** কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত করিতে যে সকল উদ্ভিদের প্রয়োজন তিনি তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন শব্দপ্রদীপ এবং বৃক্ষায়ুর্বেদে। লৌহ পদ্ধতি নামক গ্রন্থে তিনি আলোচনা করিয়াছেন ঔষধে কিভাবে লৌহ ব্যবহার করিতে হয়।

ঋষি পালকপ্য—হাতীর চিকিৎসা সম্বন্ধে ইনি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন হস্ত্যায়ুর্বেদ নামক গ্রন্থে।

অভিনন্দ—ইনি পালযুগের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। কাদম্বরী কথাসার নামক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ সম্ভবত ইঁহারই রচনা।

নীতিবর্মা—কীচকবধ নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

সন্ধ্যাকর নন্দী—ইঁহার রচিত অপূর্ব গ্রন্থ রামচরিতের কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

শ্রীহর্ষ—সংস্কৃত ভাষায় পাঁচখানি কাব্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত। ইহার মধ্যে নৈষধচরিত অন্যতম। কবি শ্রীহর্ষ এই কাব্যের রচয়িতা।

সর্বানন্দ—অমরকোষ সংস্কৃত ভাষার সুবিখ্যাত অভিধান। সর্বানন্দ টীকাসর্বস্ব নামে এই অভিধানের একখানি টীকা লিখিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীধর ভট্ট—ইনি দর্শনশাস্ত্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ ন্যায়কন্দলীর লেখক। এই গ্রন্থের খ্যাতি ভারতময়।

গৌড়পাদ—ইনি ছিলেন শঙ্করাচার্যের পরম গুরু, অর্থাৎ গুরুর গুরু। ইনি গৌড়পাদ কারিকা নামক গ্রন্থের লেখক।

ভট্ট ভবদেব—ইনি বর্মবংশীয় যশস্বী রাজা হরিবর্মার মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ইঁহার রচিত তোতাতিত-মত-তিলক, প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ প্রভৃতি গ্রন্থ পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ সমাদৃত।

জীমূতবাহন—ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি বাঙলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহার রচিত দায়ভাগ, ব্যবহার মাতৃকা এবং কালবিবেক গ্রন্থ বিখ্যাত।

অনিরুদ্ধ ভট্ট—ইনি ছিলেন বল্লাল সেনের গুরু। ইঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল ভারতময়। হারলতা এবং পিতৃ-দয়িত নামক গ্রন্থে ইনি অশৌচ, শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা, তর্পণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

হলায়ুধ—ইনি ব্রাহ্মণ সর্বস্ব, মীমাংসা সর্বস্ব, বৈষ্ণব সর্বস্ব, শৈব সর্বস্ব, পণ্ডিত সর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এক মাত্র ব্রাহ্মণ সর্বস্ব ছাড়া ইঁহার আর কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় নাই।

বাঙলার বাহিরে বাঙ্গালী—অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ বাঙ্গালী ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়িতেছে। অথচ কয়েক বৎসর আগেও প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে বাঙ্গালীর প্রভাব ছিল অসামান্য। এই প্রভাবের মূলে ছিল বাঙ্গালী জাতির বিদ্যা বুদ্ধি, চরিত্র-মাহাত্ম্য, কর্মদক্ষতা ও সেবাস্পৃহা। হিন্দু যুগ হইতেই বাঙ্গালী ভারতের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নিঃস্বার্থভাবে জনকল্যাণের পবিত্র ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। ফলে তাঁহারা সর্বত্র অর্জন করিয়াছেন স্থানীয় অধিবাসীদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রীতি।

এখানে কয়েকজন খ্যাতনামা প্রবাসী বাঙ্গালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

গঙ্গাধর—ইনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে যান এবং কার্তিকেয় তপোবন নামক স্থানের সামন্ত রাজা হন।

উদয়রাজ—ইনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দিল্লী যান। চৌহান বংশীয় সম্রাট্ পৃথ্বীরাজ ইঁহার যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। মুহম্মদ ঘুরীর হস্তে পৃথ্বীরাজ নিহত হইলে ইনি দিল্লী উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে লড়াই করিয়া শত্রুমিত্র সকলকে চমৎকৃত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধেই ইনি নিহত হন।

অভয়াকর গুপ্ত—অগাধ পাণ্ডিত্যের গুণে ইনি বিক্রমশীল মহাবিহারের সর্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ইনি ছিলেন দয়ার সাগর। বহু নিঃস্ব ব্যক্তিকে ইনি প্রতিপালন করিতেন। ইনি একজন সুলেখকও ছিলেন।

চন্দ্রগোমী—ইনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ভারত হইয়া সিংহলে যান। পরে ইনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। নানাশাস্ত্রে

ইঁহার বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য ছিল। তাই নালন্দা মহাবিহারের কর্তৃপক্ষ ইঁহাকে মহাবিহারের আচার্য পদে নিযুক্ত করেন। ইঁহার রচিত চন্দ্রব্যাকরণ একখানি প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ গ্রন্থ।

বিশ্বেশ্বর শম্ভু—ইনি মধ্যদেশে আসিয়া গোলকী মঠ নামে একটি মঠের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ইনি বহু মন্দির, শিক্ষায়তন, অন্নসত্র ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত উহাদের পরিচালনা করেন। ইঁহার খ্যাতি সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

লক্ষ্মীধর—ইনি ছিলেন সুবিখ্যাত মালবরাজ ভোজের অন্যতম সভাসদ্।

গদাধর ও তাঁহার বংশধরগণ—গদাধর চন্দেল্লরাজ পরমার্দির অমাত্যপদে নিযুক্ত হইয়া অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁহার বংশধরগণ ছয় পুরুষ যাবৎ এই রাজ্যের মন্ত্রিপদে কিংবা অন্য কোন উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রশংসনীয় যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

শক্তিস্বামী ও তাঁহার বংশধরগণ—শক্তিস্বামীর পিতামহ শক্তি চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তা নদীর মধ্যভাগে একটি অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় তাঁহার অনন্য-সুলভ যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হন এবং তাঁহাকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার পুত্র কল্যাণস্বামীকে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তুলনা করা হইত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে। কল্যাণস্বামীর পৌত্র জয়ন্তও ছিলেন নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বিখ্যাত কবি ও বাগ্মী।

জেতারি—বৌদ্ধশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য জেতারির খ্যাতি ছিল দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত। বিখ্যাত বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি সবিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি এক শত খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।

ভারতের বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্তি

সে যুগের বাঙ্গালীগণ শুধু যে বাঙলার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাসস্থাপন করিয়া নিজেদের মনীষা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়া অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা নয়। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত ও দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং নিজেদের অসামান্য প্রতিভা ও চরিত্র-মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়া সে সব দেশে স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এখানে এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিলাম।

সিংহলে—

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন—

"একদা যাঁহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথও গাহিয়াছেন—

"আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।"

বাঙলার বীর রাজপুত্র **বিজয় সিংহ** কয়েকশত অনুচর লইয়া সিংহল জয় করিলেন এবং সেখানে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গবাসীর মুখ চির-উজ্জ্বল করিলেন। কোন কোন পণ্ডিত কিন্তু বলেন, বাঙলার এ গৌরব কাহিনী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁহাদের মতে বিজয় সিংহ বাঙ্গালী ন'ন, গুজরাটী। আমরা কিন্তু মনে করি বিজয় সিংহ সত্যই বাঙ্গালী ছিলেন।

পরবর্তী কালে সিংহলে আরও বহু বাঙ্গালী গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে **রামচন্দ্র কবি ভারতীর** নাম বিশেষ স্মরণীয়। তর্ক, ব্যাকরণ, শ্রুতি, স্মৃতি, মহাকাব্য, আগম, অলঙ্কার, ছন্দ, জ্যোতিষ, নাটক প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল বিস্ময়কর। সিংহলরাজ তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে বৌদ্ধাগম চক্রবর্তী উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। গ্রন্থকার হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

তিব্বতে—তিব্বতের অধিবাসিগণ বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম প্রচারিত হয় অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে। তাহার পূর্বে তিব্বতের লোকেরা দৈত্য-দানবের পূজা করিত। বৌদ্ধ ধর্ম তিব্বতে তেমন প্রসার লাভ না করায় জনৈক তিব্বতরাজ অত্যন্ত ব্যথিত হন। তাঁহার আমন্ত্রণে বাঙলার দুই জন মহাজ্ঞানী পণ্ডিত **শান্তি রক্ষিত** (বা শান্ত রক্ষিত) পদ্মসম্ভব এবং মগধবাসী **কমলশীল** পদ্মনাভ তিব্বতে যান এবং অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। কালক্রমে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। তখন তিব্বত-রাজ ইহার সংস্কার-সাধনের জন্য ব্যগ্র হইয়া বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষ মহাজ্ঞানী, ধর্মপ্রাণ, পূতচরিত্র দীপঙ্করকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানান। দীপঙ্করের বয়স তখন ৬০ বৎসর। মহাবিহারের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার ছিল তাঁহার উপর। তাই এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে তিনি প্রথমে রাজী হন নাই। কিন্তু রাজা বারংবার ব্যাকুল ভাবে নিমন্ত্রণ করায় দীপঙ্করকে অবশেষে সেখানে যাইতে হইল। তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিব্বতীদের মধ্যে খাঁটি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিলেন। ফলে সেখানকার বৌদ্ধদের মন কুসংস্কারমুক্ত হইল। দীপঙ্করের জীবনের শেষ তেরো বৎসর তিব্বতেই যাপিত হয়। এই সময়ের মধ্যে তিনি নাকি দুইশত খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিব্বতবাসীরা আজ পর্যন্ত বাঙলার এই মহান্ মনীষীকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে।

যবদ্বীপে—যবদ্বীপ ও উহার নিকটবর্তী দ্বীপগুলির সঙ্গে বাঙলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় পাল যুগে। এই সব দেশে বাঙ্গালী বণিককুল আসিয়াছিলেন বাণিজ্যের মারফৎ অর্থ উপার্জন করিতে। বাঙলার অনেক সুদক্ষ স্থপতিও এ সব অঞ্চলে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাভার বিশ্ববিখ্যাত বোরোবুদুরের মন্দিরের নির্মাণ-কার্যে বাঙ্গালী শিল্পীদের দান কিংবা অনুপ্রেরণা ছিল, অনেকে এরূপ মনে করেন।

যবদ্বীপে যে সকল বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে **কুমারঘোষের** নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করার যোগ্য। তিনি ছিলেন যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র-বংশীয় সম্রাট্‌দের গুরু। গুরুকে সম্রাট দেবতাজ্ঞানে সম্মান করিতেন।

চীনে—চীনের সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক অতি প্রাচীন কাল হইতে। সেযুগে চীনা পরিব্রাজকেরা যেমন বাঙলায় আসিতেন বাঙ্গালী প্রচারকগণও তেমনি চীনে যাইতেন। যে ক'জন বাঙ্গালী নানা কারণে চীনবাসীদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে **আচার্য বোধিধর্মের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি চীনে যান স্বয়ং চীন-সম্রাটের আমন্ত্রণে। চীনবাসিগণ তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হন। কালক্রমে তাঁহার খ্যাতি সমগ্র বৌদ্ধ জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রজ্ঞাপারমিত সূত্র ও উষ্ণীষ বিজয় নামে তাঁহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ বৌদ্ধগণ অমূল্য সম্পদ্ বলিয়া মনে করেন। এই গ্রন্থ দুইখানি অতীব যত্নের সহিত রক্ষিত আছে জাপানের প্রসিদ্ধ হরিয়জি মঠে।

প্রাচীন যুগের বাঙ্গালীদের শিল্প-নৈপুণ্য

প্রাচীন যুগের বাঙ্গালীগণ শুধু যে কৃষি ও বাণিজ্যে দক্ষ ছিলেন তাহা নয়। নানাবিধ শিল্পেও তাঁহাদের প্রশংসনীয় দক্ষতা ছিল। এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিলাম।

স্থাপত্য শিল্প—বাঙলায় পাথরের অভাব, তাই বাঙ্গালী স্থপতিদের কাজ করিতে হইত ইঁটের সাহায্যে। বাঙলার আর্দ্র আবহাওয়া ও নদীপ্লাবন প্রভৃতির ফলে ইঁটের তৈরী অধিকাংশ জিনিসই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই বাঙ্গালী স্থপতিদের স্থাপত্য-দক্ষতা সম্বন্ধে বিচার করার সুযোগ নিতান্তই সামান্য।

কালের ধ্বংসপ্রবণতাকে উপেক্ষা করিয়া যে কয়েকটি সৌধ, মন্দির প্রভৃতি এখনও দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হইল **বরাকরের মন্দির,** বাঁকুড়া জিলার বাহুলাড়ার **সিদ্ধেশ্বরের মন্দির** এবং দেহারের **সরেশ্বর ও সল্লেশ্বরের মন্দির** বর্ধমান জিলার **দেউলিয়াঁর মন্দির** ও সুন্দরবনের **জটার দেউল**। বরাকরের মন্দিরের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের প্রাচীন পরশুরামের মন্দিরের বেশ সাদৃশ্য আছে।

পাহাড়পুরের সুবিশাল মন্দির বাঙলার স্থপতিদের অক্ষয় কীর্তি। এই মন্দিরের উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহার উচ্চতা ৭০ ফুট। প্রথম দৃষ্টিতেই নিঃসন্দেহে বোঝা যায় অতি সুদক্ষ শিল্পীদের দ্বারা এই মন্দির পরিকল্পিত ও নির্মিত হইয়াছিল। পাহাড়পুরের একটি বিহারের ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম সোমপুর বিহার। ইহা নির্মাণ করেন পাল সম্রাট্ ধর্মপাল। এত বড় বিশাল অথচ নয়ন-মনোহর বিহার সমগ্র ভারতে আর একটিও নির্মিত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি লিপিতে ইহাকে 'সমগ্র জগতের নয়নের একমাত্র বিশ্রামস্থল' অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভাস্কর্য—বাঙলা দেশে পাথরের অভাবে ইঁট দিয়া মন্দির, বিহার প্রভৃতি নির্মিত হইত সত্য, কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ দেশে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও বৌদ্ধদের দেব-দেবীর মূর্তি পাথর খুদিয়াই নির্মিত হইত। পাথর সম্ভবত নদীপথে রাজমহল হইতে আনা হইত। বাণগড়ে বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত কুমারপুরে রাজসাহী জিলার নিয়ামৎ-পুরে এবং সুন্দরবনের কয়েকটি অঞ্চলে বহু প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালী ভাস্করেরা পাথর দিয়া শুধু যে মূর্তি তৈয়ারী করিতেন তাহা নয়। তাঁহারা মন্দির প্রভৃতির প্রাচীরে খুদিয়া নানাপ্রকার শিল্পকাজও করিতেন। পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে দেখিতে পাই রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনী ক্ষোদিত। ইহা ছাড়া মানুষের বাস্তব জীবনের বহু ঘটনা, যেমন মেয়েদের মনোহর ভঙ্গিতে নৃত্য, শিশুকে কোলে করিয়া মাতার কূয়া হইতে জল তোলা, দারোয়ানের

লাঠিতে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঝিমানো—এ সবও শিল্পীরা খোদাই করিয়াছেন। অবশ্য প্রত্যেকটি চিত্রই যে নিখুঁত তাহা নয়। কোন কোনটি নিতান্ত আনাড়ী শিল্পীর কাজ।

তারানাথ নামে তিব্বতের একজন লামার গ্রন্থ হইতে জানা যায়, বাঙলার **ধীমান** ও **বিটপাল** পাথর খুদিয়া এমন সব মূর্তি তৈরী করিতেন যে উহা দেখিলে আর চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করিত না।

ধাতুশিল্প—রামচরিত পাঠে জানা যায় সে যুগের শিল্পিগণ হীরা, মুক্তা, পান্না, পদ্মরাগমণি, নীলকান্তমণি প্রভৃতি দিয়া সুনিপুণ হস্তে অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেন।

বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি হইতে জানা যায়, সেন রাজাদের আমলে শুধু ভদ্রশ্রেণীর গৃহস্থগণ নয় রাজবাড়ীর ভৃত্যদের স্ত্রীরা পর্যন্ত স্বর্ণ, মণি-মাণিক্য ও মুক্তার অলঙ্কার পরিত। সুতরাং সে যুগের শিল্পীরা যে এই সব ধাতুশিল্পে নিপুণ ছিলেন সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পোড়ামাটির শিল্প—পাথরের অভাবে বাঙলার শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রেই পোড়ামাটি দিয়া কাজ করিয়া তাঁহাদের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেন।

মহাস্থান, ময়নামতী, সাভার, রামপাল, পাহাড়পুর, বেড়াচাঁপা, পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি নানা স্থানে পোড়ামাটির শিল্পের অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পোড়ামাটি দিয়া বাসনপত্র, দোয়াত, প্রদীপ প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য ত নির্মিত হইতই, তাহা ছাড়া দেব-দেবীর মূর্তি ও অন্য নানা প্রকার মূর্তিও তৈরী হইত। মল্লবীর কুস্তি করিতেছে, মেছোনী মাছ কাটিতেছে, নারী নৃত্য করিতেছে, ব্রাহ্মণ পূজা করিতেছেন, অস্থিচর্মসার সন্ন্যাসী তপস্যা করিতেছেন,—এই সব অত্যন্ত কৌতুকজনক।

বস্ত্রশিল্প—বাঙলার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি খ্রীষ্টপূর্ব যুগ হইতে। কৌটিল্যের বিখ্যাত গ্রন্থ **অর্থশাস্ত্রে** **ক্ষৌম**, **দুকূল**, **পত্রোর্ণ** ও

কার্পাসিক বাঙলার এই চারি প্রকার বস্ত্রশিল্পের বর্ণনা পাই। ক্ষোম হইল মসিনার ছালে প্রস্তুত সূক্ষ্ম বস্ত্র। উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম দুকূল। কৌটিল্য এই দুকূলের প্রশংসা করিয়াছেন উচ্ছ্বসিত ভাষায়। পত্রোর্ণ অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় রেশম বস্ত্র।

জনৈক গ্রীক লেখকের গ্রন্থ হইতে জানা যায়, সে যুগে বাঙলার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল সূক্ষ্ম মসলিন। আরব বণিক সুলেমান, ইটালিয়ান পর্যটক মার্কো পোলো, চৈনিক পরিব্রাজক মা হুয়ান প্রভৃতি বাঙলার বস্ত্রশিল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। রোম, মিশর প্রভৃতি দেশের ধনী ব্যক্তিগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই উচ্চ মূল্য দিয়া বাঙলার সূক্ষ্ম বস্ত্র কিনিতেন।

বাঙলার কথা

মধ্য যুগ

মুসলিম যুগে বাঙলা

বক্তিয়ার খলজী—ইক্তিয়ার উদ্দীন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার যখন পশ্চিম বাঙলা জয় করেন তখন দিল্লীর মসনদে ছিলেন সুলতান কুতুবউদ্দীন। বক্তিয়ার দিল্লীতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে কুতুবউদ্দীন তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং বঙ্গ ও বিহারের শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া লন।

বক্তিয়ার ইহার পর মাত্র দুই বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপর মস্‌জিদ নির্মাণ করেন এবং বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন।

বক্তিয়ার দেবীকোটে দারুন জ্বর রোগে শয্যাশায়ী। চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহারই অন্যতম অনুচর আলি মর্দান তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করিলেন (১২০৬)। এই হত্যার ফলে শুরু হইল তুমুল গৃহ-যুদ্ধ। আলি মর্দান যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দী হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিয়া দিল্লীতে সুলতান কুতুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কুতুব এই হত্যাকারীকে অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়া লন বাঙলায় তাঁহার রাজপ্রতিনিধি বলিয়া। আলি মর্দান ছিলেন অত্যন্ত হৃদয়হীন। তাঁহার কুশাসনে বাঙলায় হাহাকার শুরু হইল। চরিত্রহীন চাটুকারের দল তাঁহার দরবারে সম্মানের আসন লাভ করিল। কুতুবউদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আলি মর্দান নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার অত্যাচার সীমা ছাড়াইয়া গেল। রাজ্যের

আমিরগণ শীঘ্রই বাঙলাকে রক্ষা করিলেন এই অত্যাচারী সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া। বাঙলার নূতন সুলতান হইলেন গিয়াস্‌উদ্দীন ইয়াজ খিলজী (১২১৩-'২৭)।

গিয়াস্‌উদ্দীন ছিলেন সুযোগ্য রাজা। তিনি রাজধানী দেবীকোট হইতে গৌড়-লক্ষ্মণাবতীতে স্থানান্তরিত করেন এবং রাজ্যের নানা স্থানে বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, দুর্গ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসনে লক্ষ্মণাবতীতে এবং বিহারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিস বাঙলার এই স্বাধীন রাজার বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠাইলেন যুবরাজ নাসির্‌-উদ্দীনের নেতৃত্বে। যুদ্ধে গিয়াস্‌উদ্দীন পরাভূত হইলেন। ইলতুতমিসের সৈন্যাধ্যক্ষের নির্দেশে গিয়াস্‌উদ্দীনের শিরশ্ছেদ করা হইল।

অতঃপর বিজয়ী নাসিরউদ্দীন বাঙলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। অযোধ্যাও ছিল তাঁহার শাসনাধীন। মাত্র দেড় বৎসর রাজ্য শাসন করার পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃতদেহ দিল্লীতে পৌছিলে সুলতান ইলতুৎমিস শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। তাঁহার কবরের উপর নির্মিত হইল এক অতি মনোহর সমাধি-মন্দির।

দিল্লীর সুলতান বলবনের রাজত্বকালে বাঙলার শাসনকর্তা ছিলেন আমিন খাঁ এবং সহকারী শাসনকর্তা ছিলেন তুগ্রিল খাঁ (১২৬৮-১২৮১)। প্রকৃত পক্ষে তুগ্রিল খাঁই ছিলেন শাসন ব্যাপারে সর্বময় কর্তা। আমিন খাঁ ছিলেন তাঁহার হাতের পুতুল।

কথিত আছে এই সময়ে ত্রিপুরার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রত্ন ফার সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ফার সিংহাসন লইয়া বিরোধ বাধে। রত্ন ফা এই বিরোধের সময়ে তুগ্রিল খাঁর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তুগ্রিল অবিলম্বে ত্রিপুরায় আসেন এবং রাজা ফাকে পরাস্ত করিয়া রত্ন ফাকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রত্ন ফা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন

স্বরূপ তাঁহাকে একটি মূল্যবান্ রত্ন উপঢৌকন দেন। তুগ্রিল খাঁ বিনিময়ে তাঁহাকে 'মাণিক্য' এই উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। তদবধি এই রাজবংশের প্রত্যেক রাজারই উপাধি ছিল 'মাণিক্য'।

এক সময় বলবন পীড়িত হইয়া পড়িলে বাঙলায় জনরব রটিল বলবনের মৃত্যু হইয়াছে। অমনি তুগ্রিল নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এবার আমিন খাঁ সাহস সঞ্চয় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। যুদ্ধে আমিন খাঁর পরাজয় হইল। এদিকে বলবন আরোগ্য লাভ করিয়াই তুগ্রিল খাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার আরোগ্য উপলক্ষে তিনি যেন যথাযোগ্য ভাবে একটি আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন। তুগ্রিল সুলতানের এই অনুরোধ তীব্র অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিলেন। তিনি মুঘুস্‌উদ্দীন উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীন সুলতানরূপে বাঙলায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বলবন অবিলম্বে তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিলেন অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক তুর্মাতির নেতৃত্বে (১২৭৮)। যুদ্ধে তুর্মাতি পরাজিত হইলেন। ক্রুদ্ধ সুলতানের আদেশে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইল অযোধ্যার প্রবেশ-দ্বারে। পর বৎসর অন্য এক সেনাপতির নেতৃত্বে আর একটি বাহিনী প্রেরিত হইল। এই বাহিনীও পরাস্ত হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

এবার বলবন স্বয়ং তুগ্রিল খাঁকে সায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে বাঙলার দিকে যাত্রা করিলেন। এরূপ সুসজ্জিত বিরাট বাহিনী বাঙলায় কেহ কখনও দেখে নাই। তুগ্রিল বুঝিলেন, বলবনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিয়া লওয়া। তাই তিনি লক্ষ্মণাবতী নগরী জনশূন্য করিয়া সসৈন্যে জাজপুরের দিকে যাত্রা করিলেন।

একদিন তুগ্রিলের বাহিনী নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিয়া মদ্যপান, গান-বাজনা ও আমোদ-উৎসবে গা ভাসাইয়া দিল।

তুগ্রিলের হাতী, ঘোড়া, গরু প্রভৃতি ভূরি ভোজে মত্ত হইল। অকস্মাৎ একদল সশস্ত্র সৈন্য আসিয়া তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তাহাদের প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। সে এক অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। তুগ্রিল নদী সাঁতরাইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে গিয়া শত্রুহস্তে ধরা পড়িলেন। তরবারির আঘাতে তাঁহার শির দেহচ্যুত হইল (১২৮২)।

বলবন জয়োল্লাসে প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বহু সহস্র বন্দী লইয়া রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণাবতীর বাজার ছিল দৈর্ঘ্যে দুই মাইল। এই সুদীর্ঘ বাজারের উভয় পার্শ্বে ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইল। তুগ্রিলের পুত্র, জামাতা, সেনাপতি এবং বন্দী সৈন্যদিগকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইল। বলবনের উদ্দেশ্য ছিল বাঙলাময় এমন দারুণ ভীতির সঞ্চার করা যাহাতে আর কেহ কখনও বিদ্রোহের কথা কল্পনায়ও আনিতে সাহস না পায়।

বাঙলায় তিন বৎসর থাকিয়া, ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া বলবন দিল্লী যাত্রা করিলেন। তিনি বাঙলার শাসন-ভার ন্যস্ত করিয়া গেলেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খাঁর উপর। তিনি বুগরা খাঁকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, তিনি যেন আমোদ-প্রমোদে গা ভাসাইয়া না দিয়া একমনে রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু এই সতর্কবাণী তাঁহার কানে আদৌ পৌঁছিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে আকণ্ঠ মজিয়া রহিলেন। এদিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। বলবন গভীর শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অচিরেই বুগরা খাঁর ডাক পড়িল দিল্লীতে। দিল্লীর মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারী এখন তিনিই। বুগরা খাঁ কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছায় বাঙলা ছাড়িয়া দিল্লী গেলেন।

বাদশাহীর ঝঞ্ঝাট অনেক। বুগরা খাঁর ধাতে তাহা সহ্য হইবার নয়। দিল্লীর আবহাওয়ায় তাঁহার দম যেন বন্ধ হইবার উপক্রম

হইল। তাই দুই মাস যাইতে না যাইতেই তিনি বাঙলায় পলাইয়া আসিলেন। শোকার্ত বৃদ্ধ বলবন ইহার কয়েক মাস পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন (১২৮৬)। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে মনোনীত করিলেন তাঁহার এক পৌত্র কাই খসরুকে। কিন্তু মন্ত্রী নিজামউদ্দীন নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাই খসরুকে সরাইয়া বুগরা খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। কায়কোবাদ ছিলেন বুগরা খাঁর নয়নের মণি। তিনি তাঁহাকে নিজের চোখে চোখে রাখিয়া অত্যন্ত যত্নের সঙ্গেই মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু নিজামউদ্দীনের চক্রান্তে তিনি অচিরেই কুসঙ্গীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেন।ইহার ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার চরিত্র, তাঁহার স্বাস্থ্য সবই নষ্ট হইয়া গেল। তিনি দিল্লী ত্যাগ করিয়া কিলুখারি নামক স্থানে এক সুরম্য প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে অবিরাম নাচ-গান ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে তিনি ডুবিয়া রহিলেন।

এদিকে বুগরা খাঁ 'নাসিরউদ্দীন' এই নূতন উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাঙলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। পুত্রের নৈতিক অধঃপতনের সংবাদে তিনি যারপরনাই মর্মাহত হইয়া তাঁহাকে মূল্যবান্ উপদেশপূর্ণ কয়েকখানা চিঠি লিখিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলিল না। বুগরা খাঁ এখন স্থির করিলেন চরিত্রহীন অযোগ্য পুত্রকে সরাইয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হয় তাঁহার এই সঙ্কল্প। তাঁহার নিজের জীবনও কলঙ্কশূন্য ছিল না। যাহা হউক, তিনি পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এক বিরাট বাহিনী সহ অযোধ্যার দিকে যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার বিরুদ্ধেও এক বাহিনী প্রেরিত হইল। পিতা-পুত্রে যুদ্ধ বাধে। এমন সময় কয়েকজন ওমরাহের পরামর্শে মীমাংসার প্রস্তাব উঠিল। স্থির হইল, একটি নির্দিষ্ট দিনে নাসিরউদ্দীন (বুগরা খাঁ) সুলতান কায়কোবাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন মীমাংসার সর্ত আলোচনা করার জন্য।

তখন অপরাহ্ন। নাসিরউদ্দীন নৌকা-যোগে সরযূ নদী পার হইতেছেন। সুলতান কায়কোবাদ নদী-তীরে দরবার কক্ষে বসিয়া আছেন। নাসিরউদ্দীন (বুগরা খাঁ) উপরে উঠিতেই কায়কোবাদ সিংহাসন হইতে উঠিয়া নগ্নপদে ছুটিয়া গিয়া পিতার পাদবন্দনা করিতে উদ্যত হইলেন। পুত্রের এরূপ বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখিয়া অপরিসীম আনন্দে নাসিরউদ্দীনের চোখে জল আসিল। তিনি পুত্রকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। কায়কোবাদ করজোড়ে পিতাকে বলিলেন, দিল্লীর মসনদ তাঁহার, সুতরাং তিনি অনুগ্রহ করিয়া মস্‌নদে আরোহণ করুন, নাসিরউদ্দীন দৃঢ়তার সহিত উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং পুত্রকে হাতে ধরিয়া লইয়া সিংহাসনে বসাইলেন।

কায়কোবাদ পুত্র হইলেও দিল্লীর সুলতান, তিনি তাঁহার অধীন একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা মাত্র। তাই তিনি যথারীতি কর-জোড়ে সুলতান কায়কোবাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কায়কোবাদ ইহাতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিলেন এবং পুনরায় সিংহাসন হইতে উঠিয়া পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সমবেত আমির-ওমরাহগণ এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং তাঁহাদের উভয়ের মস্তকে স্বর্ণ ও মণি-মাণিক্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে নাসিরউদ্দীন পুত্রকে বহু উপদেশ দিয়া সাশ্রু-নেত্রে বাঙলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার মনের পুঞ্জীভূত বেদনা আজ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। কিন্তু কয়েক মাস অতীত হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল খিলজীগণ কায়কোবাদকে হত্যা করিয়া তাঁহার শিশুপুত্র কায়মুর্সকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন। এই নিদারুণ ঘটনার কয়েক দিন পরেই শিশু সুলতান নিহত হইলেন আরকুলি খাঁর হস্তে। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন আরকুলি খাঁর পিতা জালালউদ্দীন খিলজী। এরূপভাবে দিল্লীর দাস-বংশের বিলুপ্তি হইয়া খিলজী-বংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

এই নিদারুণ শোকে নাসিরউদ্দীন (বুগরা খাঁ) একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। সিংহাসনের প্রতি তাঁহার মনে তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মিল। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং কিছুদিন পরেই মৃত্যুর শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

বাঙলার মসনদে বসিলেন তাঁহার পুত্র কৈকুয়স রুকনুদ্দীন।

রুকনুদ্দীনের পরে বাঙলার মসনদে বসিলেন সুলতান সামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-'২২)।

ফিরোজ শাহ তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন পাণ্ডুয়ায় এবং উহার নাম রাখিলেন ফিরোজাবাদ। বাঙলার সুলতানদের মধ্যে ফিরোজের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার রাজত্বকালেই মুসলিম আধিপত্য বিস্তৃত হয় বর্তমান ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্ট জিলায়।

ফিরোজ শাহের সর্বপ্রধান শত্রু ছিলেন তাঁহারই নিজের পুত্রগণ। ইঁহাদের মধ্যে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর ছিলেন অত্যন্ত দুর্দান্ত। তিনি স্বাধীন রাজারূপে অপ্রতিহত প্রভাবে লক্ষ্মণাবতী হইতে রাজকার্য পরিচালনা করেন।

এই সময়ে দিল্লীর সুলতান ছিলেন গিয়াস্উদ্দীন তুঘলক। তিনি ত্রিহুত জয় করিয়া এক বিশাল বাহিনীসহ বাঙলায় আসেন এবং বাহাদুরকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। বাহাদুর বন্দী হইলেন। তাঁহাকে গলায় দাড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ফিরোজ শাহের অন্যতম পুত্র নাসিরউদ্দীন ইতিপূর্বেই উত্তর বঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক তাঁহাকে উত্তর বঙ্গের শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ফিরোজ শাহের পালিত পুত্র বহরম খাঁ (তাতার খাঁ) সোনারগাঁ এবং সপ্তগ্রামের স্বাধীন রাজারূপে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনিও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করায় লাঞ্ছনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

বাঙলার অভিযান শেষ করিয়া গিয়াসুদ্দীন তুঘলক দিল্লী যাত্রা করিলেন। তিনি দিল্লী পৌঁছা মাত্র তাঁহাব পুত্র জুনা খাঁ তাঁহার সম্মানার্থে একটি আনন্দোৎসবের আয়োজন করিলেন। এই উপলক্ষে নির্মিত হইল একটি দারু-গৃহ। বৃদ্ধ সুলতান কনিষ্ঠ পুত্রসহ যেই এই গৃহে প্রবেশ করিলেন, অমনি উহা সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা উভয়েই নিহত হইলেন এবং জুনা খাঁ মহম্মদ তুঘলক নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বৃদ্ধ সুলতানকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই যে জুনা খাঁ বিশেষ কৌশলের সঙ্গে এই গৃহটি নির্মাণ করিয়াছিলেন এরূপ সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। মহম্মদ তুঘলকের একান্ত শ্রদ্ধাভাজন ইবন বতুতা পর্যন্ত তাঁহার গ্রন্থে এরূপ সন্দেহের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। মহম্মদ তুঘলকের ন্যায় খামখেয়ালী এবং হৃদয়হীন রাজা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বাঙলার উপর মহম্মদ তুঘলকের প্রখর দৃষ্টি ছিল। বাঙলার শাসনকর্তাদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। বন্দী বাহাদুরকে তিনি সসম্মানে মুক্তি দিয়া সোনারগাঁয়ে রাজপ্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলেন। ফলে বহরম খাঁর ক্ষমতা বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইল। কিছু দিন পরে তিনি উত্তর-বঙ্গের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দীনকে পদচ্যুত করিয়া সমরবিভাগে একটি উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন। মহম্মদ তুঘলক ভাবিলেন, বাঙলা সম্বন্ধে তাঁহার আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি সংবাদ পাইলেন অকৃতজ্ঞ বাহাদুর বিদ্রোহী হইয়াছেন এবং সমগ্র বঙ্গের অধিপতিত্বের জন্য লড়াই করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। তিনি অবিলম্বে বহরম খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। বাহাদুর পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলেন। তাঁহাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইল। তাঁহার গায়ের চামড়া উপড়াইয়া ফেলিয়া সর্ব সাধারণের দেখার জন্য একটি বিজয়-গম্বুজে ঝুলাইয়া রাখা হইল।

এই সময়ে তিনি বাঙলার তিনটি অঞ্চলে তিন জন পৃথক শাসন-কর্তা নিযুক্ত করেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে কাদের খাঁ, দক্ষিণ বঙ্গের রাজধানী সপ্তগ্রামে মালিক ইজুদ্দীন এবং পূর্ববঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁয়ে বহরম খাঁ। বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ফখর্‌উদ্দীন সোনারগাঁয়ের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পরে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এদিকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা কাদের খাঁ শত্রুহস্তে নিহত হইলে তাঁহার সেনাপতি আলি মোবারেক লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া স্বাধীন রাজারূপে রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নূতন উপাধি হইল আলাউদ্দীন আলি শাহ। অচিরেই ইলিয়াস নামে তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সঙ্গে তাঁহার সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ শুরু হয়। ইলিয়াস যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দক্ষিণবঙ্গে চলিয়া যান এবং সেখানে স্বাধীন রাজা রূপে রাজত্ব করিতে থাকেন।

মহম্মদ তুঘলক বাঙলাকে দমনে রাখার উদ্দেশ্যে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এমনি ভাবে একে একে তাহা সম্পূর্ণ-রূপেই বানচাল হইয়া গেল।

সোনারগাঁয়ের স্বাধীন রাজা ফখর্‌উদ্দীন ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ফকিরদের প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস ছিল। এক সময়ে তিনি সায়দা নামে জনৈক ফকিরের উপর সাময়িকভাবে রাজ্য শাসনের ভার ন্যস্ত করিয়া রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যান। কিন্তু কিছু দিন পরেই ফকির সুলতানের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এবং তাঁহার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিয়া। প্রজাদের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে বিদ্রোহী ফকির অনতিবিলম্বে সদলবলে ধরা পড়িলেন। তাঁহাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইল। ফখরউদ্দীন প্রজাদের নিকট হইতে মূল্যবান উপহার স্বরূপ লাভ করিলেন বিদ্রোহী ফকিরের ছিন্ন শির।

ফখরউদ্দীনের রাজত্বকালে মরক্কোদেশীয় পর্যটক ইবন বতুতা এক এক বিখ্যাত ফকিরের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় শ্রীহট্টে আসেন। কথিত আছে এই ফকির প্রতিদিন প্রত্যূষে নামাজ পড়িতেন মক্কায় এবং দিনের অবশিষ্ট অংশ উপাসনায় মগ্ন থাকিতেন শ্রীহট্টের একটি গুহায়।

ইবন বতুতা বাঙলা ভ্রমণের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে বাঙলার তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। মহম্মদ অল্ মাসুদী নামে মরোক্কো দেশের জনৈক অধিবাসী, দীর্ঘদিন যাবৎ সস্ত্রীক বাঙলায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি নাকি ইবন বতুতাকে বলিয়াছিলেন, বৎসরে খোরাকী বাবদ তাঁহাদের ব্যয় হয় মাত্র সাড়ে সাত টাকা। সংসারে তাঁহারা সব সুদ্ধ ছিলেন তিন জন। তিন জন লোকের খোরাকী খরচ বার্ষিক মাত্র সাড়ে সাত টাকা, এ কথা আজকাল কেহ বলিলে বক্তাকে পাগল ছাড়া অন্য কিছু বলিবে কি?

ইলিয়াস শাহের কথা আগেই বলিয়াছি। তিনি দক্ষিণবঙ্গে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমগ্র বঙ্গে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। মহম্মদ তুঘলকের কল্পনাতীত অত্যাচারের ফলে যখন ভারতের সর্বত্র চরম অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল তখন ইলিয়াস শাহ দিগ্বিজয়ের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সসৈন্যে ত্রিহুত যাত্রা করিয়া সেখানকার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা হরিসিং দেব এবং কামেশ্বর দেবকে পরাস্ত করিলেন। ফলে ত্রিহুত তাঁহার অধিকারে আসিল। ইহার পর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল নেপালের দিকে। তিনি নেপালে প্রবেশ করিলে নেপালরাজ জয়-রাজদেব তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য অণুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। বিজয়ী ইলিয়াস শাহ কাঠমণ্ডু শহরের সুবিখ্যাত স্বয়ম্ভূ স্তূপ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন। তাঁহার হস্তে আরও বহু বৌদ্ধ মন্দির বিধ্বস্ত হইল।

এই সময়ে বাঙলার দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদী হইতে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল উড়িষ্যা জনপদ। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে এই দেশটি ছিল শক্তি ও সমৃদ্ধির দিক হইতে

অতুলনীয়। পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির, কোনারকের সূর্য মন্দির, ভুবনেশ্বরের কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রার মন্দির এ যুগেরই অক্ষয় কীর্তি। উড়িষ্যাদেশের অফুরন্ত ধন-সম্পদ ভারতের মুসলিম রাজাদের ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের সাধ্য ছিল না যে, এই দেশের বীর রাজা ৩য় অনঙ্গভীম, ১ম নরসিংহ এবং ২য় নরসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া সাফল্য অর্জন করেন। ইলিয়াস শাহের এখন সঙ্কল্প হইল, কোন মুসলমান রাজা এতদিন যাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন নাই, নিজ বাহুবলে তিনি তাহা সম্পন্ন করিবেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যা দেশের চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং লুণ্ঠনের ফলে প্রচুর মূল্যবান দ্রব্য লাভ করেন। ইহার পরে তিনি গোরক্ষপুর ও চম্পারণের হিন্দু রাজাদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ফলে এই উভয়ের রাজ্যের রাজাই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লন।

ইলিয়াস শাহ এইরূপে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার খ্যাতি বাঙলার সীমানা অতিক্রম করিয়া দূর দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই যশোগৌরব বেশী দিন স্থায়ী হইল না। দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। আশ্চর্য, এতদিনের দুর্জয় বীর ইলিয়াস ফিরোজ শাহের সম্মুখীন হইতেই সাহসী হইলেন না। তিনি তাঁহার রাজধানী পাণ্ডুয়া ত্যাগ করিয়া একডালা নামক একটি সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এদিকে ফিরোজ বিনা বাধায় পাণ্ডুয়া অধিকার করিলেন। তিনি অধিবাসিগণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তাহাদের ধন ও প্রাণ সম্বন্ধে ভয়ের বিন্দুমাত্র কারণ নাই। তিনি তাহাদের দেয় খাজনা সে বৎসরের মত হ্রাস করিবেন এবং উলেমা ও আমির-ওমরাহদের জায়গীর ও বৃত্তি বাড়াইয়া দিবেন, এরূপও ঘোষণা করিলেন। বলা বাহুল্য, ফিরোজের উদ্দেশ্য ছিল এই সব প্রতিশ্রুতিদ্বারা ইলিয়াসের প্রজাগণকে স্বপক্ষে টানিয়া আনা।

ইলিয়াস শাহ একডালা নামক যে দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহা দিনাজপুরে অবস্থিত। মহানদীর দুইটি শাখা বালিয়া এবং চিরামতি দ্বারা বেষ্টিত—এঁটেল মাটির দ্বারা নির্মিত একটি বিশাল প্রাকার এবং ষাট ফুট প্রস্থবিশিষ্ট একটি পরিখা দ্বারা উহা ছিল সুরক্ষিত। ইলিয়াস এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁহার সমগ্র বাহিনীসহ। রাজধানীর অভিজাত সম্প্রদায়ও সপরিবারে এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

ফিরোজ তুঘলক এই দুর্ভেদ্য স্থানটি অধিকার করার জন্য প্রভূত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইল। ফিরোজ তুঘলক তখন একটি কূটনৈতিক চাল চালিলেন। কয়েকজন ফকিরের দ্বারা তিনি প্রচার করাইলেন, সুলতান ফিরোজ তুঘলকের বাহিনী অত্যন্ত বিপন্ন, তাহাদের আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত।

ইলিয়াস উৎফুল্ল হইয়া একডালা হইতে সসৈন্যে বাহির হইয়া আসিলেন। সুলতানের বাহিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল একডালা হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হইল। বাঙ্গালীসৈন্যেরা প্রাণপণে শত্রু সৈন্যকে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সন্ধ্যার পূর্বেই শোচনীয়ভাবে পরাভূত হইল। তাহাদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিল।

সুলতান ফিরোজ তুঘলক তখন চলিলেন একডালার দুর্গটি ভাঙ্গিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে। এই সময়ে দুর্গস্থ মুসলিম মহিলাগণ অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া অতি করুণস্বরে কাঁদিতে শুরু করিলেন। এই দৃশ্যে সুলতানের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি দুর্গের অতটুকুও ক্ষতি না করিয়া শান্তভাবে সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

পরাজিত হইলেও ইলিয়াস শাহ কিন্তু সিংহাসনচ্যুত হইলেন না। তবে তাঁহার রাজ্যসীমা বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইল। লক্ষ্মণাবতীর

পশ্চিম দিকে তাঁহার রাজ্যের যে বিশাল অংশ ছিল*, ফিরোজ তুঘলক তাহা অধিকার করিয়া লইলেন। ইলিয়াস শাহ অবশিষ্ট জীবন ফিরোজ তুঘলকের সঙ্গে মৈত্রীভাব বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহের একটি প্রধান কীর্তি কামরূপ জয়। তাঁহার পূর্বে গিয়াসউদ্দিন ইয়াজ এবং মালিক উজবেক কামরূপ জয়ের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ। ফিরোজ তুঘলক (১৩৫৭-১৩৮৯) তাঁহার রাজত্বকালে পুনরায় বঙ্গদেশ জয় করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন।

সিকন্দর শাহ তাঁহার পিতার ন্যায় সুশাসক ছিলেন। ফলে রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। আদিনার সুবিখ্যাত মসজিদটি তাঁহারই অমর কীর্তি। ইহা আকারে দামাস্কাসের বিশ্ববিখ্যাত মসজিদের সমতুল্য। বহু হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার মাল-মসলার সাহায্যে এই অনুপম মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি এই মসজিদের বিভিন্ন অংশে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায়।

সিকন্দরের শেষ জীবন পারিবারিক কলহে অত্যন্ত অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার সতেরোটি পুত্রের জন্ম হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জন্মে মাত্র একটি পুত্র। তিনি এই শেষোক্ত পুত্রকেই সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিতেন। অন্য পুত্রদের প্রতি তাঁহার তেমন স্নেহ ছিল না। কিন্তু প্রথমা স্ত্রী সতীন পুত্রের বিরুদ্ধে সুলতানের কানে এমন কতকগুলি কথা বলিলেন যাহাতে প্রাণাধিক পুত্রের বিরুদ্ধে তাঁহার মন তীব্র বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজপুত্র শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিলেন এবং পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সোনারগাঁ এবং সপ্তগ্রাম জয় করিয়া লইলেন। তিনি

* ইলিয়াস শাহের রাজ্যের পশ্চিম সীমা বিস্তৃত ছিল কাশী পর্যন্ত।

সিংহাসনে আরোহণ করিলেন গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ নাম ধারণ করিয়া (১৩৮৯)।

গিয়াসউদ্দীন ছিলেন পরাক্রমশালী রাজা। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। পারস্যের বিশ্ববিখ্যাত কবি হাফেজের সঙ্গে তাঁহার পত্র বিনিময় চলিত। এই সময়ে চীন সম্রাট্ হু-ইতির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন উয়ং লো। ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে উয়ং লো গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের নিকট দূত পাঠাইলে বিনিময়ে গিয়াসউদ্দীনও তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন।

গিয়াসউদ্দীনের নাম বাঙলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠার জন্য। একদিন তিনি শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন এমন সময়ে একটি তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া জনৈক বিধবার একমাত্র পুত্রের শরীরে বিদ্ধ হইল। ফলে তাহার মৃত্যু হইল। শোকাতুরা বিধবা সুলতানের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট নালিশ করিল। কাজী অবিলম্বে সুলতানকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ দিলেন। সুলতান অনুতপ্ত অপরাধীর ন্যায় বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া কাজীকে অভিবাদন করিলেন। কাজী যথোচিত গাম্ভীর্যের সহিত উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া রাজাকে প্রচুর অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন—এই অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইবে নিহত বালকের শোকার্তা মাতাকে।

সুলতান তৎক্ষণাৎ শোকার্তা বিধবাকে ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়া দিলেন এবং তাহার নিকট মার্জনা প্রার্থনা করিলেন। বিচারের কাজ এইরূপে অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে শেষ হইলে কাজী নিজ আসন হইতে নামিয়া আসিয়া সুলতানকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। গিয়াসউদ্দীন কাজীকে বলিলেন, আপনার ন্যায়বিচারে আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার রাজ্যে এমন নির্ভীক, নিরপেক্ষ বিচারক আছে, আমার পক্ষে তা অত্যন্ত গৌরবের কথা। আপনি যদি বিচারে পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে আমি

আপনার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে ইতস্ততঃ করিতাম না। কাজীও তন্মুহূর্তে একটি চাবুক বাহির করিয়া সুলতানকে বলিলেন, আপনার জন্য চাবুকের দরকার হতে পারে এই আশঙ্কা করেই আমি এই চাবুকখানা লুকিয়ে রেখেছিলাম। পরমেশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ আপনার বিনয়-নম্র ব্যবহারের জন্য তার আর প্রয়োজন হল না।

১৭ বৎসর রাজত্ব করার পর আজম শাহের মৃত্যু হয় (১৪০৯)। তখন বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র সৈফুদ্দীন হামজা শাহ। এই সময়ে ভাতুরিয়া এবং দিনাজপুরের হিন্দু জমিদার গণেশ অত্যন্ত প্রবল হইয়া ওঠেন এবং হামজা শাহের কোন বংশধরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। গণেশ ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ রাজা। হিন্দু মুসলমানে তিনি কোন প্রভেদ করিতেন না। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করিত।

রাজা গণেশের কোন মুদ্রাই আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কারণে কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা গণেশ হয়ত নিজেকে প্রকৃত রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই, সম্ভবত ইলিয়াস শাহী বংশের কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া প্রকৃত রাজক্ষমতা তিনি স্বয়ং পরিচালনা করিতেন।

রাজা গণেশের সমকালে বাঙলায় দনুজমর্দনদেব নামে একজন হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। এই রাজার সংবাদ জানা যায় তাঁহার নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইবার ফলে। এই মুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল পাণ্ডুয়া, সুবর্ণগ্রাম এবং চট্টগ্রাম এই তিন স্থানের টাকশালে।

মুদ্রাগুলিতে বাঙলা হরফে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। বিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ ভট্টশালী মনে করেন রাজা গণেশ ও দনুজমর্দনদেব একই ব্যক্তি। অবশ্য এ মত সর্ববাদিসম্মত নয়।

রাজা গণেশের মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁহার পুত্র যদু। যদু মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া জালালউদ্দীন নাম ধারণ করেন। নিজে হিন্দু সন্তান হইয়াও তিনি হিন্দুদের সঙ্গে অত্যন্ত নির্মম ব্যবহার করিতেন। তাঁহার নির্যাতনের ফলে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

জালালউদ্দীনের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র সামস্উদ্দীন আহ্মদ। সামস্উদ্দীন ছিলেন যেমন অপদার্থ তেমনি অত্যাচারী। ফলে রাজ্যে দারুণ অশান্তি দেখা দেয়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি সিংহাসনচ্যুত হন এবং ইলিয়াস শাহের অন্যতম বংশধর হাজি ইলিয়াস বাঙলার সিংহাসনে স্থাপিত হন। তিনি নূতন নাম ধারণ করিলেন নাসিরউদ্দীন মহম্মদ। নাসিরউদ্দীন মহম্মদের রাজত্বকালে বাঙলায় আবার সুদিন দেখা দেয়। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধ নির্মাণ করিয়া গৌড়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। সতেরো বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার রাজত্বকালে খুলনা, যশোর ও বাখরগঞ্জের কিয়দংশ অধিকৃত হয়।

নাসিরউদ্দীন মহম্মদের পরে বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র রুকনুদ্দীন বরবক শাহ। বরবকের রাজদরবারে ছিল অনেকগুলি হাবসী* ক্রীতদাস। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনকে তিনি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। ইহার পরিণাম হইল বাঙলার পক্ষে অত্যন্ত বিষময়।

বরবক শাহ ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক। শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামক গ্রন্থের কবি মালাধর বসুকে তিনি 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

বরবক শাহের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র সামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-'৮১)। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ

* হাবসীরা আফ্রিকার অন্তর্গত ইথিওপিয়ার (পূর্ব নাম আবিসিনিয়া) অধিবাসী।

ও বিদ্বান্। তিনি রাজ্যমধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজত্ব কালেই শ্রীহট্ট সর্বপ্রথম মুসলমানদের অধিকারে আসে।

সুলতান জালালউদ্দীন ফৎ শাহের রাজত্বকালে হাবসীরা অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়া বাঙলায় অরাজকতার সৃষ্টি করে। প্রজাবৎসল সুলতান ফৎ শাহ ইহাদের দমন করিতে গিয়া রাজ্য ও প্রাণ দুই-ই হারান। তখন বাঙলার সিংহাসন অধিকৃত হইল এই বৈদেশিক জাতি হাবসীদের দ্বারা।

শেষ হাবসী সুলতান সামসুউদ্দীন মুজাফ্ফর শাহের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া রাজকর্মচারিগণ এবং সৈন্যগণ বিদ্রোহী হয়। সুলতান গৌড়ে অবরুদ্ধ হন এবং সেখানেই চারমাস পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা ছিলেন তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন। তিনি ছিলেন জাতিতে আরব। বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া বাঙলার মসনদে স্থাপন করে।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) হাবসীদের দমন করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ইহার পর তাঁহার লক্ষ্য হইল বাঙলার নষ্ট গৌরব ফিরাইয়া আনা। এ বিষয়ে তিনি পূর্ণ সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা। তিনি কামরূপ ও বিহার জয় করেন এবং উড়িষ্যার প্রান্ত পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়া বাঙলাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবত ত্রিপুরার কিছুটা অংশও তিনি জয় করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ আকবরের ন্যায় হুসেন শাহ ছিলেন উদারস্বভাব এবং হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব রূপ ও সনাতন গোস্বামী, গোপীনাথ বসু, মুকুন্দদাস, কেশবছত্রী, গৌর মল্লিক প্রভৃতি সুযোগ্য হিন্দুগণ ছিলেন তাঁহার রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ।

তাঁহার উদার ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুগণ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ওঠেন।

হুসেন শাহ ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের অকৃত্রিম উৎসাহদাতা। বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, যশোরাজ, মালাধর বসু প্রভৃতি কবিগণ উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁহার গুণকীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে চট্টগ্রামের কবি শ্রীকর নন্দী মহাভারতের কিয়দংশ বাংলায় অনুবাদ করেন এবং বরিশালের বিজয়গুপ্ত মনসা মঙ্গল রচনা করেন। পরাগল খাঁ ছিলেন হুসেন শাহের অধীন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা। হুসেন শাহের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনিও সাহিত্যানুরাগী হইয়া ওঠেন। মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বরের তিনি ছিলেন অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক।

হুসেন শাহের রাজত্বকালে এ দেশ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিরসে ভাসিয়া গিয়াছিল। হুসেন শাহ এই মহাপুরুষকে অশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

হুসেন শাহের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি যশোরাজ বলিতেছেন—

শ্রীযুক্ত হুসেন জগতভূষণ, সোহ এরস জান পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশোরাজ খান।

পরমেশ্বর নামে আর একজন কবি বলিতেছেন—

নৃপতি হুসেন শাহ হএ মহামতি।
পঞ্চ গৌড়ে যার পরম সুখ্যাতি॥

কবি শ্রীকর নন্দী বলিতেছেন :—

নৃপতি হুসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদাম দণ্ডভেদে পালেন বসুমতী॥

এই মহানুভব নরপতি রাজ্যের নানা স্থানে বহু মস্‌জিদ, এতিমখানা প্রভৃতি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

হুসেনের মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯-'৩২)। নসরৎ শাহ ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা। তিনি ত্রিহুত

আক্রমণ করিয়া ত্রিহুত রাজাকে হত্যা করেন। অতঃপর তিনি ত্রিহুতের শাসনভার অর্পণ করেন তাঁহার নিকট আত্মীয় আলাউদ্দীন ও মহম্মদ-ই-আলমের উপর। তিনি ছিলেন স্থাপত্য, শিল্পকলা ও সাহিত্যের অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক। গৌড়ের সুবিখ্যাত বড় সোনা মস্‌জিদ ও কদম রসুল তাঁহারই কীর্তি। তাঁহার আদেশে পদ্যে মহাভারতের একখানি বাঙলা অনুবাদ লিখিত হয়।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল ভারতের ইতিহাসে অতি স্মরণীয় দিন। কাবুল-অধিপতি বাবর এই দিন পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিচক্ষণ নসরৎ শাহ বুঝিয়াছিলেন বাবর অমিত শক্তির অধিকারী। এই শক্তিমান্ পুরুষের সহিত সঙ্ঘর্ষে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ভারতে বাবরের প্রধান শত্রু ছিল আফগানগণ। নসরৎ শাহের সহানুভূতি ছিল এই আফগানদের প্রতি। তবুও তিনি আফগানদের সঙ্গে যোগ না দিয়া বাবরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইলেন। ফলে বাবর বাঙলা জয়ের সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইলেন।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, শেষ জীবনে নসরৎ শাহ চরিত্রহীন ও অত্যাচারী হইয়া ওঠেন। তাঁহার দুর্ব্যবহারে রাজকর্মচারীদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। অবশেষে তাঁহারই এক ক্রীতদাসের হস্তে তিনি নিহত হন।

নসরৎ শাহের মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ (১৫৩২-১৫৩৩)। পিতা ও পিতামহের ন্যায় তিনিও ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। বাঙলার মসনদে আরোহণ করার পূর্বেই তিনি সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দেন। এই সময়ে তাঁহার অনুরোধে কবি শ্রীধর প্রেমমূলক কাব্য বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। এই তরুণ রাজা নিহত হন স্বীয় পিতৃব্য আবদুল বদরের দ্বারা। আবদুল বদর গিয়াস্‌উদ্দীন মহম্মদ নামে বাঙলার মসনদে আরোহণ করেন। নিজ

ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করায় রাজ্যের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিই তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে অসম্মত হন। ফলে রাজ্যে তুমুল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়।

সের খাঁ ও হুমায়ুনের বাঙলা অভিযান

বাবরের মৃত্যুর পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন। হুমায়ুনের রাজত্বের প্রথম দিকে বিহারের শূরবংশীয় আফগান সের খাঁ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া ওঠেন এবং বাঙলার সুলতান মাহমুদ শাহকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বাঙলা গ্রাস করিতে উদ্যত হন। অচিরেই বাঙলা সের খাঁর অধিকারে আসে। হুমায়ুনের পক্ষে ইহা দারুণ বিপদের কথা, তিনি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন সের খাঁর পরাক্রমে তাঁহাকে দিল্লীর মসনদ হারাইতে হইবে। তাই তিনি সের খাঁর বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে বাঙলার দিকে যাত্রা করেন (১৫৩৭)। তিনি বাঙলার রাজধানী গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে সের খাঁ তাঁহাকে বাধা দিবার অণুমাত্র চেষ্টা না করিয়া বাঙলা ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন। হুমায়ুন তখন আনন্দে আত্মহারা। বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে বাঙলা জয় হইল। তিনি গান-বাজনা ও আমোদ-ফুর্তিতে গা ভাসাইয়া দিলেন। এদিকে সের খাঁ বারাণসী অধিকার করিয়া জৌনপুর ও কনৌজ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করিয়া লইলেন। এই দারুণ সংবাদ হুমায়ুনের কানে পৌঁছিলে তিনি হতভম্ব হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে গৌড় ত্যাগ করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বক্সারের নিকটবর্তী চৌসায় সের খাঁর সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে হুমায়ুন নিদারুণ ভাবে পরাস্ত হইলেন। বাঙলা, বিহার ও জৌনপুর সের খাঁর পদানত হইল। তিনি এখন সের শাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৫৩৯)। পরের বৎসর বিলগ্রামে হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁহার পুনরায় যুদ্ধ হইল। এই

যুদ্ধেও হুমায়ুন শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হইলেন। ভারতের কোথাও তিনি মাথা গুঁজিবার ঠাঁই পাইলেন না। ভারত ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আশ্রয়ের জন্য যাইতে হইল সুদূর পারস্য দেশে।

সের শাহ উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন। তাঁহার পাঁচবৎসরব্যাপী রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হুমায়ুনের শেষ জীবন—আকবরের সিংহাসন আরোহণ

সের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র আদিল শাহের রাজত্বকালে দিল্লীর শূরশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে হুমায়ুন ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং আদিল শাহকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পুনরায় দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লন (১৫৫৫)। কিন্তু এই ঘটনার মাত্র কয়েক মাস পরেই একদিন পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আকবরের বয়স তখন মাত্র তেরো বৎসর। রাজপুত্র আকবরের তখন একমাত্র বান্ধব বৈরম খাঁ। তিনিই আকবরকে দিল্লীর মসনদে স্থাপন করেন এবং তাঁহার অভিভাবকরূপে অতীব যোগ্যতার সহিত রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিশ বছর বয়সে আকবর স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

বাঙলার রাজনৈতিক অবস্থা : সুলেমান কররাণীর বাঙলা জয়

সের শাহের বাঙলা বিজয়ের ফলে বাঙলায় শূরদের শাসন আরম্ভ হয়। ইঁহারা দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়া বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। দুর্বল সুলতান আদিল শাহের রাজত্বকালে বাঙলার শূরগণ দিল্লীর অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। কিন্তু শীঘ্রই শূরদের মধ্যে আত্মদ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং শূররাজ নিহত হন। এই সুযোগে দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্তা

সুলেমান কর্‌রাণী বঙ্গদেশ জয় করিয়া লন (১৫৬০)। ফলে বাঙলা দেশে শুরু হয় কর্‌রাণীদের শাসন।

সুলেমান ছিলেন নির্ভীক যোদ্ধা ও সুদক্ষ শাসনকর্তা। তাঁহার সুশাসনে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিত। স্বয়ং সুদক্ষ যোদ্ধা হইয়াও বিচক্ষণ সুলেমান সম্রাট্ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি গৌড় হইতে তাণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন এবং উড়িষ্যা জয় করিয়া রাজ্যসীমা বিশেষভাবে বাড়াইলেন। সুলেমানের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র দাউদ কর্‌রাণী (১৫৭২)। তিনি বিচক্ষণ পিতার নীতি বর্জন করিয়া নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। শুধু তাই নয়। তিনি আকবরের সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমানা আক্রমণ করিয়া চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন। আকবর যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে দাউদের পরাজয় হইল। তিনি পাটনা ও হাজিপুর হইতে বিতাড়িত হইলেন।

এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই দাউদ খাঁ শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনরায় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। ফলে আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করিলেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দাউদ রাজমহলের যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হইলেন। বাঙলার মাটিতে সগর্বে উড্ডীন হইল মুঘল পতাকা।

বাঙলা বিজিত হইল সত্য, কিন্তু সমগ্র বাঙলা আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইল না। বাঙলার তেজস্বী বার ভুইঞাগণ তাঁহাকে সর্বশক্তি দিয়া বাধা দিতে লাগিলেন। বার ভুইঞাদের মধ্যে ঢাকা ও ময়মনসিংহের ইসা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, চন্দ্রদ্বীপের (বাখরগঞ্জের) কন্দর্পনারায়ণ এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাঙলা—জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকে বর্ধমানের জায়গীরদার আলি কুলি (সের আফগান) অত্যন্ত

প্রবল হইয়া ওঠেন। জাহাঙ্গীরের মনে সন্দেহ হইল সের আফগান তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাই তিনি বাঙলার নব-নিযুক্ত শাসনকর্তা কুতুব্ উদ্দীনকে পাঠাইলেন তাঁহার শক্তি অঙ্কুরে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে। উভয়ের মধ্যে শুরু হইল তুমুল যুদ্ধ। সের আফগান নিহত হইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সের আফগানের অনুচরগণও কুতুব্ উদ্দীনকে হত্যা করিল।

জাহাঙ্গীরের মেহের উন্নিসাকে বিবাহ—সের আফগানের স্ত্রী মেহের উন্নিসা ছিলেন পরমা সুন্দরী। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে নিজ রাজ-প্রাসাদে নিয়া আসেন। চার বৎসর পরে সম্রাট্ তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার নাম রাখেন নূর মহল (প্রাসাদের আলো)। কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার নাম আবার পরিবর্তন করিয়া রাখেন নূর-জাহান (জগতের আলো)। সম্রাটের উপর নূরজাহানের প্রভাব ছিল অসামান্য। বাস্তবিক পক্ষে সম্রাট যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন নূরজাহানই ছিলেন সাম্রাজ্যের হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সের আফগানের সজ্ঘর্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটিও প্রচলিত আছে।

জাহাঙ্গীর যখন তরুণ যুবক* তখন তিনি মেহের উন্নিসাকে রাজ-প্রাসাদে দেখিয়া তাঁহার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হন। তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য তিনি অধীর হইয়া পড়েন। কিন্তু সম্রাট আকবর তাঁহার এই ইচ্ছায় বাধা দেন, কারণ মেহের উন্নিসার পিতা অভিজাত বংশীয় নন। আকবর নিজে উদ্যোগী হইয়া মেহের উন্নিসার বিবাহ দেন বর্ধমানের জায়গীরদার সের আফগানের সঙ্গে। বিবাহের পরই মেহের উন্নিসা বর্ধমানে প্রেরিত হইলেন। জাহাঙ্গীর কিন্তু তাঁহাকে ভুলিতে পারিলেন না। পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি বাঙলার শাসনকর্তা কুতুব্ উদ্দীনকে আদেশ দিলেন, সের আফগানকে বন্দী করিয়া অবিলম্বে দিল্লী পাঠাইতে হইবে। কুতুব এই আদেশ পালন

* সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে জাহাঙ্গীরের নাম ছিল সেলিম।

করিতে অগ্রসর হইলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল। যুদ্ধে উভয়েরই মৃত্যু হইল। মেহের উন্নিসা সসম্মানে দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি দৃঢ়তার সহিত উহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। চার বৎসর পরে তিনি সম্রাটের প্রস্তাবে রাজী হইলে তাঁহাদের বিবাহ হয়।

বাঙলায় মুঘল শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় আফগান প্রভাব স্তিমিত হইল সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহাদের অবিরাম চেষ্টা ছিল মুঘল শক্তি চূর্ণ করিয়া বাঙলায় আবার আফগান আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করা। এই সময়ে ইসলাম খাঁ ছিলেন বাঙলার মুঘল শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন সর্বাংশে যোগ্য শাসক ও দক্ষ যোদ্ধা। ওসমান খাঁর নেতৃত্বে আফগানগণ বিদ্রোহী হইলে ইসলাম খাঁ তাহাদের কঠোর হস্তে দমন করেন। ওসমান খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ফলে বাঙলায় আফগান শক্তি সম্পূর্ণরূপে দমিত হয়। জাহাঙ্গীর সদয় ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাদের হৃদয় জয় করিয়া লন।

আকবর বার ভুইঞাদের শক্তি খর্ব করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। আকবরের ন্যায় শক্তিমান রাজার পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই গৌরবের কথা নয়। আকবর যেখানে ব্যর্থ হইলেন সেখানে সাফল্য অর্জন করিলেন তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম বাঙলায় মুঘল আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কোচবিহার বিজিত হইল, কামরূপও এই সময়ে বিজিত হইয়া বাঙলার অঙ্গরূপে শাসিত হইতে লাগিল।

শাহজাহানের রাজত্বকালে বাঙলা : হুগলীতে পর্তুগীজ দমন— সম্রাট্ আকবরের নিকট হইতে ফর্মান লাভ করিয়া পর্তুগীজগণ হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে। পর্তুগীজেরা ছিল অত্যন্ত দুর্দান্ত। তাহারা শুধু বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল না।

তাহারা নর-নারী নির্বিশেষে সকলের উপর অত্যাচার করিত, হিন্দুদের দেবমূর্তি ভাঙ্গিত, মুসলমান তীর্থযাত্রীদের মক্কা যাইবার পথে আটক করিয়া অকথ্য নির্যাতন করিত এবং ভারতীয় বণিকদের পণ্য-বোঝাই জাহাজ লুঠ করিত। তাহারা এমন কি নর-নারী বালক-বালিকাদের চুরি করিয়া লইয়া গিয়া জোর করিয়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিত এবং দাসদাসীরূপে বিক্রী করিত। এই হতভাগ্যদের জীবনে কি দুঃসহ নির্যাতনই না সহ্য করিতে হইত। মুঘল শাসকগণ ইহাদের দমন করার জন্য মাঝে মাঝে চেষ্টা করিতেন সত্য, কিন্তু সে চেষ্টার মধ্যে দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার অভাব ছিল। ফলে পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। বাঙালীর পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা, পর্তুগীজরা মহিষী মমতাজ মহলের দুইজন বাঁদীকে বন্দী করিল। তাহাদের এই দুঃসাহসিকতায় সম্রাট্ শাহজাহান ক্রোধে অন্ধ হইলেন। বাঙলার শাসনকর্তা কাসিম খাঁর উপর আদেশ হইল অবিলম্বে হুগলী আক্রমণ করিয়া পর্তুগীজ শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিতে হইবে। সম্রাটের আদেশে কাসিম খাঁ হুগলী আক্রমণ করিলেন এবং তিন মাসের চেষ্টায় উহা অধিকার করিলেন। প্রায় চার হাজার পর্তুগীজ বন্দী হইল। তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় আগ্রায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে তাহাদের উপর চলিল চরম নির্যাতন। কাসিম খাঁর এই একটি অভিযানের ফলে পর্তুগীজ শক্তি হুগলীর মাটি হইতে নিশ্চিহ্ন হইল। সেখানকার অধিবাসিগণ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

বাঙলার শাসনকর্তা সুজা—সম্রাট শাহজাহান তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজাকে বাঙলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যা-বুদ্ধি ও শৌর্যবীর্যের অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি ছিলেন অলস, বিলাসী ও আরামপ্রিয়। দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করার যোগ্যতা তাঁহার আদৌ ছিল না। ফলে তাঁহাকে জীবনে চরম লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট শাহজাহান কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। চতুর্দিকে সংবাদ রটিল, সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে। অবিলম্বে তাঁহার চার পুত্র দারা, সুজা, আওরঙজেব ও মুরাদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধ বাধিল। সুজা রাজমহলে নিজেকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং সিংহাসন অধিকারের উদ্দেশ্যে আগ্রার দিকে রওনা হইলেন। এদিকে আওরঙজেব মুরাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া একই উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শাহজাহান সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। দারাকেই তিনি সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। দারা যাহাতে নির্বিঘ্নে সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি বিদ্রোহী পুত্রদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সুজার বিরুদ্ধে তিনি এক বাহিনী পাঠাইলেন দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমানের নেতৃত্বে। সুজা সুলেমানের নিকট বাহাদুরপুর নামক স্থানে পরাস্ত হইলেন। আওরঙজেব ও মুরাদের বিরুদ্ধে পাঠানো হইল কাসিম খাঁ ও যশোবন্ত সিংহকে। কিন্তু আওরঙজেব ও মুরাদ জয়ী হইয়া আগ্রার দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। পথে দারা তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া পরাস্ত হন। আওরঙজেব ও মুরাদ বিজয়গর্বে আগ্রা প্রবেশ করিয়া প্রাসাদ দুর্গ অবরোধ করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই দুর্গ আওরঙজেবের হস্তগত হইল। হতভাগ্য সম্রাট্‌ নিজ পুত্র আওরঙজেবের হস্তে বন্দী হইয়া অবশিষ্ট জীবন কারাকক্ষের অভ্যন্তরে জীবন্মৃত অবস্থায় যাপন করিলেন। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র দারা কয়েকবার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অবশেষে পলায়নের চেষ্টা করেন। জনৈক বিশ্বাসঘাতক তাঁহাকে আওরঙজেবের হস্তে ধরাইয়া দেয়। আওরঙজেব তাঁহাকে ভিখারীর বেশে হাতীর পিঠে চড়াইয়া দিল্লীর পথে পথে ঘুরাইয়া সকলকে দেখাইবার ব্যবস্থা করেন। পরে তাঁহাকে কাজীর বিচারে বিধর্মী

সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যে মুরাদ প্রথম হইতেই এই যুদ্ধে আওরঙজেবের একমাত্র সহচর ছিলেন তাঁহাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

এদিকে সুজার অবস্থা কি হইল তাহা একবার দেখা যাউক। সুজা সুলেমানের হস্তে পরাস্ত হইবার পরেও পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এবার স্বয়ং আওরঙজেব সসৈন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তাঁহারা পরস্পরের সম্মুখীন হন খাজুয়া নামক স্থানে, যুদ্ধে সুজা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। আওরঙজেবের আদেশে মীরজুমলা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। ভীতিবিহ্বল সুজা তখন ঢাকা হইয়া সপরিবারে জলপথে আরাকানের দিকে পলায়ন করেন। আরাকানে সুজার যে কি অবস্থা হইল তাহা আজ পর্যন্ত রহস্যাবৃত। অনেকেরই ধারণা, নির্মম আরাকানীদের হস্তে তিনি সপরিবারে নিহত হইয়াছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য এবং পরে উহা নিষ্কণ্টক করার জন্য আওরঙজেব যে সব পন্থার আশ্রয় লইয়াছিলেন, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলিবে কিনা সন্দেহ।

আওরঙজেবের রাজত্বকালে বাঙলা: মীরজুমলার কামরূপ অভিযান– তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিকে বাঙলার শাসনকর্তার পদে আওরঙজেব নিযুক্ত করেন বিখ্যাত সেনাপতি মীরজুমলাকে। মীরজুমলার সর্বপ্রধান কাজ হইল কামরূপের (আসামের) অধিবাসী আহোমদের ক্ষমতা খর্ব করা। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘলেরা কামরূপ জয় করে। কামরূপের একটি প্রধান সহর হইল গুয়াহাটি (বর্তমান নাম গৌহাটি)। শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে যখন সিংহাসন লইয়া তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন আহোমগণ মুঘল শাসনকর্তাকে পরাস্ত করিয়া গুয়াহাটি দখল করিয়া লয়। মীরজুমলা তাহাদিগকে সায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে এক বিশাল স্থল ও নৌবাহিনী

লইয়া কামরূপে যাত্রা করেন। তিনি একপ্রকার বিনাবাধায় অগ্রসর হইয়া আহোম-রাজ জয়ধ্বজ সিংহের রাজধানী বড়গাঁওতে উপস্থিত হন। উভয়পক্ষে জলযুদ্ধ শুরু হইল। আহোমদের নৌশক্তি সম্পূর্ণ-রূপে বিধ্বস্ত হইল। আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া বার্ষিক করদানে সম্মত হইয়া মীরজুমলার সঙ্গে সন্ধি করিলেন।

আওরঙজেবের ইচ্ছা ছিল আসাম সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইলে মীরজুমলাকে চীন অভিযানে পাঠাইবেন। কিন্তু তাঁহার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা কার্যে পরিণত করার সুযোগ তাঁহার জীবনে আর ঘটিয়া উঠিল না। মীরজুমলা আসাম থাকিতে থাকিতেই দারুণ বৃষ্টি শুরু হইল। সমগ্র দেশ বর্ষার জলে প্লাবিত হইল। কাহার সাধ্য ঘর হইতে এক পা-ও বাহির হয়। এদিকে মুঘল সৈন্যদের মধ্যে মড়ক দেখা দিল। তাহাদের এই দুরবস্থার সুযোগ লইয়া আহোমগণ তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বিষমিশ্রিত তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বহু মুঘলসৈন্য এই তীরের আঘাতেই নিহত হইল। মীরজুমলার বিজয়গৌরব সম্পূর্ণরূপেই বিলীন হইয়া গেল। নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ে তিনি ঢাকা যাত্রা করিলেন। কিন্তু ঢাকা পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। চার বৎসর পরে আহোমগণ পুনরায় গুয়াহাটি দখল করিয়া লয়।

মীরজুমলার মৃত্যুর পর আওরঙজেব তাঁহার মাতুল সায়েস্তা খাঁকে বাঙলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তাঁহার শাসনকাল বাঙলার ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়। পর্তুগীজ ও মগদের অমানুষিক অত্যাচারে দক্ষিণপূর্ববঙ্গ ছারখার হইতে চলিয়াছিল। পূর্ববর্তী মুঘল শাসকগণ এই দুর্দান্ত দস্যুদের দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাই করেন নাই। ফলে এই অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ অংশ জনশূন্য হইয়া গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ কঠোর হস্তে এই নির্মম দস্যুদিগকে দমন করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা

করেন। এই সময়ে আরাকানের 'নৌ-বাহিনী' বাঙলার পক্ষে ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ আরাকানীদের নৌশক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন এবং তাহাদের নিকট হইতে সন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া লন।

বাঙলার মুঘল শাসকদের মধ্যে সায়েস্তা খাঁই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন বাঙ্গালী জাতিকে টিকিয়া থাকিতে হইলে নৌশক্তিতে বলীয়ান্ হইতে হইবে। তাই তিনি তাহাদিগকে অধিক সংখ্যায় নৌবাহিনীতে নিযুক্ত করেন এবং উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া নৌযুদ্ধে নিপুণ করিয়া তোলেন। তাঁহার শাসনকালে বাঙ্গালী নৌবাহিনী সাহস, নৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া সমগ্র ভারতে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল।

সায়েস্তা খাঁ বাঙলা দেশ শাসন করিয়াছিলেন সুদীর্ঘ ২৪ বছর (১৬৬৪-১৬৮৮), অবশ্য একাদিক্রমে নয়, দুই বারে। তাঁহার সুশাসনে বাঙলা দেশ প্রকৃতই শান্তি ও সম্পদে পূর্ণ হইয়াছিল। পর্তুগীজ পাদ্রী মানবিক-এর মতে তাঁহার আমলে বাঙলায় টাকায় পাঁচ মণ চাউল পাওয়া যাইত। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় এই যশস্বী শাসনকর্তার মৃত্যু হয়।

মুর্শিদকুলি খাঁ—সায়েস্তা খাঁর মৃত্যুর পর বাঙলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন আওরঙজেবের পৌত্র আজিম উশ্‌শান। ইতিহাস-বিখ্যাত মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন আজিম উশ্‌শানের দেওয়ান। আজিম উশ্‌শান নামেই শাসনকর্তা ছিলেন। শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন মুর্শিদকুলি খাঁ। কাসিম খাঁর সময় ঢাকা ছিল বাঙলার রাজধানী। মুর্শিদকুলি খাঁ আজিম উশ্‌শানের উপর বিরক্ত হইয়া ঢাকা হইতে মুকসুদাবাদে প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগ তুলিয়া লইলেন। ফলে বাঙলার রাজধানী ঢাকা হইতে মুকসুদাবাদে উঠিয়া যায়। মুর্শিদকুলি খাঁর নাম অনুসারে মুকসুদাবাদের নূতন নাম হয় মুর্শিদাবাদ।

আওরঙজেবের মৃত্যু—মুঘল সাম্রাজ্যের পতনদশা

আওরঙজেব ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় সিংহাসনের জন্য মরণ-পণ যুদ্ধ। ১৭০৭ হইতে ১৭৫৯, এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে পর পর ৯ জন রাজা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই যুগ নিরন্তর হত্যার যুগ, চরম অরাজকতার যুগ। ফলে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন দিন দিন হ্রাস পাইয়া অবশেষে উহা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

মুর্শিদকুলি খাঁর পরবর্তী বাঙলার শাসনকর্তাদের কথা

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হয়। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন মুহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮)। মুহম্মদ শাহ বাঙলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা সুজাউদ্দীনকে। সুজাউদ্দীন ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী। তাই তিনি উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে বাঙলার নবাব হন তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ। তিনি ছিলেন দুশ্চরিত্র। শাসনকার্যেও তাঁহার কিছুমাত্র দক্ষতা ছিল না। এই সময়ে বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন আলিবর্দী খাঁ। তিনি এই অপদার্থ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। বাঙলার মসনদ এই বিজয়ী বীরের অধিকারে আসিল (১৭৪১)। আলিবর্দী খাঁ দিল্লীর সম্রাট্ মুহম্মদ শাহকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে এক ফরমান আদায় করিয়া লইলেন। এই ফরমান বলে তিনি বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

শাসনকর্তা হিসাবে আলিবর্দী খাঁ যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। তাই হিন্দুগণ শাসন কার্যে তাঁহার সহযোগিতা করিতেন অকুণ্ঠিত চিত্তে।

এই সময়ে বাঙলায় ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল।* নবাবের অনুমতি না লইয়াই তাহারা দুর্গাদি নির্মাণের জন্য আয়োজন করিতেছিল। দুইটি বৈদেশিক জাতি তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হইলে নবাব আলিবর্দী খাঁ স্বভাবতই ইহা বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাহাদের জানাইয়া দিলেন—বাংলায় তাহাদের পক্ষে দুর্গ নির্মাণ করা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইংরেজ ও ফরাসীগণ তাঁহার এই নিষেধ বাণী নতমস্তকেই মানিয়া লইল।

এই দৃঢ়চেতা নবাবকে কিন্তু নিদারুণ পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে হইল মহারাষ্ট্র দেশের কুখ্যাত বর্গীদের হস্তে। ইহারা সোনার বাঙলার অফুরন্ত ঐশ্বর্যে লুব্ধ হইয়া এই দেশে দলে দলে আসিয়া নির্মম ভাবে নিঃসহায় অধিবাসীদের যথাসর্বস্ব লুটিয়া নিত। ফলে বাঙলার ঘরে ঘরে উত্থিত হইত করুণ আর্তনাদ। নবাব আলিবর্দী খাঁ ইহাদের দমন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। অবশেষে তিনি বাধ্য হইয়া তাহাদের হাতে উড়িষ্যার একাংশ ছাড়িয়া দিয়া এবং বার্ষিক বার লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হইয়া এক সন্ধি

*১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি বণিকসঙ্ঘ তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে পূর্বসমুদ্রে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা পশ্চিম ভারতের কয়েকটি স্থানে কুঠি স্থাপন করে। এই সময়ে ভারতে তাহাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পর্তুগীজগণ। উভয়ের মধ্যে কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। উহাতে ইংরেজগণ জয়ী হয়। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণক নামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী কলিকাতা নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। সুচতুর ইংরেজগণ দিল্লীর সম্রাটকে খুশী করিয়া কয়েকটি সর্তে বাঙলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে।

ইংরেজদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরাও একটি কোম্পানী গঠন করে এবং ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতের সুরাটে প্রথম কুঠি স্থাপন করে। বাঙলায় তাহাদের কুঠি স্থাপিত হয় ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে।

বাঙলায় ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ছিল দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

করিলেন। দীর্ঘ দিন পরে বাঙলা এই নিষ্ঠুর দস্যুদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সর্বজনমান্য বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙলার নবাব হইলেন। সিরাজের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বৎসর। বয়সে তরুণ হইলেও সিরাজ ছিলেন অত্যন্ত উদ্ধত ও চরিত্রহীন। নবাব আলিবর্দী খাঁ বাঙলার যে সব প্রভাবশালী ব্যক্তিকে মিত্রজ্ঞানে ভাল বাসিতেন এবং সমাদর করিতেন তাঁহাদের প্রতিও তাঁহার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অপমানসূচক। ফলে তাঁহারা অনেকেই এই তরুণ নবাবের চির-শত্রুতে পরিণত হইলেন।

এদিকে ইংরেজ ও ফরাসীগণ এই তরুণ নবাবের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ কুঠিতে দুর্গাদি নির্মাণের কাজ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করিয়া দিল। সিরাজ তাহাদের এই আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে দুর্গ নির্মাণের কাজ বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। ফরাসীরা তাঁহার আদেশ গ্রাহ্য করিল, কিন্তু ইংরেজরা উহা কানেই তুলিল না। সিরাজ সঙ্কল্প করিলেন দুর্বিনীত ইংরেজদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবেন।

ইংরেজদের উপর সিরাজের অসন্তোষের আরও কারণ ছিল। ইংরেজরা বাদশাহ ফরখ্‌সিয়রের নিকট হইতে কয়েকটি সর্তে বাঙলা দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এই সর্তসমূহ অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের খুশীমত বাঙলায় বাণিজ্য চালাইত। ইহাতে রাজকোষের দারুণ ক্ষতি হইত। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ছিলেন সিরাজের অন্যতম প্রধান পুত্র। ইংরেজরা এই কৃষ্ণদাসকে সাদরে কলিকাতায় আশ্রয় দিলেন। ফলে সিরাজের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া (জুন ১৭৫৬) কাশিমবাজার ও কলিকাতা অধিকার করিলেন। এই

সময়ে কলিকাতার গবর্ণর ছিলেন ড্রেক। তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ প্রায় সকলেই প্রাণভয়ে কলিকাতা হইতে পলায়ন করিয়া ফলতা নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। যে সকল ইংরেজ পলায়নের সুযোগ পান নাই তাহারা নবাবের হস্তে বন্দী হইলেন।

অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী

ইংরেজদের মতে এই সময়ে (২০শে জানুয়ারী, ১৭৫৬) নবাবের কর্মচারিগণ ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে ফোর্ট উইলিয়মের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে* আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সেদিন রাত্রে নাকি অসহ্য গরম পড়িয়াছিল। একে ত অতি ক্ষুদ্র কক্ষে অতগুলি লোক, তার উপর আবার এরূপ গরম। ফলে বন্দীদের কষ্টের আর সীমা ছিল না। তাহারা অসহায়ভাবে করুণস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল। পরদিন ভোরে দেখা গেল ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে মাত্র ২৩ জন বাঁচিয়া আছে, আর সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। ইংরেজরা এই নিদারুণ ঘটনার নাম দিয়াছেন অন্ধকূপ হত্যা (Black Hole Tragedy)।

ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন এই কাহিনী নিতান্তই মন-গড়া।

কলিকাতা ও কাশিমবাজারের পতন-সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছামাত্র কর্নেল ক্লাইভ ও নৌসেনাপতি ওয়াট্‌সন একদল সৈন্য ও কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজসহ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। নবাব-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরেজরা অনায়াসে কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিল। নবাবের সঙ্গে তখন তাহাদের সন্ধি হইল। সন্ধির সর্ত অনুসারে নবাব তাহাদের পূর্বের সব কিছু অধিকার ফিরাইয়া দিলেন। এমন কি দুর্গ-নির্মাণ এবং মুদ্রা-প্রস্তুতের অধিকারও

* এই কক্ষটি নাকি দৈর্ঘ্যে ছিল ১৮ ফুট এবং প্রস্থে ১৪ ফুট। উহাতে মাত্র দুইটি ছোট ছোট জানালা ছিল।

তাহাদের দেওয়া হইল। যুদ্ধে ইংরেজদের যে প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল নবাবকে তাহার বিনিময়ে প্রচুর অর্থও দিতে হইল।

পলাশীর যুদ্ধ—এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে একটি যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এই যুদ্ধ সাত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া ইহা 'সপ্তবর্ষের মহাসমর' নামে অভিহিত। ইউরোপের যুদ্ধের তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছিল সুদূর ভারতে। ক্ষমতাগর্বে গর্বী ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন সিরাজের সুস্পষ্ট নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া ফরাসীদের চন্দননগর আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়া লইলেন। সিরাজ ইহাতে নিজেকে যারপর নাই অপমানিত বলিয়া বোধ করিলেন এবং দাম্ভিক ইংরেজদের ক্ষমতা চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ক্লাইভও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি জানিতেন রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি বলিতে প্রায় সকলেই সিরাজের শত্রু। তাঁহাদের সঙ্কল্প হইল সিরাজকে গদিচ্যুত করিয়া আলিবর্দীর ভগ্নীপতি মীরজাফরকে মসনদে স্থাপন করা। এই মীরজাফর ছিলেন সিরাজেরই সেনাপতি। ক্লাইভ মহোৎসাহে এই ষড়যন্ত্রকারীদের* সঙ্গে যোগ দিলেন। মীরজাফর মনে করিলেন, শক্তিমান্ ইংরেজদের সাহায্য পাইলে কাহার সাধ্য তাঁহার মসনদ অধিকারে বাধা দেয়? ইংরেজদের সাহায্যের বিনিময়ে তিনি তাহাদিগকে পৌনে দুই কোটি টাকা পুরস্কার দিতে সম্মত হইলেন। এই সব আলোচনা চলিয়াছিল গোপনেই। কিন্তু তবুও উমিচাঁদ বা আমিনচাঁদ নামে এক শিখ বণিক ইহা জানিতে পারিলেন এবং ইহা ফাঁস করিয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। সুচতুর ক্লাইভ তাঁহার মুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রচুর টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এই সময়ে লিখিত-পঠিতভাবে একটি চুক্তিও

*ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন সিরাজের সেনাপতি মীরজাফর, সিরাজের মাসি ঘসেটি-বেগম, ঘসেটি বেগমের দক্ষিণ-হস্ত রাজবল্লভ, ইয়ার লতিফ, ধনকুবের বণিক জগৎশেঠ, মহতাব রায় ও স্বরূপচাঁদ।

সম্পাদিত হইল। এই চুক্তিতে ক্লাইভ স্বাক্ষর দিলেন, কিন্তু সত্যানুরাগী ওযাট্সন স্বাক্ষর দিতে দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিলেন। ক্লাইভ দমিবার পাত্র নন। তিনি গোপনে অম্লানচিত্তে ওযাট্সনেব নাম জাল করিযা চুক্তিপত্র উমিচাঁদকে দিয়া দিলেন।

যুদ্ধের ঠিক নয়, ষডযন্ত্রের,—সব কিছু আযোজন সম্পূর্ণ হইলে, সিবাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। সভ্য জাতিব মধ্যে নিযম আছে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে কাবণ দেখাইতে হয়। এক্ষেত্রে কারণ দেখানো হইল, সিরাজ ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির সর্তসমূহ ভঙ্গ করিয়াছেন। এই অভিযোগ কিন্তু সম্পূর্ণ অমূলক।

মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে আম্রকুঞ্জপূর্ণ পলাশী নামক গ্রাম। ভারতের ইতিহাসে এই গ্রামটি পাণিপথের ন্যায়ই সুবিখ্যাত। উভযপক্ষে যুদ্ধ হইল এই গ্রামে (১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন)। যুদ্ধ না বলিযা ইহাকে যুদ্ধের প্রহসন বলাই সঙ্গত। সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ৫০ হাজার পদাতিক ও ২৮ হাজার অশ্বারোহী লইয়া। ক্লাইভ আসিলেন মাত্র ৩ হাজার সৈন্য লইযা। তবুও ক্লাইভ জয়ী হইলেন। সিরাজ নিদারুণভাবে পবাস্ত হইয়া প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন কবিলেন। ৩ হাজাব সৈন্যের কাছে ৭৮ হাজার সৈন্য পরাভূত হইল, এরূপ ব্যাপার পৃথিবীর কোন দেশে কখনও ঘটিয়াছে কি? প্রকৃত কথা হইল, পলাশীব যুদ্ধ যুদ্ধই নয়। সিবাজের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া স্বীয় বাহিনীসহ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সিরাজ ত বিস্ময়ে স্তব্ধ। তিনি এখন সবই বুঝিলেন। কিন্তু আর উপায় নাই। তাঁহার পক্ষ হইয়া দুইজন বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ, মীরমদন ও মোহনলাল, প্রাণপণে যুদ্ধ কবিতে লাগিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের পরামর্শে সিবাজ তাঁহাদিগকেও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে আদেশ দিলেন। সিবাজেব তখন বুদ্ধিশুদ্ধি বিলুপ্ত হইল। তিনি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তখন প্রাণরক্ষার জন্য

পলায়ন করা ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। এদিকে বিজয়ী ক্লাইভ অগ্রসর হইয়া মীরজাফরকে বাঙলার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন।

সিরাজ শীঘ্রই ধরা পড়িলেন। মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে মহম্মদী বেগ নামে এক নরাধম হতভাগ্য নবাবকে চরম নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করিল।

মীরজাফর (১৭৫৭-৬০) নবাব হইলেন নামেই। প্রতিপদে তাঁহাকে চলিতে হইত ইংরেজদের নির্দেশমত। ইংরেজদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য তিনি তাহাদিগকে মুক্তহস্তে অর্থ দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের ক্ষুধা মিটিল না। মীরজাফর অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। সমসাময়িক বিভিন্ন গ্রন্থের ইংরেজ লেখকদের মতে নবাব এক সুযোগে চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের সঙ্গে যোগ দিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। ফলে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হইলেন। বাঙলায় ইংরেজদের আধিপত্য দৃঢ়তর হইল।

ক্লাইভ বিজয়ী বীরের ন্যায় মাতৃভূমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন (১৭৬০)। তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণ তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন লর্ড উপাধিতে ভূষিত করিয়া।

মীর কাসিমের মসনদ লাভ—ক্লাইভ ইংলণ্ডে চলিয়া গেলে মীরজাফরের অবস্থা আরও অসহনীয় হইয়া উঠিল। ইংরেজদের নিকট হইতে, টাকা দিন, টাকা দিন এই রব নিরন্তর তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল। কিন্তু টাকা দিবার আর উপায় ছিল না, কারণ রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া আসিয়াছিল। চাহিবা মাত্র টাকা দিবার ক্ষমতা যাঁহার নাই তাঁহাকে নবাবের আসনে রাখিয়া কি লাভ! এই সময়ে কলিকাতার নূতন গবর্ণর ছিলেন ভ্যান্সিটার্ট। তিনি তাঁহার কাউন্সিলের অন্যান্য মেম্বারদের সঙ্গে একমত হইয়া মীরজাফরকে গদিচ্যুত করিলেন এবং তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে

(১৭৬০-৬৪) বাঙলার মসনদে বসাইলেন। বিনিময়ে মীরকাসিম কোম্পানীকে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রামের জমিদারী দান করিলেন। গবর্ণর ও তাঁহার কাউন্সিলের সদস্যগণ ব্যক্তি-গত ভাবে পুরস্কার স্বরূপ লাভ করিলেন দুই লক্ষ পাউণ্ড।

মীরকাসিম কিন্তু শ্বশুরের মত অপদার্থ ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক ও তেজস্বী ব্যক্তি। তাই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব বেশী দিন স্থায়ী হইল না। মুর্শিদাবাদে ইংরেজদের চোখের সামনে থাকিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব নয়—ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহার রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করিলেন এবং নিজ সেনাদিগকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

আগেই বলিয়াছি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে কয়েকটি সর্তে বাঙলা দেশে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করিয়াছিল। সে যুগে কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে বাণিজ্য করিত। তাহাদিগকে আইনতঃ বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হয় নাই। তবুও তাহারা কোম্পানীর দোহাই দিয়া শুল্ক দিতে অস্বীকার করিত। ফলে রাজ-কোষের প্রচুর ক্ষতি হইত। দেশীয় বণিকদের স্বার্থও ইহাতে বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইত, কেন না তাহাদিগকে ত শুল্ক দিতেই হইত।

মীরকাসিম বারবার ইংরেজদের নিকট এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। তখন তীব্র বিরক্তির সঙ্গে তিনি বাণিজ্য-শুল্ক একেবারেই তুলিয়া দিলেন। ইহাতে সুবিধা হইল দেশীয় বণিকদের। শক্তিমান, দাম্ভিক ইংরেজ ইহাতে মীরকাসিমের উপর ভীষণ চটিয়া গেল। পাটনার ইংরেজ-কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেব বিস্ময়কর ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়া নবাবের অধীন সহরটি অধিকার করিয়া বসিলেন। মীরকাসিম এতদিন যথেষ্ট সহ্য করিয়াছেন। এবার তাঁহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি এলিস সাহেবকে তাঁহার অনুচরগণসহ বন্দী করিলেন। ফলে

ক্রোধান্ধ ইংরেজ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালা প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ হইল (১৭৬৩)। দুঃখের বিষয় প্রত্যেকটি যুদ্ধেই মীরকাসিম পরাভূত হইলেন। অতঃপর দিল্লীর নামমাত্র সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মীরকাসিমের পক্ষ লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধ হইল বক্সারে (১৭৬৪)। এই যুদ্ধেও ইংরেজরাই জয়ী হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া মীরকাসিম প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। তাঁহার শেষজীবন যাপিত হইয়াছিল চরম দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে।

ইংরেজরা বাঙলার মসনদে আবার মীরজাফরকে বসাইল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই মীরজাফরের মৃত্যু হইল। এবার মসনদে স্থাপিত হইলেন নজমউদ্দৌলা নামে মীরজাফরের এক অপদার্থ পুত্র।

ক্লাইভের ভারত-ত্যাগের পরেই বাঙলায় দেখা দিয়াছিল চরম বিশৃঙ্খলা। ইহার কারণ, ইংরেজ শাসকদের দেশ শাসনে আগ্রহ কিংবা যোগ্যতা ছিল না অণুমাত্রও। তাহাদের দুর্জয় উৎসাহ ছিল শুধু নির্লজ্জভাবে উৎকোচ-গ্রহণে। তাহাদের নির্মম অত্যাচারের ফলে বাঙলার অধিবাসীদের দুঃখদুর্দশার আর সীমা ছিল না।

কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারকল্পে ক্লাইভকে পুনরায় বাঙলা দেশে পাঠাইলেন (১৭৬৫)। আগেই বলিয়াছি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মীরকাসিমের পক্ষ লইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে এতদিন তাঁহার সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি হয় নাই। ক্লাইভ আসিয়া অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি করিলেন। সুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করিলেন ৫০ লক্ষ টাকা। তা' ছাড়া এলাহাবাদ ও কোরা এই দুইটি জিলাও নবাব ইংরেজদের নিকট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

দিল্লীর সম্রাট্ তখন দ্বিতীয় শাহ আলম। সম্রাট্ তিনি ছিলেন নামেই, কারণ সাম্রাজ্য বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না। কিন্তু সে যুগে নামের মূল্যও ছিল যথেষ্ট। তাই সাম্রাজ্যহীন সম্রাট্ ছিলেন তখনও সারা ভারতের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাই ক্লাইভ তাঁহাব সন্তোষ বিধানে মনোযোগী হইলেন। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে সদ্য-লব্ধ এলাহাবাদ ও কোবা তিনি দান করিলেন সম্রাট্কে। তাঁহাকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবেন, এ সর্তে তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানীর জন্য বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীও আদায় করিয়া লইলেন। এই ভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অধিষ্ঠিত হইলেন দেওয়ানী পদে।

ক্লাইভ বাঙলার নবাবের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে আরও স্থির হইল, কোম্পানী শুধু যে দেওয়ানের কাজ করিবেন তাহা নয়, দেশরক্ষার কর্তব্যও পালন করিবেন। নবাবের কর্তব্য রহিল মাত্র দুইটি,—দেশ-শাসন ও ফৌজদারী বিচার।

ক্লাইভ এই যে শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলেন তাহা দ্বৈত-শাসনপ্রণালী নামে খ্যাত।

নবাব নামেই দেশ-শাসন ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা লাভ করিলেন। কোম্পানী বাঙলায় ও বিহারে রাজস্ব আদায়ের জন্য যথাক্রমে রেজা খাঁ ও সীতাব রায়কে নায়েব নাজিম নিযুক্ত কবিয়াছিলেন। নবাবের যাবতীয় ক্ষমতাও অবিলম্বে ইহাদের হাতে চলিয়া গেল। ইহারা দুজনেই ছিলেন নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার জীবন্ত মূর্তি। ইহাদেব কুশাসনে দেশময় হাহাকার শুরু হইল। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বাঙলায় দেখা দিল ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। ইতিহাসে ইহা ছিয়াত্তরেব মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই মন্বন্তরে বাঙলাব মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বাঙলা যেন এক মহাশ্মশানে পরিণত হইল।

বাঙলার শাসক হিসাবে ইংরেজদের অবশ্য কর্তব্য ছিল দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদের প্রাণ রক্ষার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা। কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে চরম ঔদাসীন্যের পরিচয় দিল। এই দারুণ দুর্দিনে তাহারা প্রজাদের নিকট হইতে যে ভাবে অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত খাজনা আদায় করিয়াছিল তাহা কল্পনা করিতেও প্রাণ শিহরিয়া ওঠে। শোনা যায় দুর্ভিক্ষের বৎসর যে পরিমাণ খাজনা আদায় হইয়াছিল পূর্বে আর কখনও তত আদায় হয় নাই। এই কৃতিত্বের মূলে নায়েব নাজিম রেজা খাঁ। গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি স্বদেশবাসীদের উপর যেরূপ পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার তুলনা খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না।

কোম্পানীর এই চরম কুশাসনের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে কোম্পানী ওয়ারেন হেস্টিংস্ নামে একজন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মচারীকে বাঙলার গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন (১৭৭২)।

হেস্টিংস্ এই পদে যোগদান করিয়াই ক্লাইভের দ্বৈত শাসন-প্রণালী রহিত করিলেন। রেজা খাঁ এবং সীতাব রায় পদচ্যুত হইলেন। কোম্পানী এখন হইতে শুধু কাজে নয় নামেও বাঙলার সর্বময় কর্তা হইলেন। বাঙলার ক্ষমতাচ্যুত নবাব পূর্বের ন্যায় শুধু ব্রিটিশ-প্রদত্ত বৃত্তিই ভোগ করিতে লাগিলেন। উহার পরিমাণও অবশ্য অনেক হ্রাস করা হইল।

এইরূপে বাঙলায়, তথা ভারতে যে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপিত হইল তাহার অবসান হইল গত ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট।

প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শাসন, কোন কোন বিষয়ে মঙ্গলজনক হইলেও, ইহার ফলে অর্থনৈতিক দিক্ হইতে বাঙলা তথা ভারত যে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই দুর্দশার জটিল জাল হইতে আমাদিগকে অবশ্যই মুক্ত হইবে ঐক্যবদ্ধ ও নিরলস পরিশ্রমের দ্বারা।

বাঙলার কথা

পশ্চিম বঙ্গ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৮টি রাজ্য এবং ৮টি কেন্দ্রীয়-শাসিত অঞ্চল। রাজ্যগুলির মধ্যে কেরল বাদে অন্য প্রত্যেকটি রাজ্য অপেক্ষা আমাদের পশ্চিম বঙ্গ আয়তনে ছোট। অবিভক্ত বাঙলার ভূমিভাগের মাত্র ৩৬ শতাংশ পড়িয়াছে পশ্চিম বঙ্গে, বাকী ৬৪ শতাংশ লইয়া গঠিত পূর্ব পাকিস্তান।

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া,—এই কয়টি জেলা লইয়া পশ্চিম বঙ্গ।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গদেশ বিভক্ত হয় তখন পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাংশের সব ক'টি জিলা (দার্জিলিং, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি) উহার দক্ষিণ অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই দুই অংশের মধ্যে ছিল পাকিস্তানের দুইটি জিলা—দিনাজপুর ও রংপুর। পশ্চিমবঙ্গের এই দুই বিচ্ছিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত ও যোগাযোগের পথ ছিল তখন শুধু প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের মধ্য দিয়া। ফলে স্বভাবতই অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হইত। এই অসুবিধা বিদূরিত না হইলে পশ্চিম বঙ্গের সামগ্রিক উন্নতি অসম্ভব, এ কথা দিবালোকের মতই স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন বিহারের কয়েকটি জিলায় বিহারী অপেক্ষা বাঙ্গালীর সংখ্যা অনেক বেশী। এই জিলাগুলি প্রকৃতপক্ষে বাঙলা দেশেরই অংশ। ব্রিটিশ সরকারের কূটনীতির ফলে এগুলি বিহারের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে বৃটিশ আমল হইতেই বাঙ্গালীগণ আন্দোলন চালাইতে থাকেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ হিন্দু আশ্রয়ের সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে

আরম্ভ করিলে এই আন্দোলন অতি প্রবল আকার ধারণ করে। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে একটি সীমানা কমিশন গঠিত হয়। এই সীমানা কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার মানভূম সদর মহকুমার ৫টি থানা বাদে বাকী ১৭টি থানা এবং পূর্ণিয়া জিলার কিষণগঞ্জ মহকুমার কিষণগঞ্জ শহর বাদে অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেন। পূর্ণিয়া জিলার মধ্য দিয়া দার্জিলিং জিলার শিলিগুড়ি পর্যন্ত একটি জাতীয় সড়ক (National Highway) গিয়াছে। এই সড়কটি এবং ইহার পশ্চিমে ২০০ হাত পর্যন্ত ভূমিখণ্ডও পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হইয়াছে।* বিহারের কিছুটা অংশ এইরূপে পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরিত হইবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন যেমন কিয়ৎপরিমাণে বাড়িয়াছে, তেমনি ইহার বিচ্ছিন্ন অংশ দুইটিও পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। অবশ্য বিহারের নিকট হইতে পশ্চিমবঙ্গ যে ভূমিখণ্ডটুকু পাইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবীর তুলনায় তাহা নিতান্তই যৎসামান্য।

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বর্তমানে প্রায় ৩৩৮২৯ বর্গ মাইল এবং লোক-সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। প্রতি বর্গমাইলে ইহার লোকসংখ্যা ১০৩১ জন।

পশ্চিমবঙ্গে দুইটি বিভাগ—বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী।

বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া এই কয়টি জিলা লইয়া বর্ধমান বিভাগ।

কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কুচবিহার ও পশ্চিম দিনাজপুর এই কয়টি জিলা লইয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগ।

ভূ-প্রকৃতি—পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয় পর্বত। এই রাজ্যের সর্বোত্তর জিলা দার্জিলিং প্রকৃতপক্ষে হিমালয়েরই অংশ। ইহার

*এই হস্তান্তর সাধিত হইয়াছে ১৯৫৬ সালের বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ এলাকা (ভূমি) হস্তান্তর আইন অনুযায়ী।

উচ্চ শৃঙ্গগুলি সর্বদা তুষারে আবৃত থাকে। দার্জিলিং-এর পাদদেশে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জিলা। এই অঞ্চলে মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়। কোন কোন জায়গায় পাহাড়ের ঠিক পাশেই নিম্ন জলাভূমি।

মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুর পশ্চিম বঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই জিলা দু'টির অধিকাংশই সমভূমি। ইহার ভূভাগ প্রাচীন পলি মাটি দিয়া গঠিত। ইহার মাটি স্থানে স্থানে লাল ও পীতবর্ণ।

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুব জিলাব পশ্চিম অংশ কোথাও কিছুটা উঁচু, কোথাও কিছুটা নীচু। এই অঞ্চল কঙ্করময। ইহা তেমন উর্বর নয়। আগ্নেয় শিলাদ্বারা ইহা গঠিত। তাই ইহার রং লাল। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের ঠিক পূর্বেই ছিল সমুদ্র। ময়ূবাক্ষী, দামোদর, অজয় প্রভৃতি নদী যুগ যুগ ধরিয়া এই সমুদ্রে পলিমাটি বহন করিয়া আনিত, ফলে কালক্রমে জন্ম হয মুর্শিদাবাদ বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জিলার পূর্ব দিক্‌কার অংশ।

ভাগীরথী ও হুগলী নদীর পূর্বদিকের মুর্শিদাবাদের অংশ এবং নদীয়া, ২৪ পরগণা ও কলিকাতা সমভূমি। এই সমভূমির বয়স খুব বেশী নয়। ইহা ভাগীবথী প্রভৃতি নদীর পলিমাটি দ্বারা গঠিত।

পুরুলিয়া জিলার কিছুটা অংশ পর্বতময়।

পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলে সুন্দরবন। এখানে বিস্তৃত জলাভূমি এবং অসংখ্য ছোট বড় নদী। বড় বড় নদীগুলিতে বহু অরণ্যপূর্ণ ছোট ছোট দ্বীপ আছে।

নদ-নদী—পশ্চিম বঙ্গের প্রধান নদী গঙ্গা। গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে মালদহ জিলার মধ্য দিয়া। মুর্শিদাবাদ জিলায় পৌঁছিয়া গঙ্গা দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রধান শাখাটির

নাম পদ্মা। পদ্মা দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। গঙ্গার অপর শাখা ভাগীরথী পশ্চিম বঙ্গের নদী। ইহা দক্ষিণবাহিনী হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

উত্তর বঙ্গের নদী তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের অন্যতম উপনদী। ইহার প্রলয়ঙ্কর বন্যা বহুবার উত্তর বঙ্গকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।

দামোদর, অজয়, রূপনারায়ণ, ময়ূরাক্ষী ও কাঁসাই (কংসাবতী), —পশ্চিম বঙ্গের এই নদীগুলির উৎপত্তি বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে। বর্ষার কয়েক মাস ছাড়া বৎসরে বাকী সময় এই নদীগুলি শুষ্ক অবস্থায় নিতান্ত নির্জীবের মত পড়িয়া থাকে। কিন্তু বর্ষাকালে ইহারা উক্ত মালভূমির লাল-মাটি বিধৌত জল প্রচুর পরিমাণে বহিয়া আনিয়া উদ্দাম গতিতে ছুটিতে থাকে। ফলে প্রলয়ঙ্কর বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যায় যে ক্ষতি সাধন করে তাহা বর্ণনার অতীত। সম্প্রতি দামোদর ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদীতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মিত হওয়ায় বন্যার আশঙ্কা অনেকটা বিদূরিত হইয়াছে। আশা করা যায়, এই নদীগুলি এখন হইতে অভিশাপের কারণ হইবে না, বরং নানা দিক্ হইতে বর-দায়িনী হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের কৃষিজ সম্পদ—পশ্চিম বঙ্গের প্রধান কৃষিজ সম্পদ ধান। আউশ, আমন ও বোরো,—পশ্চিম বঙ্গে এই তিন প্রকার ধান জন্মে। বোরোর পরিমাণ অবশ্য তেমন বেশী নয়। আউশ ও আমন মিলাইয়া বৎসরে প্রায় ৫ কোটি টন ধান উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। পশ্চিম বঙ্গে লোকসংখ্যা যেরূপ ভাবে বাড়িতেছে তাহাতে ধানের ফসল বহুগুণ বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ হইতে নানাভাবে চেষ্টা চলিতেছে সত্য, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাহাতে আশানুরূপ ফল হয় নাই।

ধানের পরেই কৃষিজ সম্পদের মধ্যে পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ ও ডাল উল্লেখযোগ্য। পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে পাট-উৎপাদনের দিক্ হইতে শীর্ষস্থানীয়। পশ্চিম বঙ্গকে তাহার শত শত পাটকলের পাটের চাহিদা মিটাইবার জন্য বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতে হইত পূর্ব পাকিস্তানের উপর। ইহাতে তাহার প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আন্তরিক চেষ্টার ফলে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পাট-উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়াছে। ফলে তাহার আর্থিক সচ্ছলতাও সেই অনুপাতে বাড়িয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গের দার্জিলিং ও কুচবিহার জেলায় প্রচুর চা জন্মে। গন্ধে ও স্বাদে এই চা অতুলনীয়। কুচবিহারের তামাক বিখ্যাত। চুরুট তৈরীর জন্যও এই তামাক ব্যবহার করা হয়। বাঁকুড়া, মালদহ, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদে রেশমের চাষ হয়।

পশ্চিম বঙ্গের বনজ সম্পদ্—পশ্চিম বঙ্গের বনের পরিমাণ বেশী না হইলেও ইহার বনজ সম্পদ্ উপেক্ষণীয় নয়। উত্তরবঙ্গের বনগুলি ফার, পাইন, শাল, গর্জন, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বৃক্ষে পূর্ণ। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিম দিকে শাল, পলাশ, মহুয়া প্রভৃতি গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য গাছ হইল সুন্দরি ও গরান। কাঠ ছাড়া মধু, মোম, লাক্ষা প্রভৃতিও সুন্দরবনের মূল্যবান্ সম্পদ্।

পশ্চিম বঙ্গের খনিজ সম্পদ্ :—পশ্চিম বাঙলার খনিজ সম্পদ্ বলিতে একমাত্র কয়লাই বুঝায়, বর্ধমানের অন্তর্গত রাণীগঞ্জ অঞ্চলে বহু কয়লার খনি আছে।* খনিগুলির মধ্যে কতকগুলির কয়লা যেমন উৎকৃষ্ট, তেমনি কতকগুলির কয়লা নিকৃষ্ট। নিকৃষ্ট কয়লা যে কাজে লাগে না তাহা নয়। রাসায়নিক শিল্পে এবং সিমেন্ট শিল্পে নিকৃষ্ট কয়লাই ব্যবহার করা হয়। বিহারের

*এই অঞ্চলের কয়লা খনির সংখ্যা ২৩৩টি। কয়লা খনি অঞ্চলের বিস্তৃতি প্রায় ৫০০ বর্গ মাইল।

ধানবাদে ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিট্যুট নামে একটি গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। নিকৃষ্ট জাতীয় কয়লাকে কি কি ভাবে কাজে লাগানো যায় ইহা উদ্ভাবন করাই এই গবেষণাগারের কর্তব্য। নিকৃষ্ট জাতীয় কয়লাকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা বেশ লাভজনক। এই উদ্দেশ্যে বোকারোতে একটি বিরাট ,কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। খারাপ কয়লা হইতে কৃত্রিম পেট্রোল তৈরীর জন্য ধানবাদের নিকট একটি কারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে।

পশ্চিম বঙ্গের শিল্প সম্পদ্

কাগজ শিল্প—১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সন্নিকটে বালীতে 'রয়াল পেপার মিল' নামে একটি কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ভারতের সর্বপ্রথম কাগজের কল। পরে ক্রমশ টিটাগড়, নৈহাটি প্রভৃতি অঞ্চলে কাগজের কল গড়িয়া ওঠে। আজ পর্যন্ত ভারতের মধ্যে কাগজ শিল্পের দিক্ হইতে পশ্চিম বঙ্গের স্থান সকলের উপরে।

কাঁচ শিল্প—কাঁচ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজন উৎকৃষ্ট বালি এবং কয়েকপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের। কিছুদিন হইল আসানসোলের নিকট শিট কাঁচের একটি বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই জাতীয় কাঁচ উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক কাজে দরকার হয়, কাঁচ ও চীনা মাটির দ্রব্য প্রস্তুত সম্পর্কে গবেষণার জন্য যাদবপুরে একটি গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

চিনি শিল্প—পশ্চিম বঙ্গে মাত্র দুইটি চিনির কল আছে। একটি মুর্শিদাবাদ জিলার বেলডাঙ্গায়, অপরটি পলাশীর নিকটে। এই কল দুইটিতে বৎসরে ৮-৯ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয়। ইহা পশ্চিম বঙ্গের প্রয়োজন মিটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাই

*সমগ্র এশিয়ার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ কাঁচ গবেষণাগার।

পশ্চিম বঙ্গকে চিনি আমদানি করিতে হয় বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি হইতে।

পাট শিল্প—পাট শিল্পের দিক্ হইতে পশ্চিম বঙ্গের স্থান ভারতের অন্য সকল রাজ্যের উপরে। ভারতে মোট ১০৬টি পাটের কল, ইহার মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ৯৫টি। এই কলগুলি সবই হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। ভারতের সর্বপ্রথম পাটকল স্থাপিত হয় রিষড়ায় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে।

ভারত হইতে বিদেশে যত দ্রব্য রপ্তানি হয় তাহার মধ্যে পাটের স্থান দ্বিতীয়। ইহার মূল্য একশত কোটি টাকারও বেশী।

বস্ত্রশিল্প :—পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৮টি কাপড়ের কল আছে। কলগুলি সবই কলিকাতার নিকটে। কাঁচা তূলা বহু দূর হইতে সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্প ততটা উন্নত হইতে পারে নাই। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫০০০ একর জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তূলার চাষ দিয়াছেন। সুখের বিষয় এই পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আশা করা যায়, এখন হইতে অধিক পরিমাণ জমিতে অনুরূপভাবে তূলাচাষের ব্যবস্থা হইবে। তাহা হইলে বাঙলার বস্ত্রশিল্প সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অন্যান্য শিল্প :—গত দশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ্ বেশ কিছুটা বাড়িয়াছে। কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা ভয়াবহ। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দুর্গতি দূর করিতে হইলে শিল্পের দিক্ হইতে উন্নত হইবার জন্য তাহাকে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে যে সব শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং এ্যালুমিনিয়াম, রসায়ন, মোটরগাড়ী, নানাবিধ যন্ত্রপাতি, সাইকেল, সেলাইকল, রবার, চামড়া ও খেলনা প্রভৃতি শিল্প। এই শিল্পগুলির

মধ্যে অনেকগুলিই গড়িয়া উঠিয়াছে আসানসোলের নিকটে। উড়রপাড়া ও কোন্নগরের বিরাট মোটরের কারখানা এবং অনুপনগরের ও বেলুড়ের অ্যালুমিনিয়মের পূর্ণাঙ্গ কারখানা দেখিবার মত জিনিস। আসানসোলের নিকটে সেন-র‍্যালে কোম্পানীর কারখানাটিও পশ্চিমবঙ্গের গর্বের বস্তু।

কুটির শিল্পেও পশ্চিমবঙ্গ পিছাইয়া নাই। মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প, শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গা ও বেগমপুরের তাঁত শিল্প এবং কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সবিশেষ উন্নত।

পূর্ববঙ্গের অনেক দক্ষ তাঁতী পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসায় তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই শিল্পের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

কয়েকটি বহুমুখী পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক বৎসর পরেই কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিবিধানকল্পে কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তদনুযায়ী কাজ শুরু করেন। এখানে এরূপ কয়েকটি পরিকল্পনার পরিচয় দেওয়া হইল।

দামোদর পরিকল্পনা :—দামোদর বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের নদ। ইহার উৎপত্তি হইয়াছে বিহারের পালামৌ জিলার খামারপাত নামক পাহাড়ে। এই পাহাড়ের উচ্চতা ৩০০৪ ফুট। দামোদর বিহারের ছোট নাগপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে এবং কলিকাতার কয়েক মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৫৩৬ মাইল। ইহার মধ্যে ৩৮০ মাইলই বিহারে, বাকী ১৫৬ মাইল পশ্চিমবঙ্গে। বর্ষাকাল ছাড়া বছরের অবশিষ্ট সময়ে এই নদীতে জলের চিহ্ন মাত্র থাকে না। তখন ইহাকে নিতান্ত নির্জীব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বর্ষাকালে ইহা ধারণ করে অতি প্রচণ্ড মূর্তি। বিহারের উচ্চভূমি হইতে

উত্থিত হইয়া ইহা পশ্চিমবঙ্গের নিম্নভূমিতে পতিত হয় কল্পনাতীত বেগে। ফলে কয়েক বৎসর পূর্বেও পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যার জলে ভাসিয়া যাইত। ইহাতে যে কি বিপুল ক্ষতি সাধিত হইত তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন (ডি. ভি. সি) নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন এবং ইহার উপর ভার দিলেন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদরকে সংযত করিয়া উহাকে নানা গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করিতে।

কর্পোরেশন গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় বিপুল অর্থব্যয়ে বিহারে নির্মাণ করিয়াছেন চারিটি বিরাট বাঁধ—কোনার বাঁধ, তিলাইয়া বাঁধ, মাইথন বাঁধ* এবং পাঞ্চেৎ বাঁধ এবং পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর ব্যারেজ। ইহা ছাড়া কর্পোরেশন বোকারোতে নির্মাণ করিয়াছেন একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং তিলাইয়ায় একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। দুর্গাপুরে এবং চন্দ্রপুরাতেও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলিতেছে। সরকারের আশা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হইলে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন ৯৪০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং ২৫৮০০০ কিলোওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। এই বিদ্যুতের চাহিদা যথেষ্ট। এখনই রেল কোম্পানী এবং বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান এই বিদ্যুৎ ব্যবহার কবিতেছে। ভবিষ্যতে এই বিদ্যুৎ-বিক্রয়ের ফলে কর্পোরেশনের আয় হইবে বার্ষিক আনুমানিক ১০ কোটি টাকা।

বলা বাহুল্য, দামোদরের প্রত্যেকটি বাঁধের সংরক্ষিত জল খালের সাহায্যে দিকে দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে।

*তিলাইয়া বাঁধ ও মাইথন বাঁধ নির্মিত হইয়াছে দামোদরের উপনদী বরাকর নদীর উপর (১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ কার্য সমাপ্ত); কোনার বাঁধ নির্মিত হইয়াছে দামোদরের আর একটি উপনদী কোনার নদের উপর (১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত); পাঞ্চেৎ পাহাড়ে বাঁধ নির্মিত হইতেছে দামোদর নদের উপর (সমাপ্তির পথে)।

দামোদর পরিকল্পনার কাজ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। ইহা যখন যথাযথ ভাবে সমাপ্ত হইবে তখন দামোদরের বন্যার সম্ভাবনা অনেকটা বিদূরিত হইবে, মৃত্তিকাক্ষয় নিবারিত হইবে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলার ১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। ৩ লক্ষ ৫২ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। ম্যালেরিয়া বিদূরিত হইবে এবং কয়েকটি কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হওয়ায় উহাতে মৎস্য-চাষের সুবন্দোবস্তও হইবে। এই হ্রদগুলি নৌকা-বিহার এবং নানাবিধ জলক্রীড়ার জন্যও ব্যবহার করা চলিবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর হইতে খাল কাটিয়া উহা হুগলী নদীর সহিত সংযুক্ত করা হইবে। ফলে এই অঞ্চল হইতে অতি অল্প ব্যয়ে জলপথে কয়লা, ধান ও অন্য নানা পণ্য দ্রব্য কলিকাতায় আসিতে পারিবে।

দামোদরে বাঁধ নির্মাণ ও খাল কাটার ফলে যে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে তাহাতে ১ কোটি ৮ লক্ষ মণ অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ছাড়া বৎসরে প্রায় ৫ কোটি টাকার রবি শস্যও পাওয়া যাইবে বলিয়া সরকার আশা করেন।

(২) **ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা**—বিহারের অন্তর্গত দেওঘরের নিকট ত্রিকূট পর্বত; ময়ূরাক্ষী নদী এই পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ৫০ মাইল পার্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছিয়াছে। বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ,—পশ্চিম বঙ্গের এই দুইটি জিলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা অনুযায়ী এই নদীতে নির্মিত হইয়াছে প্রকাণ্ড দুইটি বাঁধ। একটি বিহারের সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মশানজোড়ে এবং অপরটি বীরভূম জেলার সিউড়ির নিকটবর্তী তিলপাড়ায়। ১৫৫ ফুট উচ্চ এবং ২১৭০ ফুট দীর্ঘ মশানজোড়

বাঁধটি নির্মিত হইয়াছে কানাডা সরকারের অর্থসাহায্যে। তাই ইহার নাম রাখা হইয়াছে কানাডা বাঁধ। কানাডা বাঁধ নির্মাণের ফলে এক বিশাল জলাধারের সৃষ্টি হইয়াছে। বাঁধের দুই পাশ দিয়া কাটা হইয়াছে দুইটি প্রশস্ত খাল। এই খাল দুইটি দিয়া প্রবাহিত হইতেছে প্রচুর জলস্রোত। ইহার ফলে পশ্চিম বঙ্গে ৭২০,০০০, একর এবং বিহারে ২৫,০০০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কানাডা বাঁধটি কংক্রিট দিয়া তৈরী। ইহার উচ্চতা ১২৩ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ২১৭০ ফুট। বন্যার উদ্বৃত্ত জলরাশি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্মিত হইয়াছে কয়েকটি রেডিয়েল গেট এবং সেচকাজের জন্য জলাধার হইতে জল আহরণ করার উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছে কয়েকটি স্লুইস গেট।

বাঁধের ঠিক উপরে নির্মিত কংক্রিটের সেতুটি দেখিবার মত।

তিলপাড়া বাঁধ—কানাডা বাঁধ হইতে ২০ মাইল নিম্নভাগে নির্মিত হইয়াছে তিলপাড়া বাঁধ, দৈর্ঘ্যে ১০১৩ ফুট। এই স্থানের জলভাণ্ডারের পরিমাপ ১,২৩৯ বর্গ মাইল।

এই বাঁধের দুই পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে দুইটি মূল খাল। মূল খাল হইতে খনিত হইয়াছে বহু শাখা খাল এবং শাখা খাল হইতে প্রশাখা খাল।

ইহার ফলে পশ্চিম বাঙলার বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সোয়া সাত লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে যে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায় তাহার মূল্য আনুমানিক সোয়া আট কোটি টাকা।

মশানজোড় বাঁধ এবং তিলপাড়া বাঁধ ছাড়া এই পরিকল্পনায় আরও চারটি ছোট বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ইহাদের নাম বক্রেশ্বর বাঁধ, কোপাই বাঁধ, দ্বারকা বাঁধ ও ব্রাহ্মণী বাঁধ।

এই পরিকল্পনায় ৪ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। ইহাতে কুটির শিল্পের যথেষ্ট সুবিধা হইবে।

(৩) **কংসাবতী পরিকল্পনা**—কংসাবতী বা কাঁসাই নদী হইতে কতকগুলি সেচখাল পূর্ব হইতেই ছিল। এগুলি অকেজো হইয়া পড়ায় নূতন করিয়া কাটার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সমাপ্ত হইলে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জিলায় প্রায় আট লক্ষ একর জমি জলসেচের সুবিধা পাইবে। ইহার ফলে বন্যার জলও নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া সরকার আশা করেন।

এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছে গত ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে ব্যয় হইবে প্রায় ২৬ কোটি টাকা।

ছোট সেচ-পরিকল্পনার কথা

উপরে পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি বড় বড় সেচ-ব্যবস্থার কথা বলা হইল।

ইহা ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানে কয়েকটি ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার কাজও শেষ হইয়াছে। সবগুলিই যে নূতন তাহা নয়। অনেক পুরানো বাঁধ এবং মজা খাল ও পুকুর সংস্কার করিয়াও জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্তমান যুগে নানা দেশে বৈদ্যুতিক নলকূপের সাহায্যে জল-সেচের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। আমাদের পশ্চিম বঙ্গের হরিণঘাটায় গোচারণ ও কৃষি ভূমিতে এবং আরও কয়েকটি স্থানে এই ধরণের সেচ ব্যবস্থা শুরু করা হইয়াছে। আশা করা যায় এই ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ব্যাপক ভাবে ইহার প্রচলন হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে জলাভূমির পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। কৃষির পক্ষে জলাভূমি কোন কাজেই আসে না। ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিম বঙ্গে লোকসংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে কোন জমিই ফেলিয়া

রাখা সঙ্গত নয়। এই ধরণের জমি কৃষির উপযোগী করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে পাম্পের সাহায্যে উহার জল বাহির করিয়া ফেলার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ হইয়াছে চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত আরপাঁচ নামক স্থানে। এই পরিকল্পনা সোনারপুর-আরপাঁচ পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। ইহা সোনারপুরের নিকটে। আর-পাঁচের বিস্তীর্ণ জলাভূমির জল-নিকাশের ফলে প্রায় ৪৮৮৬৪ একর জমি উপকৃত হইয়াছে। সরকার আশা করেন এই অঞ্চলে প্রতিবৎসর প্রায় ৭৫০২৮৮ মণ ধান, ২৭১২৬ মণ রবি শস্য এবং ৭৪৩৪৮৩ মণ খড় উৎপন্ন হইবে। ইহা কম কথা নয়। এই পরিকল্পনার শুধু প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হইলে আরও ২৩০৪০ একর পরিমাণ জমি উপকৃত হইবে।

ফরক্কা বারাজ পরিকল্পনা—ফরক্কায় গঙ্গার উপর একটি বারাজ নির্মাণের জন্য পশ্চিম বঙ্গের তরফ হইতে আরও একটি পরিকল্পনা গৃহীত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রবল দাবী উত্থাপিত হইয়াছে। ইহার নির্মাণ-কার্য শেষ হইতে হইবে। এই বারাজটি নির্মিত হইলে পশ্চিম বঙ্গের গঙ্গা এবং অন্য অনেকগুলি নদী পুনরায় প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। ফলে উত্তর বঙ্গের সঙ্গে শুধু উত্তর বঙ্গের নয়, উত্তর ভারতের সঙ্গে বারোমাসই পশ্চিম বঙ্গের জলপথে যোগাযোগ অব্যাহত থাকিবে। কলিকাতা বন্দরের বিপদ দূরীভূত হইবে এবং ডায়মণ্ড হারবার হইতে অনায়াসে জাহাজ কলিকাতায় আসিতে পারিবে। গঙ্গার জলের লবণাক্ত ভাবও বিদূরিত হওয়ায় উহা সুস্বাদু হইবে। কৃষিকার্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এক কথায় এই একটি পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হইলে পশ্চিম বঙ্গের চেহারাই ফিরিয়া যাইবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সূচী

উপরে যে সব উন্নয়নমূলক কাজের কথা বলিলাম তাহা সম্পন্ন হইয়াছে সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী। ইহার কোন কোনটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা এবং কোন কোনটি রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী 'পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এবং সমাপ্ত হয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। ইহার পর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ। দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত কাজ অতি বিরাট্, তাই উহা শুধু এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। ইহার কাজ শেষ হইতে আরও কয়েক বছর লাগিবে।

এখন সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সূচী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার বিপুল অংশ বাস করে গ্রামে। সুতরাং গ্রামের প্রকৃত উন্নতির উপরই নির্ভর করে দেশের সত্যকার উন্নতি। তাই সরকার গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে মনোযোগী হইলেন। এই উদ্দেশ্যে গৃহীত হইল সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Project) এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সূচী। প্রথম পরিকল্পনার মেয়াদে এই কাজের জন্য মাত্র কয়েকটি অঞ্চল বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল।* উক্ত অঞ্চলগুলিকে ভাগ করা হইয়াছে কতকগুলি ব্লকে গ্রামের সংখ্যা এক শত এবং জনসংখ্যা ষাট হাজার হইতে সত্তর হাজার। এই কাজের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শত শত কর্মচারী।

আগেই বলিয়াছি, এই পরিকল্পনা দুইটির উদ্দেশ্য হইল গ্রাম ও গ্রামবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত

*সরকারের সঙ্কল্প হইল ক্রমশ সমগ্র দেশটি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা।

কাজগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে :—(ক) কৃষির উন্নতিবিধান (খ) পশু ও হাঁস-মুরগী প্রভৃতি পালন (গ) সেচের কাজ (ঘ) রাস্তাঘাট নির্মাণ (ঙ) কুটিরশিল্পের প্রসার (চ) বেকার সমস্যার সমাধান (ছ) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গৃহ নির্মাণ (জ) শিক্ষার প্রসার (ঝ) স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান (ঞ) নানাবিধ সামাজিক আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান (ট) সমবায় সমিতির সংগঠন।

সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারিগণ উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে গ্রামবাসিগণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেন এবং যথাসম্ভব সাহায্য করেন।

এই পরিকল্পনা দুইটির সাফল্যের জন্য এক দিকে যেমন প্রয়োজন সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা, সততা ও কর্তব্য-নিষ্ঠা, অপর দিকে তেমনি প্রয়োজন গ্রামবাসীদের এসব কাজে অফুরন্ত উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতা।

সরকার ও জনগণ যদি সত্য-সত্যই আন্তরিকতার সহিত এই কার্যসূচী অনুসারে কাজ করেন, তবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামসমূহ অবশ্যই আবার শ্রী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে।

বর্ধমান বিভাগ

বর্ধমান জিলা

বর্ধমান শহরঃ—বর্ধমান শহরের ন্যায় প্রাচীন শহর বাঙলা দেশে খুব কমই আছে। রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র বর্ধমান শহরকে তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ঘটনাস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বর্ধমানের রাজবংশ বাঙলাদেশে সুবিখ্যাত। মহারাজ তিলকচাঁদ বাদশাহ্ শাহ্আলমের নিকট হইতে মহারাজাধিরাজ উপাধি পাইয়াছিলেন। তিলকচাঁদ স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি বাঙলার নবাব এবং ইংরেজ কোম্পানী কাহারও বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। একসময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটিলে তিলকচাঁদ নিজ রাজ্য হইতে কোম্পানীর জাহাজ বাহির করিয়া দেন। কর্মচারীদের প্রতি তাঁহার কঠোর নির্দেশ ছিল। ভবিষ্যতে কখনো যেন তাঁহার রাজ্যে কোম্পানীর কোন জাহাজ প্রবেশ করিতে না পারে। বাঙলার নবাব মীরকাসিম যখন বর্ধমান মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরেজ কোম্পানীর হাতে তুলিয়া দিলেন তখনও এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তিলকচাঁদ বীরভূমের রাজার সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। অবশ্য এই ইংরেজদের বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তিনি জয়ের গৌরব অর্জন করিতে পারেন নাই।

তিলকচাঁদের মৃত্যুর পর রাজা হন তেজচন্দ্র বা তেজচাঁদ। তেজচাঁদের এক ভ্রাতা প্রতাপচাঁদ অল্পবয়সে সংসার ত্যাগী হন। বহু বৎসর পরে হঠাৎ বর্ধমানে এক আগন্তুক আসিয়া নিজেকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া প্রচার করেন এবং জমিদারীর অর্ধেক অংশ দাবী করিয়া বসেন। অবশ্য তাঁহার চাতুরী শীঘ্রই ধরা পড়িয়া যায় এবং তাঁহার

নাম দেওয়া হয় জাল প্রতাপচাঁদ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে এই ঘটনাটি অমর হইয়া আছে।

তেজচন্দ্রের দত্তক পুত্র মহাতাব চাঁদ ছিলেন ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশেষ অনুরাগী। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি ইংরেজদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরেজ সরকার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে তোপ ধ্বনি দ্বারা সম্মানিত হইবার অধিকার দান করেন।

বর্ধমানের রাজপরিবারের প্রায় সকলেই ছিলেন সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগী। সাধক কবি কমলাকান্ত এবং নীলকান্ত বর্ধমান-রাজের রাজকোষ হইতে প্রচুর বৃত্তি পাইতেন। মহাতাবচাঁদ নিজ ব্যয়ে মূল মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ করাইয়া দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

বর্ধমানের দ্রষ্টব্য বস্তু—বর্ধমানের রাজপ্রাসাদ সর্বতোভাবে রাজপ্রাসাদ নামের যোগ্য। মহারাজ মহাতাব চাঁদ বহু অর্থব্যয়ে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে এখানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ধমানের স্টার অব ইণ্ডিয়া নামক বিরাট তোরণ, গোলাপ বাগ, দিলখোস বাগ, শ্যামসায়র ও কৃষ্ণসায়র নামক দীঘি এবং সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির দেখিবার মত। গোলাপবাগের পশুশালাটি বিচিত্র। স্টার অব ইণ্ডিয়া গেটটি নির্মিত হইয়াছিল লর্ড কার্জনের সম্মানার্থে। বর্ধমান রাজপরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুটি কলেজ পশ্চিম বঙ্গের দুই প্রসিদ্ধ শিক্ষায়তন।

বর্ধমান শহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে নবাবহাটে বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত একশত আটটি শিবমন্দির আছে। ইহার নিকটেই বিখ্যাত তেলিয়াগড়ির দুর্গ। বহু দূর হইতে এই দুর্গটি দেখা যায়।

এককালে বর্ধমান স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল এবং ইহা 'বাঙলার বাগিচা' নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ভয়াবহ ম্যালেরিয়া দেখা দিলে বর্ধমানের পূর্বেকার সুদিন

বিদায় লয়। এমন দিন গিয়াছে যে বর্ধমানের জ্বর শুনিলে লোকে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। সুখের বিষয়, বর্ধমান এখন ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইয়াছে বলিলেই হয়।

বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানা নামক মিষ্টান্ন দুইটির নাম দেশ-বিদেশে সুপরিচিত।

অম্বিকা গ্রাম—অম্বিকা গ্রাম বৈষ্ণবদিগের একটি মহাতীর্থ। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গৌরীদাস বাবাজীর শ্রীপাট অবস্থিত। গৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম নিমকাঠের তৈয়ারী গৌর-নিতাইএর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার পূজা আরম্ভ করেন। গৌরাঙ্গ প্রভুর স্বহস্ত-প্রদত্ত উপহার গীতা এবং নৌকা বাহিবার একটি দাঁড় আজও শ্রীপাট অম্বিকাতে সযত্নে রক্ষিত আছে। বৎসরে বৎসরে শ্রীপাট অম্বিকাগ্রামে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বৈষ্ণবগণের মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অম্বিকা গ্রামের নিকটে 'শ্রীনামব্রহ্ম' মন্দির। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে একজন বৈষ্ণব সাধকের সমাধি আছে। প্রবাদ এই যে, অম্বরীষ নামে এক ঋষি এখানে আসিয়া ঘট স্থাপনা করিয়া দেবী অম্বিকার আরাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেবীর নাম হইতেই নাকি এখানকার নাম হইয়াছে অম্বিকা গ্রাম।

কালনা—কালনা বর্ধমান জিলার অন্যতম মহকুমা শহর। মুসলমান আমলে ইহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। এখানে মুঘল যুগের একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। মুসলমান ফকির বদর সাহেব এবং মজলিস সাহেবের সমাধি দুইটি এখনও স্থানীয় অধিবাসিগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।

১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র কালনার গঙ্গাতীরে একটি গঙ্গাবাস স্থাপন করেন। প্রাসাদের সঙ্গেই পর পর ১০৯টি শিব মন্দির। প্রাসাদের অন্তর্ভাগেও কয়েকটি মন্দির আছে।

প্রাসাদের নিকটেই সমাজবাড়ী। এখানে বর্ধমান রাজ-পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের চিতাভস্ম এবং স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে।

বিখ্যাত সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য কালনাতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শ্যামাসঙ্গীত অতীব জনপ্রিয়।

অগ্রদ্বীপ—অগ্রদ্বীপ বর্তমানে বর্ধমান জিলার অন্তর্গত হইলেও যে নয়টি দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ তাহারই একটি।

অগ্রদ্বীপে চারিশত বৎসরের অধিককালপূর্বে প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথের বিগ্রহ আছে। এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ ঘোষ। গোবিন্দ ঘোষকে মহাপ্রভু অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিলেন। পথে গোবিন্দ ঘোষের আচরণে গৌরাঙ্গদেব বুঝিলেন তাঁহার মন এখনও সম্পূর্ণরূপে বিষয়-মুক্ত হয় নাই। তাই তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ, তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও। তোমার বৃন্দাবন যাওয়া হইবে না। তোমার মনে নিষ্কলুষ ভক্তি আছে সত্য, কিন্তু বিষয়-বাসনা তুমি এখনও ত্যাগ করিতে পার নাই। আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি অগ্রদ্বীপেই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিয়ত তাঁহার সেবায় মগ্ন থাক। এই সেবায় তুমি প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ পাইবে।"

গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর কথামত এখানে বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপন করিলেন। গোবিন্দের মৃত্যুকালে তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারী কে হইবে এই প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'গোপীনাথ'। সেই কথামত আজ পর্যন্ত প্রতি বৎসর চৈত্রমাসের কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে গোপীনাথকে শ্রাদ্ধের উপযোগী বেশে সজ্জিত করা হয়।

বারুণী স্নানের সময় অগ্রদ্বীপে বহু জনসমাগম হয়। বারুণী উপলক্ষে এখানে গঙ্গাস্নান বারাণসীর গঙ্গাস্নানের সমতুল বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

কাটোয়া—ইহা ভাগীরথী ও অজয়নদের তীরে অবস্থিত। বর্তমানে ইহা একটি জংসন স্টেসন হিসাবে সুপরিচিত। মুসলমান যুগে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। কাটোয়ার দুর্গ ছিল এক সময়ে বিখ্যাত। নবাব আলিবর্দির বিরুদ্ধে এইখানে ভাস্কর পণ্ডিত মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। এক যুদ্ধে জয়ী হইয়া মারাঠারা এই দুর্গটি অধিকার করিয়া লয়। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে লর্ড ক্লাইভ ইহা দখল করিয়া লইয়া নবাব সিরাজের সঙ্গে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। দুর্গটির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া এখন আর উহাকে এক কালের দুর্গ বলিয়া চেনা যায় না। কাটোয়ায় মুর্শিদকুলি খাঁর আমলের নির্মিত একটি মস্‌জিদ আছে।

কাটোয়া বৈষ্ণবতীর্থ হিসাবেও প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও কোথাও ইহাকে কণ্টকনগর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব কাটোয়াতে দণ্ডীস্বামী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন।

কাটোয়ার নিকটে ঝামটপুর গ্রামে 'চৈতন্য চরিতামৃত' লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাস ছিল।

কাটোয়ার নিকটবর্তী ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী একটি অতি প্রাচীন স্থান। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে, দেবরাজ ইন্দ্র নাকি এখানে আসিয়া গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে ইন্দ্রাণী।

"নিমেষেতে আইলেন গ্রাম ইন্দ্রেশ্বর।
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর।
গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান।
ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান॥"

ইন্দ্রাণী এখন একটি পরগণার নাম।

সিঙ্গিগ্রাম:—মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিয়া যে কাশীরাম দাস বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে অমৃতরসে সিঞ্চিত করিয়াছেন সেই কাশীরাম দাসের জন্মস্থান সিঙ্গিগ্রাম।

আজিও লোকে সুর করিয়া পড়ে—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

সিঙ্গিগ্রামে কাশীরামের স্মৃতিচিহ্ন 'কাশীর ভিটা' এবং কেশে পুকুর এখনও বিদ্যমান।

কাশীরাম দাসেরা তিন ভ্রাতা ছিলেন। তিন ভ্রাতাই ছিলেন কবিপ্রতিভাসম্পন্ন।

সীতাহাটি—কাটোয়ার অন্তঃপাতী সীতাহাটি গ্রামে মহারাজ বল্লালসেনের একটি তাম্র শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনখানি রক্ষিত আছে কলিকাতার যাদুঘরে।

শ্রীখণ্ড—শ্রীখণ্ড একটি বর্ধিষ্ণু পল্লী। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ পরম বৈষ্ণব নরহরি ঠাকুর, রঘুনন্দন এবং মুকুন্দ এই শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। প্রতি বৎসর শ্রীখণ্ডে কার্তিকমাসে নরহরি ঠাকুরের তিরোধান তিথিতে 'মধুমতী উৎসব' নামে একটি বিরাট মেলার অনুষ্ঠান হয়।

দুর্গাপুর—দুর্গাপুরের নাম আগে খুব কম লোকেই জানিত। কিন্তু আজ দুর্গাপুর পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। দামোদরের একটি বিরাট ব্যারাজ এখানে নির্মিত হইবার ফলে ইহার গুরুত্ব বিশেষভাবে বাড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্য হইল দুর্গাপুরকে পশ্চিমবঙ্গের 'রুঢ়ে' পরিণত করা (রুঢ় পশ্চিম জার্মানীর, শুধু পশ্চিম জার্মানীর নয়, সমগ্র ইউরোপের বৃহত্তম কয়লাখনি অঞ্চল ও শিল্প কেন্দ্র)।

বর্তমানে দুর্গাপুরে কয়লা হইতে কোক, গ্যাস ও নানা উপজাত দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য একটি বিরাট কোক চুল্লী (coke oven plant) নির্মিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এখানে একটি বিরাট ইস্পাতের কারখানা নির্মাণ করিয়াছেন। এই কারখানায় বার্ষিক প্রায় ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন

এখানে দশ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। কয়লা ধুইবার জন্য একটি যন্ত্রও শীঘ্রই এখানে স্থাপিত হইয়াছে।

দুর্গাপুরের নিকটে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি। সুতরাং এখানে কয়লা বেশ সস্তা। দুর্গাপুরে উপরোক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিলে শিল্পপতিগণ স্বভাবতই দুর্গাপুরের দিকে আকৃষ্ট হইবেন এবং আরও নূতন নূতন বহু কারখানা এখানে স্থাপিত হইবে। ফলে উহা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইবে।

চিত্তরঞ্জন—বাঙলার দধীচি, মৃত্যুঞ্জয়ী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পবিত্র স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার মিহিজাম নামক গ্রামে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্ নামে রেল ইঞ্জিনের একটি বিরাট কারখানা স্থাপন করিয়াছেন (১৯৪৮)। এই কারখানাটি ভারতের একটি গর্বের বস্তু। এই কারখানায় প্রথম রেলইঞ্জিন তৈরী হয় ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর এই কারখানায় বৎসরে প্রায় একশতটি ইঞ্জিন তৈরী হইয়াছে। এখন বৎসরে প্রায় দুই শত রেল-ইঞ্জিন তৈরী হইতেছে।

রাণীগঞ্জ—এই শিল্প-সমৃদ্ধ শহরটি দামোদর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত। ইহার প্রসিদ্ধি কয়লাখনির জন্য। রাণীগঞ্জের এই কয়লাখনি অঞ্চল পূর্বে ও পশ্চিমে ৩০ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তরে ও দক্ষিণে প্রায় ১৮ মাইল বিস্তৃত।

রাণীগঞ্জের বেঙ্গল পেপার মিল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাগজ তৈরীর কারখানা। রাণীগঞ্জের টালীর খুব সুনাম আছে। শিল্প-প্রধান শহর হইলেও রাণীগঞ্জ বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

আসানসোল—আসানসোলের নিকটে বহু কয়লার খনি আছে। ইহা একটি বড় রেল-জংসন। আসানসোলের রেলকারখানাটি দেখিবার মত। দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বিখ্যাত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ এই শহরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখানে একটি

কুষ্ঠাশ্রম ও অনাথ আশ্রম আছে। এই প্রতিষ্ঠান দুটিই মেথোডিস্ট এপিস্কোপ্যাল মিশন দক্ষতার সহিত পরিকল্পনা করিতেছেন।

বার্নপুর—আসানসোল শহর হইতে মাত্র দেড়শ মাইল দূরে অবস্থিত এই শহরটি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কস্ নামক ইস্পাত কারখানার জন্য সর্বত্র পরিচিত। এই শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে অনেকটা সুপ্রসিদ্ধ শিল্পনগর জামসেদপুরের অনুকরণে।

কুলটি—এখানকার কুলটি আয়রন এ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কস্ এবং রিফ্র্যাক্টরীজ ওয়ার্কস উল্লেখযোগ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

দাঁইহাট—তসরের কাপড়, বাসনশিল্প এবং পাথরের মূর্তির জন্য দাঁইহাট বিখ্যাত।

কাঞ্চননগর—কাঞ্চননগরের দেশজোড়া খ্যাতি ছুরি ও কাঁচির জন্য।

বাঁকুড়া

পূর্বে বাঁকুড়া জেলার পৃথক্ কোন অস্তিত্ব ছিল না। বাঁকুড়া ছিল মল্ল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। মল্লরাজগণের পতনের পর ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে এই ভূখণ্ড পৃথক্ জিলায় পরিণত হইয়া বাঁকুড়া নামে পরিচিত হইয়াছে।

বাঙলার অন্যতম জেলা হইলেও বাঁকুড়া প্রকৃতপক্ষে ছোটনাগপুরের মালভূমির পূর্বদিকেরই অংশ। বাঁকুড়ার সদর মহকুমার ভূমি কঙ্করপূর্ণ এবং উঁচুনীচু। এখানকার কঙ্করময় উঁচু জমি ডুংরি নামে পরিচিত। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নমনোহর। বসন্তকালে শাল, পিয়াল ও পলাশবনের শোভা অপূর্ব।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমাটি মোটামুটি সমতল। এখানকার মাটি লাল।

এই জিলার প্রধান নদী—দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাই ও কাঁসাই বা কংসাবতী। এই নদীগুলীতে জল থাকে শুধু বর্ষাকালেই।

গ্রীষ্মকালে ইহাদের বুকের উপর দেখা যায় শুষ্ক, উত্তপ্ত বালুরাশি।

বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর মহকুমার জমি বেশ উর্বর। তাই এখানে ধান উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণে।

বাঁকুড়া—গন্ধেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর এই দুইটি নদী বাঁকুড়া শহরটিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। শহরের জলবায়ু শুষ্ক বলিয়া স্বাস্থ্যকর।

এখান হইতে নানাস্থানে পিতলের বাসন, সূতা, তসরের বস্ত্র, শাঁখার অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানি হয়।

এখানকার মণি মহাদেব বা এক্তেশ্বর শিবের মন্দির একটি উল্লেখযোগ্য দেবস্থান।

বিষ্ণুপুর—বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধি অতি প্রাচীনকাল হইতে। বর্তমানে ইহা বাঁকুড়া জিলার একটি মহকুমা। এককালে এই বিষ্ণুপুর ছিল প্রাচীন মল্ল রাজগণের রাজধানী। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন স্থাপত্য—বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের কুলদেবতা মদনমোহনের মন্দির দেখিবার মত। ইহার প্রাচীরগাত্রে ক্ষোদিত দৃশ্যাবলী ও মূর্তিগুলি শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিষ্ণুপুরের জোড়বাঙলার মন্দিরেও অনুরূপ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের অন্যান্য প্রাচীন কীর্তির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল মদনমোহন, মদন গোপাল। কালাচাঁদ, শ্যামরায় ও রাধাশ্যামের মন্দির, পঞ্চরত্নমন্দির এবং পাথর দরজা ও বীরদরজা নামে প্রস্তর-নির্মিত দুইটি দুর্গদ্বার। লাল বাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ, যমুনা বাঁধ, শ্যাম বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ প্রভৃতি বিশাল জলাশয় মল্লভূমির প্রাচীন ঐশ্বর্যের পরিচয় দেয়।

দলমাদল কামান—এখানকার দলমর্দল বা দলমাদল কামানটি দেখিবার মত জিনিস। ইহা দৈর্ঘ্যে সাড়ে বারো ফুট। ইহার পরিধি সাড়ে এগারো ইঞ্চি। ইহা তৈরী করিতে সেযুগে একলক্ষ পাঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কথিত আছে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা যখন বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে তখন স্বয়ং মদনমোহন এই

দলমাদল কামান দাগিয়া মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে পরাস্ত করেন।

গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ বিষ্ণুপুর সঙ্গীত চর্চার জন্য বিখ্যাত। সঙ্গীতাচার্য যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই বিষ্ণুপুরেরই অধিবাসী।

বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখিয়াছেন—'গৌরবময়, সৌরভময়, সঙ্গীতময় দেশ'।

বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতের মত বিষ্ণুপুরের অম্বুরী তামাকও প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরের রেশম শিল্পের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। বিষ্ণুপুরের কারিগরগণ এসরাজ, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে অতিশয় দক্ষ।

মল্লরাজবংশের কথা—বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও সাঁওতাল পরগণার কিয়দংশ লইয়া মল্লভূম রাজ্য গঠিত ছিল।

এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিমল্ল বা রঘুনাথ মল্ল সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এক ক্ষত্রিয় রাজমহিষী শ্রীক্ষেত্রে তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে সন্তান প্রসব করেন এবং কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই মাতৃহীন শিশুটি তদবধি পালিত হইতে থাকে এক দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রের তেজ ও বীর্য প্রকাশিত হইতে থাকে। কালক্রমে তিনি নিজ বাহুবলে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনিই মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদি মল্ল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম হইল মল্লভূম। তাঁহার পরাক্রমের নিকট বহু সামন্ত রাজাকে মাথা নত করিতে হইয়াছিল।

মল্লরাজগণের প্রথম রাজধানী ছিল প্রদ্যুম্নপুর। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মল্লরাজ জগৎমল্ল বিষ্ণুপুরে রাজধানী উঠাইয়া আনিলেন। তখন হইতে বিষ্ণুপুর হইল মল্লভূমের রাজধানী।

বীর হাম্বীর—বীর হাম্বীর মল্লরাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁহার সময়ে মল্লভূম উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দায়ুদ খাঁ হাম্বীরের রাজ্য আক্রমণ করেন। হাম্বীর নবাববাহিনীকে ভীষণভাবে পরাস্ত করিয়া স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্গের সম্মুখে নবাবী সৈন্যেরা নিহত হওয়ায় এক বিরাট স্তূপ রচিত হয়। এই স্তূপ নাকি এমন উচ্চ এবং প্রশস্ত হইয়াছিল যে এই কারণে দুর্গের এই অংশ মুণ্ডমালা ঘাট নামে পরিচিত হইল।

বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে আচার্য শ্রীনিবাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কুলচূড়ামণিগণ মল্লভূমে আসেন এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। বীর হাম্বীর স্বয়ং আচার্য শ্রীনিবাসের অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও ধর্মপ্রাণতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে।

গোপালসিংহের বেগার—আমাদের দেশে 'গোপালসিংহের বেগার' নামে একটা কথা প্রচলিত আছে। এই গোপাল সিংহ ছিলেন বিষ্ণুপুরের অন্যতম রাজা। তিনি ছিলেন এমন হরিভক্তি-পরায়ণ যে রাজ্যমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন প্রত্যেক প্রজাকে প্রত্যহ এক হাজার বার হরি নাম জপ করিতে হইবে। এই আদেশ যে অমান্য করিবে সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হরিনাম জপ করিতে বাধ্য করায় এই কাজটি 'গোপাল সিংহের বেগার' নামে পরিচিত হইল।

ইন্দ্রহাস—মল্লরাজগণের আমলে যে অঞ্চলকে ইন্দ্রহাস বলা হইত বর্তমানে তাহাই ইন্দাস নামে সুপরিচিত। এই গ্রামে বিখ্যাত তান্ত্রিক গৌরী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দাস একটি সুপ্রাচীন স্থান।

ইন্দ্রাসের নিকটে শ্রীপুরগ্রামে ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক কেদার দাস জন্মগ্রহণ করেন।

শুভঙ্কর—বাঁকুড়া জেলায় গণিতশাস্ত্রাধ্যক্ষ শুভঙ্কর দাস জন্মগ্রহণ করেন। পাত্রসায়র থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রামে শুভঙ্করের ভিটা ছিল। সেখানে একটি প্রাচীন রাস্তার অস্পষ্ট চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে ইহা 'শুভঙ্করের দাঁড়া'।

মেদিনীপুর

তাম্রলিপ্ত—প্রাচীন ভারতে যে কয়টি শহর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল তাহার মধ্যে তাম্রলিপ্তের স্থান অতি উচ্চে।

সে কালে তাম্রলিপ্তের অনেকগুলি নাম ছিল, যেমন, তাম্রলিপ্তি, তমালিপ্তি, দামলিপ্তি, বিষ্ণুগৃহ, বেলাকুল প্রভৃতি। বর্তমানে ইহা তমলুক নামে সমধিক পরিচিত। চীন দেশীয় পরিব্রাজকগণ ইহাকে তম্মোলত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতেও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতে উল্লিখিত রাজা তাম্রধ্বজের রাজ্য ছিল তাম্রলিপ্ত। তাম্রধ্বজ পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরিয়াছিলেন বলিয়া মহাবীর অর্জুনের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তাম্রধ্বজের অপূর্ব বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজা তাম্রধ্বজের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণার্জুনের মূর্তি আজিও তমলুকের রাজগৃহে জিষ্ণুহরি নামে পূজিত হইয়া থাকে। প্রায় ত্রিশ একর জমির উপর তমলুকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত ছিল ভারতের সর্বপ্রধান বন্দর। মহাবংশ নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্ত ছিল বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর। তখন ইহা সমুদ্রতীরে ছিল বলিয়া ইহার আর এক নাম ছিল বেলাকুল। একসময়ে এখানে জাহাজ নির্মিত হইত। কথিত আছে যে, বাঙলার বীর তনয় বিজয় সিংহ এখান হইতেই সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া লঙ্কায় পৌঁছেন এবং সেখানে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম দেন সিংহল। এখান হইতেই অশোকের পুত্র মহেন্দ্র (কাহারও কাহারও মতে মহেন্দ্র ছিলেন অশোকের ভ্রাতা) সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত ছিল তখন মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সেকালে চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে যাইবার জন্য তাম্রলিপ্তই ছিল প্রধান বন্দর।

বৈদেশিকদের বিবরণী—বিশ্ববিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণের শেষ দুই বৎসর এই নগরেই যাপিত হয়। সে সময়ে এখানে চব্বিশটি সঙ্ঘারাম ছিল। অনেক বৌদ্ধ শ্রমণ এখানে বাস করিতেন। পরবর্তীকালে হর্ষবর্ধনের আমলে হিউএন সাঙ তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য সম্পদ্ দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তখন এই বন্দর বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নিম্নভূমিতে অবস্থিত ছিল। এখানে দশটি বৌদ্ধ মঠ ও পঞ্চাশটি হিন্দু মন্দির ছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু অধিবাসীরা নির্বিবাদে পাশাপাশি বাস করিত।

হিউএন সাঙ তাঁহার গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের অশোকস্তম্ভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নগরপ্রান্তের এই স্তম্ভটির উচ্চতা ছিল প্রায় একশত ফুট।

তাম্রলিপ্তের উত্থান ও পতন—আগেই বলিয়াছি মৌর্যযুগে তাম্রলিপ্ত ছিল মৌর্যসম্রাট্দের অধীনে। পরবর্তীকালে তাম্রলিপ্ত গুপ্তরাজাদের হাতে চলিয়া যায়। পরে বঙ্গরাজ শশাঙ্ক তাম্রলিপ্ত অধিকার করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে ইহা হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বারংবার রাজপরিবর্তন সত্ত্বে তাম্রলিপ্তর সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ গঙ্গদেব মেদিনীপুর জয় করেন। তখন হইতে শুরু হয় তাম্রলিপ্তর দুর্দিন। এদিকে ধীরে ধীরে সমুদ্রও দূরে সরিতে থাকে। অচিরেই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর পরিণত হইল নিতান্ত নগণ্য একটি শহরে। তাহার প্রাধান্য, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, সম্পদ, সব বিলীন হইয়া গেল অতীতের অন্ধকারে।

বর্গভীমার মন্দির—তমলুকের বর্গভীমা দেবীর সুদৃশ্য মন্দিরটি অতি প্রাচীন। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস এই মন্দিরের নির্মাতা স্বয়ং বিশ্বকর্মা। এত বড় মন্দিরের ছাদটি যেন একখণ্ড পাথর দিয়া তৈরী। কোথাও কোন জোড়া আছে বলিয়া মনে হয় না। ফলে

ইহার সৌন্দর্য শতগুণ বাড়িয়াছে। এই মন্দিরটি যে কবে নির্মিত হয় এবং কে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

প্রাচীন কাল হইতেই তাম্রলিপ্তি হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিকট সমান-ভাবে আদর লাভ করিয়া আসিয়াছে। তমলুকে শ্রীগৌরাঙ্গেরও একটি মন্দির আছে।

তমলুকের নয়ন-মনোহর শোভায় আকৃষ্ট হইয়া কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এখানে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তমলুকের পটভূমিকায় যুগলাঙ্গুরীয় নামক উপন্যাস রচনা করেন।

হিজলী—তমলুকের পতনের পরে যে বন্দর প্রসিদ্ধি লাভ করে তাহার নাম হিজলী। ইহা রসুলপুর নদীর তীরে অবস্থিত। সুমাত্রা, মালাক্কা এবং আরও দূর-দূরান্তের বাণিজ্য-পোত এই বন্দরে আসিয়া লাগিত এবং চিনি, পশম, চাউল, লঙ্কা, কাপড় ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ হইয়া চলিয়া যাইত।

হিজলীর বয়স নিতান্ত কম নহে। ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে হিজলীর নাম পাওয়া যায়।

এক সময়ে হিজলীতে একটি গড় ছিল। উহার অধিপতি ছিলেন রাজা হরিদাস। গৌড়ের সুলতান সেকেন্দর শাহ্ দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া হরিদাসের নিকট সাহায্য চাহিয়া দূত পাঠান। হরিদাস তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলে সেকেন্দর শাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। হরিদাস বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া সুলতানকে পরাস্ত করেন। একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের রাজার পক্ষে ইহা সামান্য কৃতিত্বের কথা নয়।

এক সময়ে হিজলীতে এক নবাব বংশ রাজত্ব করিতেন। নবাবদের মধ্যে খিজির খাঁ ছিলেন সবিশেষ পরাক্রমশালী।

হিজলী এককালে লবণের ব্যবসায়ের জন্যও বিখ্যাত ছিল। মুসলমান যুগের পূর্ব হইতেই এখানে লবণের ব্যবসায় শুরু হয়।

সুদূর কাশ্মীর হইতেও ব্যবসায়ীরা আসিয়া এখান হইতে লবণ কিনিয়া লইয়া কারবার করিত। ১৭৬৫ সালে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা দেশের দেওয়ানী লাভ করে। কোম্পানী অচিরেই লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার নিজেদের হাতে রাখিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম হিজলীতে আসে পর্তুগীজেরা। পরে আসে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজেরা।

সম্প্রতি এখানে একটি উচ্চ কারিগরী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে।

দাঁতন—হিজলী হইতে প্রায় ১৭ মাইল দূরে বাঙলা দেশের শেষ রেল স্টেশন দাঁতন। ইহাও একটি প্রাচীন স্থান। এখানে উৎকৃষ্ট জাঁতি প্রস্তুত হয়।

জনপ্রবাদ, বাঙলা হইতে উড়িষ্যা যাত্রাকালে শ্রীচৈতন্যদেব নাকি এখানে দাঁতন করিয়াছিলেন। তাই এই স্থানের নাম হইয়াছে দাঁতন।

মেদিনীপুর—মেদিনীকোষ নামে একখানি প্রাচীন অভিধান আছে। ইহার প্রণেতার নাম মেদিনী কর। কথিত আছে, এই মেদিনী করই মেদিনীপুর শহরের প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং এই শহরটি যে প্রাচীন সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুবিখ্যাত গ্রন্থ আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুরের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে মেদিনীপুরকে বর্ণনা করা হইয়াছে এক বিশাল নগরী বলিয়া।

মেদিনীপুর কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত। এই শহরে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। উহা আগাগোড়া পাথরের তৈরী। এই দুর্গে বাঙলার নবাব আলিবর্দী খাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া মীর কাসীম পর্যন্ত সকলেই কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। একবার মারাঠারা এই দুর্গটি অধিকার করে। কোম্পানীর আমলে উহা ব্যবহৃত হয় সেনানিবাস হিসাবে। পরে বৃটিশ সরকার উহাকে বন্দীনিবাস রূপে ব্যবহার করেন।

মেদিনীপুর হিন্দু এবং মুসলমানদের নিকট সমানভাবে পবিত্র। কথিত আছে মহাভারতে বর্ণিত বিরাট রাজার গো-গৃহ ছিল এই মেদিনীপুরে। জগন্নাথদেবের মন্দির, হনুমানজীর মন্দির, দুর্গাদেবীর মন্দির, রাম মন্দির, দ্বাদশ শিবালয় ও কালী মন্দির এতগুলি বিখ্যাত দেবদেবীর মন্দির এখানে বর্তমান। মুসলমানদের পীর হজরত মুরসেদ আলি সাহেবের দরগাহ এখানে আছে। প্রতি বৎসর পীর সাহেবের মৃত্যু তিথিতে অনেক মুসলমান যাত্রী এই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার জন্য এখানে সমবেত হন।

মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব কালেক্টর পিয়ার্স সাহেবের সমাধি-মন্দিরটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বাঙলা হরফে স্মৃতিফলক লিখিত আছে। ইংরেজদের সমাধির উপর বাঙলা ভাষার ব্যবহার কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। ইহা হইতে বোঝা যায় পিয়ার্স সাহেব বাঙলা ভাষা এবং বাঙ্গালী জাতিকে সত্যই মনে-প্রাণে ভালবাসিতেন।

এক সময়ে বর্গীদের অত্যাচারে মেদিনীপুরের ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জিলা কোম্পানীর হাতে আসে। তখন কোম্পানী দেশীয় পরাক্রান্ত জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য কতকগুলি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মেদিনীপুরের নানা স্থানে জমিদারদের দুর্গ ছিল। দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে বহু সৈন্য সামন্ত আমদানি করা হয়। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে সর্বত্র দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, এবং উহা প্রবল বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। এই বিদ্রোহ দমন করিতে কোম্পানীকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মেদিনীপুরের স্বাধীনতাকামী তরুণেরা চিরকালই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। শহীদ ক্ষুদিরাম ছিলেন মেদিনীপুরের বীর সন্তান। চারজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট অত্যাচারী শাসক শক্তির প্রতিনিধি মেদিনীপুরের তরুণ বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছে।

এই মেদিনীপুরের মাদুর ও কম্বল আজও উৎকৃষ্ট বলিয়া লোকে এই দুইটি জিনিস আদর করিয়া কেনে।

দীঘা—সমুদ্রতীরবর্তী এই স্থানটির নাম কিছুদিন পূর্বেও বাঙ্গালীর নিকট তেমন পরিচিত ছিল না, অথচ ইংরেজরা ইহার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন প্রায় দু'শ বছর আগে। ইহার অপূর্ব সৌন্দর্য ও চমৎকার স্বাস্থ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা ইহার নাম দিয়াছিলেন 'বাংলার ব্রাইটন'। স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস নিজের বাসের জন্য এখানে একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

দীঘার জলবায়ু সত্যই অত্যন্ত মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। এখানে মৃত্যুহার বছরে হাজারে মাত্র ১২ জন।

এই অঞ্চলের-সমুদ্র উপকূল দৈর্ঘ্যে ১২ মাইল। ইহার ৮ মাইল পশ্চিমবঙ্গে, বাকী চার মাইল উড়িষ্যায়। পুরীর সমুদ্র-উপকূল কিন্তু দৈর্ঘ্যে মাত্র চার মাইল। দীঘার উপকূলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সুদৃঢ়। যাত্রীপূর্ণ বাসও অনায়াসে ইহার উপর দিয়া ঘণ্টায় বারো মাইল গতিতে চলিতে পারে। এই অঞ্চলের বালুকণা এমন সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ যে উহাতে আরসির ন্যায় মুখ দেখা যায়।

এখানে উপকূল ভাগ আস্তে আস্তে ঢালু হইয়া সমুদ্রে নামিয়াছে। সমুদ্রের পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত গেলেও জল শুধু বুক-সমান উঁচু। ফলে শিশুরাও এখানে সাঁতার কাটিতে ভয় পায় না।

গত ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীঘাকে একটি সামুদ্রিক স্বাস্থ্যাবাসরূপে গড়িয়া তোলার কাজে উদ্যোগী হন। সরকারী প্রচেষ্টায় এখানে দুইটি কাফেটেরিয়া স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে যাত্রীদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা বেশ সন্তোষজনক। বে-সরকারী বোর্ডিংও একটি আছে। পূর্ব হইতেই এখানে নাড়াজোল, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থানের জমিদারদের বাড়ী ছিল এখন নূতন নূতন বাড়ী উঠিতেছে।

এই ক' বছরের মধ্যেই দীঘা বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং এখানে যাত্রীর সংখ্যাও ক্রমশ বাড়িতেছে।

খড়্গপুর—ইহা একটি বিখ্যাত রেলওয়ে জংসন। এখানকার রেলওয়ে প্লাটফরম্‌টি দৈর্ঘ্যে ২৩৩০ ফুট। দৈর্ঘ্যের দিক হইতে বিচার করিলে ইহার স্থান পৃথিবীতে তৃতীয় এবং ভারতে দ্বিতীয়।

খড়্‌গপুরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিট্যুট অব টেক্‌নোলজি নামক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটির খ্যাতি ভারতময়। কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত ইউরোপীয় অধ্যাপক এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। ভারত সরকার এই কলেজটির উন্নতি বিধান কল্পে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেছেন।

ঝাড়গ্রাম—ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম এগ্রিকালচার কলেজ এখানেই স্থাপিত হয়। পরে উহা স্থানান্তরিত হয় টালীগঞ্জের রাণীকুঠি নামক সুবিখ্যাত ভবনে।

বীরসিংহ—ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট ইহা একটি পুণ্য তীর্থ হিসাবে গণ্য, কারণ ইহারই মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন দয়ার সাগর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কাঁথি, গড়বেতা, চন্দ্রকোণা, প্রভৃতি মেদিনীপুর জিলার উল্লেখ-যোগ্য স্থান।

বীরভুম

বীরভূম এককালে সত্যই বীরভূমি ছিল। এখানকার জমিদারেরা এক সময়ে প্রবল পরাক্রমে প্রজা-শাসন করিয়া গিয়াছেন। এই সেদিন পর্যন্ত ইঁহারা দস্তুর মত পাইক-পেয়াদা, বরকন্দাজ রাখিতেন এবং নিজেদের সম্মানের এতটুকু হানি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রধারণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। এখন ইঁহাদের কাহারও কাহারও অবস্থা খারাপ হইয়া

আসিলেও প্রাচীন আভিজাত্যের ধারা ইঁহারা এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

কবিতীর্থ—তা'ছাড়া বীরভূম বাঙলাদেশের কবিতীর্থও বটে। বাঙলার গৌরব বিখ্যাত গীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবি জয়দেব এবং পদকর্তা চণ্ডীদাসের জন্মস্থান এবং লীলাক্ষেত্র এই জেলায়। বীরভূমের শান্তিনিকেতনই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্র।

শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর গোড়ার কথা—শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বোলপুর হইতে ক্রোশ-চারেকের মধ্যে রায়পুর নামে একটি গ্রাম আছে। রায়পুরের জমিদার সিংহবাবুদের সঙ্গে মহর্ষির খুব সৌহার্দ্য ছিল। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিংহ) এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার রায়পুর যাইবার পথে দুপুরবেলা মহর্ষির পালকি-বাহকেরা ভুবনডাঙ্গার মাঠে এক ছাতিম গাছের তলায় পালকি নামাইয়া বিশ্রাম করিতে বসে। সেই অবসরে মহর্ষিও পালকি হইতে নামিয়া পড়িলেন। ছাতিম গাছের তলায় দাঁড়াইয়া চারিদিকের দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের দিকে চাহিয়া তাঁহার খুব ভাল লাগিল। অনেকদিন হইতেই নিভৃতে উপাসনা করিবার জন্য তিনি একটি নির্জন স্থান খুঁজিতেছিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল এই সেই স্থান। তারপর সিংহবাবুদের নিকট হইতে সেই ভুবনডাঙ্গার মাঠ বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং একটি মন্দির ও বসবাসের জন্য একটি একতলা বাড়ী তৈয়ারী করিয়া লইলেন। তিনি সেই ছাতিম গাছটিকে ভোলেন নাই। মন্দির নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও ছাতিম গাছতলায় একটি বেদী গাঁথিয়া লইয়া সেখানে বসিয়াই তিনি প্রত্যহ উপাসনা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা মন্দিরটি আজও আছে। তাঁহার বসবাসের বাড়ীটি দ্বিতলে রূপান্তরিত হইয়া বর্তমানে 'গেস্ট্ হাউস' বা অতিথি ভবনে পরিণত

হইয়াছে। ছাতিম গাছটি মর্মরে ক্ষোদিত মহর্ষির বাণী—'তিনি আমার মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি, প্রাণের আরাম'—ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আজও মহর্ষি এবং রবীন্দ্রনাথের নিভৃত উপাসনা ও আত্মোপলব্ধির সাক্ষ্য দিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে পিতার সঙ্গে আসিয়া এই পল্লীভবনটি দেখিয়া মুগ্ধ হন। এখানকার বিশাল মাঠ, মাঠের মধ্যকার সরু পথ এবং উঁচু নীচু মাটির ঢিপি তাঁহার মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। তাই তিনিও সুযোগ পাইলেই এখানে আসিতেন। পরিণত বয়সে যখন প্রাচীন হিন্দু আদর্শে একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল তখন এই স্থানটির কথাই সর্বাগ্রে তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। ফলে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কয়েকটি ছাত্র এবং অল্প কয়েকজন ব্রহ্মচারী শিক্ষক লইয়া তিনি এই স্থানে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়িয়া তুলিতে কবিগুরুকে নিজের যথাসর্বস্ব, এমন কি স্ত্রীর অলঙ্কার পর্যন্ত বিক্রী করিতে হইয়াছিল। ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য রবীন্দ্রনাথের কত মূল্যবান্ সময় যে ব্যয়িত হইয়াছিল তাহার হিসাব করা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে এই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা হইতে শুরু করিয়া কেরানীর কাজ পর্যন্ত করিতে হইত।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে কবি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমটিকে রূপান্তরিত করিলেন একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইহার নূতন নাম দিলেন বিশ্বভারতী। বলা বাহুল্য, এই সময় হইতে ইহার কর্মক্ষেত্র বহুগুণ সম্প্রসারিত হইল। শিশু শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম গবেষণার নিখুঁত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল কবি-প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বভারতীতে।

সেদিন যে অঙ্কুরটির একটি ক্ষুদ্রতম পত্রোদগমের আশায় মহাপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছিলেন কবির জীবদ্দশাতেই

উহা বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। বিশ্বভারতী আজ শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বিশ্বের সমস্ত দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির ইহা একটি মহামিলন ক্ষেত্র। এখানকার চীনা ভবনে প্রাচীন সুসভ্য চীন দেশের সংস্কৃতিশিক্ষার সুযোগ আছে। মুসলিম সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য নিজাম বাহাদুরের অর্থে সুযোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। বিড়লা-প্রদত্ত অর্থে হিন্দী ভবনে হিন্দী ভাষা, সাহিত্য ও চিন্তাধারার সহিত বাঙ্গালীর যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কলা-ভবনের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন জগৎপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু। সঙ্গীত ভবনে সঙ্গীত-শিক্ষার নিখুঁত ব্যবস্থা সকলকে চমৎকৃত করে।

স্বাধীতা অর্জনের কয়েক বৎসর পরেই এই বিশ্বভারতী পরিণত হইল সরকারের পরিচালিত অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

শিক্ষাকে আনন্দের রসে মিশাইয়া পরিবেশনের ব্যবস্থা এ দেশে প্রথম করেন রবীন্দ্রনাথ। ছাত্রছাত্রীদের জন্য সেখানে প্রতিদিনই নিত্য নূতন আনন্দের ব্যবস্থা আছে। গতানুগতিকের স্থান বিশ্বভারতীর কোথাও নাই। ছেলেরা কখনও গাছতলায় বসিয়া পড়ে, কখনও ঘরে বসিয়া পড়ে। তাহারা বর্ষাকালে বর্ষামঙ্গল উৎসব পালন করে, বসন্তকালে পালন করে বসন্তোৎসব।

শান্তিনিকেতনে কবি উত্তরায়ণ নামে যে গৃহটিতে বাস করিতেন তাহা দেখিবার মত। শ্যামলী, দেহলী ও পুনশ্চ,—রবীন্দ্রনাথের এই বাসভবনগুলিও দেখিতে অত্যন্ত চমৎকার।

বোলপুরের শুষ্ক ভূমিতে জলের খুবই অভাব। কিন্তু এখানকার সে অভাব রবীন্দ্রনাথ অনেকটা দূর করিয়া গিয়াছেন প্রচুর অর্থব্যয়ে বড় বড় টিউবওয়েল বসাইয়া।

শান্তিনিকেতন হইতে অল্প একটু দূরে সুরুল নামক গ্রামে রবীন্দ্রনাথের আর একটি কীর্তি শ্রীনিকেতন। শ্রীনিকেতন প্রধানত কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয়। এখানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ

বাস করিতে এবং নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। চামড়ার উপর কারুকার্য করা ও রং করার রীতি প্রথম প্রবর্তিত হয় শ্রীনিকেতনে। ইহা ছাড়া বস্ত্র, চীনামাটির বাসন, কাঠের এবং বেতের দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও গালার সাহায্যে রং করার শিক্ষাও এখানে দেওয়া হয়। শ্রীনিকেতনের ছেলেমেয়েদের হাতে প্রস্তুত এই সুন্দর সুন্দর দ্রব্যগুলি যাঁহারাই দেখেন তাঁহারাই মুগ্ধ হন। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে এখানে প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে হলকর্ষণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবৎসর এখানে উপস্থিত থাকিয়া এই উৎসব সম্পন্ন করিতেন।

সুপুর—সুপুর গ্রামে একটি অতি প্রাচীন শিব মন্দির আছে। কথিত আছে স্বয়ং সুরথ রাজা এই শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন।

জয়দেবের জন্মভূমি—ইসলামবাজারের নিকটে কেঁদুলী বা কেন্দুবিল্ব নামক গ্রামে কবি জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। জয়দেবের অমরকাব্য গীতগোবিন্দ চিরদিন বিশ্বসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। এই গ্রামে আজও কবির ভিটা এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব মূর্তি বিদ্যমান। এমন কি তাঁহার সাধনার আসনটি পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। প্রতিবৎসর মকরসংক্রান্তিতে কেঁদুলীতে জয়দেব-মহোৎসব নামে একটি মেলা বসে। মেলা উপলক্ষে বহু যাত্রী এই উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হয়।

ঢেকুর—ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত ইছাই ঘোষের বাসস্থান 'ঢেকুর' কেন্দুবিল্বের অনতিদূরে। ইছাই ঘোষের প্রতিষ্ঠিত শ্যামারূপার মন্দির এই গ্রামে এখনও বিদ্যমান।

দুবরাজপুর—বীরভূম জেলার একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র দুবরাজপুর। পিতল ও কাঁসার বাসন, লোহার তৈজস-পত্র প্রভৃতির জন্য দুবরাজপুরের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। দুবরাজপুরে অনেকগুলি প্রাচীন শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার বিরাট বিরাট বেলে পাথর দিয়া দালান, মন্দির প্রভৃতি নির্মিত হয়। দৈর্ঘ্যে

এবং প্রস্থে পঞ্চাশ ফুটেরও বেশী এমন বহু পাথরও এখানে পাওয়া যায়।

বক্রেশ্বর—দুবরাজপুর হইতে মাইল পাঁচেক দূরে প্রসিদ্ধ তীর্থ বক্রেশ্বর বা বক্রনাথ। ইহা একটি পীঠস্থান। এখানকার দেবী মহিষমর্দিনী এবং ভৈরব বক্রনাথ। এককালে বক্রনাথের শ্মশানে তান্ত্রিকেরা শব-সাধনা করিতে আসিতেন। এখানে সাতটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, যথা—অগ্নিকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, সৌভাগ্যকুণ্ড, জীবন কুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, খরকুণ্ড। এই কুণ্ডগুলি সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রত্যেকটির সঙ্গেই কোন না কোন দেবতা জড়িত আছেন। এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলি ছাড়া শ্বেতকুণ্ড নামে আরও একটি প্রস্রবণ এখানে আছে। বহু লোকের বিশ্বাস, এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলির রোগ-প্রতিষেধক শক্তি আছে।

সাঁইথিয়া—ইহা ময়ুরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র এবং জংসন স্টেসন। কথিত আছে, এখানে নন্দীপুর নামক পীঠস্থানে দেবীর অঙ্গের হাড় পড়িয়াছিল। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'নন্দিনী' এবং ভৈরব 'নন্দিকেশ্বর'। স্টেসনের অনতিদূরে রেললাইনের পার্শ্বে এক বটবৃক্ষতলে পাষাণী দেবীর মূর্তি আছে।

রামপুরহাট—রামপুরহাটের মাইল তিনেক দূরে দ্বারকা নদীর পূর্বতীরে সাধনার অনুকূল এক নিভৃত নিরালা পরিবেশের মধ্যে তারা দেবীর মন্দির এবং যোগাশ্রম তারাপীঠ। অনেকের বিশ্বাস যে এখানে সতীর চক্ষুর তারা পড়িয়াছিল। বশিষ্ঠ মুনি নাকি এই তারাপীঠে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপা নামে একজন তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষের আশ্রম ছিল। তারাপীঠের নূতন মন্দিরটি রাণী ভবানী তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে তারাপীঠে একটি মহামেলার অনুষ্ঠান হয়।

রামপুরহাট—রামপুরহাট জেলার মহকুমা শহর। এখানকার হাট খুব বিখ্যাত। রামপুরহাট হইতে তিন মাইল পশ্চিমে লাল-পাহাড়ী নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। রামপুরহাটের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

নলহাটি—নলহাটি বীরভূম জেলার একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে বহুলোক নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে আসে। এখানকার পাহাড়িয়া ঝরণার জল পরিপাকের সহায়ক। নলহাটির প্রাকৃতিক শোভাও মনোরম।

নলহাটি একটি পীঠস্থান বলিয়াও বিখ্যাত। এখানে দেবীর ললাট পড়িয়াছিল বলিয়া এখানকার দেবীর নাম ললাটেশ্বরী। মন্দিরটি নয়ন-মনোহর।

বোলপুর—ইহা একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। ইহার খ্যাতির মূলে বিশ্ববিশ্রুত শান্তিনিকেতন।

সিউড়ি—বীরভূম জিলার সদর সিউড়ি। ইহা ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত। স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে ইহার সুনাম আছে। উৎকৃষ্ট মোরব্বা ও নানারকমের কাঠের কাজের জন্য সিউড়ির খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত।

শিল্প—বীরভূমের রেশম শিল্প এক সময়ে খুবই বিখ্যাত ছিল। এখানকার তসর, বিশেষত কেটে তসরের যথেষ্ট আদর আছে।

হাওড়া

হাওড়া অঞ্চল বহুদিন ধরিয়া নদীয়া অথবা চব্বিশ পরগণা কিংবা হুগলী জেলার এলাকাধীন ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। হাওড়াকে পৃথক্ জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয় মাত্র ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। হাওড়া জেলার অধিকাংশই হাওড় বা জলাভূমি ছিল বলিয়া এই জেলার এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

হাওড়া শহর—হাওড়া শহর যদিও হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত তবুও ইহাকে লোকে কলিকাতার অংশ বলিয়াই মনে করে। হাওড়ার সুবিশাল সেতুই ইহা সম্ভব করিয়াছে।

হাওড়া শহর জিলার সদর বলিয়া এখানে কোর্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, হাঁসপাতাল, বৈদ্যুতিক আলো, ট্রাম, বাস প্রভৃতি আধুনিক সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাই আছে।

হাওড়ার হাট কাপড়, গামছা প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সুবিখ্যাত।

পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলির মধ্যে কলিকাতার পরেই হাওড়ার স্থান। আয়তন এবং লোক-সংখ্যার দিক্ হইতে পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলের কোন শহরই ইহার সমকক্ষ নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শহরটির মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। অধিকাংশ রাস্তাই যারপরনাই অপরিচ্ছন্ন। কাঁচা ড্রেনের দুর্গন্ধও অসহনীয়। সম্প্রতি ইহার উন্নতিবিধানের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাস্ট নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

হাওড়ায় প্রচুর কল-কারখানা। এই শহরের বেলিলিয়াস নামক অঞ্চলে কল-কারখানার সংখ্যা এত বেশী যে ইহা Birmingham of India নামে পরিচিত। গ্রেট ব্রিটেনের বার্মিংহাম শহরটি কলকারখানার জন্য বিশ্ববিখ্যাত। হাওড়ার এই অঞ্চলটিও কারখানা-বহুল বলিয়াই ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

হাওড়ার ব্রিজ এবং হাওড়া স্টেশন, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এদুটির তুলনা নাই। হাওড়ার বর্তমান সুদৃশ্য ব্রিজটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ক্যান্টিলিভার ব্রিজ। দীর্ঘ আট বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বিরাট সেতুটির নির্মাণকার্য শেষ হয়। ইহাতে খরচ পড়িয়াছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা।

ব্রিজের মধ্যস্থিত রাস্তাটি প্রস্থে ৭১ ফুট। আট সারি গাড়ী স্বচ্ছন্দে এই রাস্তা দিয়া চলাচল করিতে পারে। ইহার উপর দিয়া ট্রামও চলাচল করে। ইহার উভয়দিকে ১৫ ফুট প্রশস্ত ফুটপাথ। ব্রিজটির রং আগাগোড়া সাদা। ইহার চূড়ার ন্যায় উপর দিকের অংশ বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

পূর্বের ব্রিজটি ছিল ভাসমান। উহা তেমন উঁচু ছিল না। তাই জাহাজ প্রভৃতি চলাচলের জন্য প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য যন্ত্রের সাহায্যে উহার মধ্য অংশ সরাইয়া রাখিতে হইত।

হাওড়ার রেল স্টেশনটি দেখিবার মত। এখান হইতে সারাদিন ট্রেন যেমন যাত্রী বোঝাই হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাইতেছে তেমনি বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রী-পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। ফলে স্টেশনটি সর্বদাই জনাকীর্ণ থাকে। এই স্টেশনটি ভারতীয় রেলপথের 'সিংহদ্বার' নামে অভিহিত।

এখানে হাওড়া রেল-লাইন স্থাপনের ইতিহাস কিছুটা বলা দরকার। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী নামে এক ব্যবসায়ী সমিতি হাওড়া হইতে হুগলী পর্যন্ত তেইশ মাইল পথে রেল লাইন বসায়। ইহাই পূর্বে ভারতীয় রেলপথের প্রথম সূচনা। তারপর এক বৎসরের মধ্যে এই লাইন রাণীগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকার এই রেলপথটি খাস করিয়া লন। কিন্তু শীঘ্রই ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করেন নূতন কোম্পানীর উপর। গত ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে সরকার আবার ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই রেলপথটি পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

শিবপুর—শিবপুরে অবস্থিত বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনের খ্যাতি ভারতময়।

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি বোটানিক্যাল গার্ডেনের পূর্বদিকে গঙ্গাতীরে ১২১ একর পরিমাণ

বিস্তীর্ণ এলাকার উপর অবস্থিত। এই কলেজের ডিগ্রি কোর্সে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখানো হয় :—সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালারজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও আর্কিটেক্চার। পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সে শিখানো হয়,—টাউন অ্যাণ্ড রিজিওন্যাল প্লানিং, ন্যাভাল আর্কিটেক্চার ও মাস্টার অব ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেটালারজি ডিগ্রি কোর্স)।

উপরে লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া সম্প্রতি অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স্, হিউম্যানিটিজ, ড্রয়িং প্রভৃতি বিভাগও খোলা হইয়াছে।

এই কলেজটির উন্নতি বিধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেছেন।

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন—এই ভারত বিখ্যাত গার্ডেনটির প্রতিষ্ঠার পিছনে যে ইতিহাস আছে অনেকেই তাহা জানেন না। অথচ ইহা জানার মত। তাই প্রথম এ সম্বন্ধে বলিতেছি।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (বাংলা ১১৭৬ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে) বাঙলার যে সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। সমগ্র দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এই দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইয়াছিল। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে কর্ণেল কীড্ নামে একজন সামরিক কর্মচারী সরকারের নিকট বলিলেন, যদি মালয় হইতে সাগু গাছ এবং পারস্য হইতে খেজুর গাছ আনিয়া দেশের নানাস্থানে লাগানো যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের ফলে চাউলের অনটন হইলেও খাদ্যের অভাবে লোকের মৃত্যু হইবে না। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন কলিকাতার নিকটে কোন একটি বাগিচায় উহা চাষ করার সুযোগ দেওয়া হউক। তিনি আরও বলিলেন এই বাগিচায় তেজপাতা, গোলমরিচ, লবঙ্গ প্রভৃতি মসলা এবং চন্দন, কর্পূর, নীল, চা প্রভৃতিও চাষ করা যাইতে পারে। তখন এদেশে ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন। ভারতে এইসব

জিনিসের চাষ সম্ভব হইলে কোম্পানীর বাণিজ্যে যথেষ্ট সুবিধা হইবে মনে করিয়া কোম্পানী কীডের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ফলে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া হইতে পাঁচ মাইল দূরে এক হাজার বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়া উদ্যান রচনার কাজ আরম্ভ করা হইল। কীড্ হইলেন এই উদ্যানের সর্বপ্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। উদ্যান-রচনায় কীডকে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিলেন সুবিখ্যাত উদ্ভিদ্তত্ত্ববিদ্ স্যার যোসেফ ব্যাঙ্ক। কর্ণেল কীডের মৃত্যুর পর উদ্ভিদ্-বিশেষজ্ঞ ডাঃ উইলিয়ম রকস্‌বার্গ উদ্যানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

উদ্ভিদ্-বিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি একটি ল্যাবরেটরী স্থাপন করেন। এই ধরনের ল্যাবরেটরীকে বলে হারবেরিয়াম। ডাঃ রক্সবার্গ একদিকে যেমন দেশবিদেশ হইতে শত রকমের গাছ আনাইয়া এই উদ্যানে লাগাইলেন অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় বহু গাছের নমুনাও তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠাইলেন। রক্সবার্গের পরবর্তী সুপারিণ্টেডেণ্টগণও উৎসাহ ও যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করিয়া উদ্যানটির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বাগিচার উপর দিয়া এক ভীষণ ঝড় বহিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় বান ডাকায় বাগিচার উপর ছয় সাত ফুট জল দাঁড়াইল। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাগিচার প্রায় অর্ধেক গাছই বিনষ্ট হইল। তিন বছর পরে আবার ঝড় উঠিয়া প্রায় সাড়ে সাতশ গাছ উপড়াইয়া ফেলিল। উদ্যানের এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ইহাকে রক্ষা করেন ডাঃ জর্জ কিং। ইনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে উদ্যানের সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হন। ডাঃ কিং-এর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হইল বাগানটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা এবং এক একটি ভাগে এক এক দেশের গাছ লাগাইবার ব্যবস্থা করা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের গাছ লাগানো হইল বাগানের মধ্যস্থলে এবং পশ্চিম দিকে লাগানো হইল আমেরিকা, আফ্রিকা, মালয়, ফিলিপাইন, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান

প্রভৃতি দেশের গাছ-গাছড়া। এই গাছগুলি বড় হইয়া উঠিলে বাগানটি যেন এক অপরূপ সাজে সজ্জিত হইল। বাস্তবিকপক্ষে বোটানিক্যাল গার্ডেনের অপূর্ব সৌন্দর্য মনকে যেন এক বিচিত্র রাজ্যে লইয়া যায়।

এই বাগানে এমন অনেক গাছ আছে যাহা রৌদ্রে বা উন্মুক্ত স্থানে লাগাইলে বাঁচে না। বাগানের এই ধরণের গাছগুলি সযত্নে রাখা হইয়াছে পাম হাউসে বা কাঁচের ঘরে। যে সব উদ্ভিদ্ শুধু পাহাড়েই বাঁচে তাহা লাগানো হইয়াছে কৃত্রিম পাহাড় তৈরী করিয়া। জলজ উদ্ভিদ্ লাগানো হইয়াছে ঝিলে। ভিক্টোরিয়া রিজিয়া নামে এক জাতীয় জলজ উদ্ভিদের পাতা অতীব বিস্ময়কর। ইহার পরিধি প্রায় ৬ ফুট এবং ইহার ধার থালার মত উঁচু। এই জলজ উদ্ভিদ্ আনা হইয়াছে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা হইতে।

বর্তমানে বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রায় ষোল হাজার গাছ এবং সহস্র সহস্র লতা গুল্মাদি আছে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু একটি বিশালকায় বটবৃক্ষ। ইহার বয়স দুই শত বছরের কাছাকাছি। প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে ইহার মূল গুঁড়িটি পচিয়া যায়। ফলে গুঁড়িটি কাটিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য, গাছটির তাহাতে অণুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। ইহা পূর্বেরই ন্যায় সতেজে দাঁড়াইয়া আছে। ইহার ঝুরির সংখ্যা প্রায় নয় শত। প্রত্যেকটি ঝুরিই দেখিতে গুঁড়ির ন্যায়। এই গাছটির সর্বোচ্চ শাখা ৯৮ ফুট উঁচু। শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত এই গাছটির উপরদিকের পরিধি ১৩২৮ ফুট।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের ফুলের বাগিচাগুলির অপূর্ব সৌন্দর্য মানুষের মনকে আনন্দে উৎফুল্ল করে। শীতকালে নানা রঙের অসংখ্য মরশুমী ফুল ফুটিয়া বাগানটিকে যেন নন্দন কাননে পরিণত করে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে বহু প্রশস্ত পিচের রাস্তা আছে। রাস্তাগুলির মোট দৈর্ঘ্য ১০ মাইল। দর্শকেরা হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক সময়ে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাই তাহাদের বসিবার জন্য মাঝে মাঝে সিমেন্টের বেঞ্চ আছে। এই বাগানে প্রবেশের জন্য কোন ফি দিতে হয় না। প্রত্যহ সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইহা খোলা থাকে।

বেলুড়—হাওড়া হইতে বেলুড় মাত্র চার মাইল পথ। পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ-কল্পিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র সুবিখ্যাত 'বেলুড় মঠ' এই বেলুড়ে অবস্থিত। স্বামী বিবেকানন্দ মন্দিরের যে রূপ ধ্যাননেত্রে দেখিয়াছিলেন আজ তাহা জগতের সম্মুখে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই নয়ন-মনোহর মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে দুই জন ধর্মপরায়ণা মার্কিন মহিলার উদার অর্থসাহায্যে। তাঁহাদের দানের পরিমাণ সাড়ে ছয়লক্ষ টাকা। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই চোখে পড়ে ধ্যানমগ্ন পরমহংসদেবের শ্বেতমর্মর মূর্তি। মূর্তিটি একটি মর্মর-খচিত শ্বেত পদ্মের উপর স্থাপিত। গঙ্গার উপর হইতে মঠের দৃশ্য অতি মনোরম।

ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠান হইলেও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল আর্তের সেবা। যেখানেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের করুণ আর্তনাদ, যেখানেই বন্যাবিধ্বস্ত নরনারীর গগনভেদী হাহাকার, যেখানেই মহামারী দেশকে উজাড় করিয়া দেয় সেখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতীরা প্রাণ-পণ করিয়া সেবা-কার্যে ব্রতী হন। রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটি মহৎ কাজ, আদর্শ বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়া ছাত্রগণকে প্রকৃত বিদ্বান্ চরিত্রবান্ করিয়া গড়িয়া তোলা। এই কাজেও মিশনের অসামান্য সাফল্য দেশবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বেলুড় মঠে পরমহংসদেবের জন্মতিথি পালিত হয় বিপুল সমারোহের সঙ্গে। লক্ষ লক্ষ লোক এই উৎসবে সমবেত হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের ৮৪টি শাখা-কেন্দ্র আছে। ভারতের বাহিরেও ৩১টি শাখাকেন্দ্র আছে ইহার মধ্যে ১১টিই আমেরিকার কয়েকটি বড় বড় শহরে।

বালী—বেলুড় হইতে মাত্র দুই মাইল উত্তরে বালী। ইহাও গঙ্গার তীরে। এই গ্রামটি বেশ প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু। এখানে গঙ্গার উপর একটি সেতু নির্মিত হইয়াছে। ইহা বালী ব্রিজ বা উইলিংডন ব্রিজ নামে পরিচিত। এই ব্রিজের উপর দিয়া রেলগাড়ী চলে। ইহার উভয় দিকেই অন্যান্য যানবাহন চলার জন্য এবং পথচারীদের হাঁটার জন্য পৃথক্ রাস্তা আছে।

বালীতে এক কালে বাদামী রঙের কাগজ তৈয়ারা হইত। এই স্থানের নাম-অনুসারে উহা বালীর কাগজ নামে পরিচিত ছিল। বালীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এক সময়ে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁহাদের স্থাপিত চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষায় নানা শাস্ত্র শিখানো হইত। বালীর পণ্ডিতেরা এক সময়ে পঞ্জিকাও বাহির করিতেন। এই পঞ্জিকার খুব আদর ছিল। গঙ্গার পূর্ব তীরে দক্ষিণেশ্বরের সুবিখ্যাত কালীবাড়ী বালী ব্রিজের পাশেই।

বালীর কল্যাণেশ্বর শিবলিঙ্গটির অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। শিবরাত্রির সময়ে এখানে প্রচুর লোক-সমাগম হয়।

ঘুসুড়ী—ঘুসুড়ী বালীর দক্ষিণে। এখানে ভোট বাগান নামে তিব্বতীদের একটি মন্দির আছে। তিব্বতের তাশীলামার অনুরোধে ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস গঙ্গাতীরে এই বৌদ্ধ মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

হুগলী

শ্রীরামপুর—শ্রীরামপুর হুগলী জিলার অন্যতম মহকুমা শহর। ইংরেজদের অধিকারে আসার পূর্বে শ্রীরামপুর ছিল দিনেমারদের অধীনে। তখন উহার নাম ছিল ফ্রেডারিক নগর। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা দিনেমারদের যুদ্ধে পরাস্ত করে। ফলে শ্রীরামপুর ইংরেজদের অধিকারে আসে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির সর্ত অনুযায়ী শ্রীরামপুর পুনরায় দিনেমারদের অধিকারে ফিরিয়া যায়। প্রায় একশত বৎসর চেষ্টা করিয়াও যখন দিনেমারগণ বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিল না তখন তাহারা হাল ছাড়িয়া দিয়া শ্রীরামপুর ইংরেজদের নিকট বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়। শ্রীরামপুরের 'সেন্ট্ ওলাফ' নামক গীর্জাটি ছিল দিনেমারদের। শ্রীরামপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের নিকটে দিনেমারদের গোরস্থান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের নিকট বাঙ্গালী জাতির ঋণ অপরিশোধ্য। ইহারাই সর্বপ্রথম শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং বাঙলা ও ইংরেজী ভাষায় বহু পুস্তক ছাপিয়া বাহির করেন। এই মিশনারীদের মধ্যে কেরী, মার্সম্যান, হলহেড এবং ওয়ার্ডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙলা ভাষায় কেরী সাহেবের জ্ঞান ছিল বিস্ময়কর। তিনিই সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন, বাইবেল প্রকাশ করেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্পাদন ও মুদ্রণ করেন এবং সমাচার দর্পণ দিগ্দর্শন প্রভৃতি বাঙলা মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইহার ফলে বাঙলা সাহিত্যে প্রবর্তিত হয় এক নূতন যুগ।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের আর এক কীর্তি শ্রীরামপুর কলেজ। গঙ্গাতীরে অবস্থিত এই মনোহর কলেজটি স্থাপিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। এক সময়ে এই কলেজটির খ্যাতি ছিল সমগ্র

ভারতময়। ভারতের মধ্যে একমাত্র এই কলেজ হইতেই খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের (Theologyর) উপাধি দেওয়া হয়। এই কলেজের পাঠাগারে কেরী সাহেবের ব্যবহৃত চেয়ার প্রভৃতি আসবাবপত্র সযত্নে রক্ষিত আছে।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের তত্ত্বাবধানেই প্রথম বাঙলা পত্রিকা ছাপা হয়।

শ্রীরামপুর বেশ শ্রীসম্পন্ন। এখানকার গোস্বামীরা ছিলেন একসময়ে বাঙলার বিখ্যাত জমিদারগণের অন্যতম। শ্রীরামপুরে কয়েকটি পাটের এবং কাপড়ের কল আছে। এখানকার বয়ন শিল্প শিক্ষালয়টিও বেশ উন্নত। শ্রীরামপুরের চাতরা পল্লীতে শীতলা দেবীর যে মন্দির আছে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী জাগ্রতা বলিয়া প্রবাদ আছে। মন্দিরটি প্রাচীন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অনেক যাত্রী এখানে উপস্থিত হয়। শিবচতুর্দশীর পরদিন হইতে শ্রীরামপুরে এক মাস যাবৎ একটি মেলা বসে। এই মেলার নাম ক্ষেত্র সাহার মেলা। শ্রীরামপুরের অন্তঃপাতী মাহেশে এবং বল্লভপুরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব এবং শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর দুইটি পুরাতন মন্দির আছে। মাহেশে রথযাত্রায় খুব ধূমধাম হয়। একমাত্র পুরী ছাড়া রথযাত্রায় এত সমারোহ আর কোথাও দেখা যায় না। রথের সময়ে মাহেশে যে বিরাট মেলা বসে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণীতে তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে।

সিঙ্গুর—এখন যে স্থান সিঙ্গুর নামে পরিচিত এককালে তাহারই নাম ছিল সিংহপুর। শেওড়াফুলি এবং কামারকুণ্ডু জংশনের মধ্যে এই স্টেসনটি। প্রবাদ আছে সিংহপুর বা সিঙ্গুর ছিল বাঙলার রাজা সিংহবাহুর রাজধানী। তাঁহারই ত্যাজ্যপুত্র দুর্জয় বীর বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করিয়া উহার একচ্ছত্র অধিপতি হন এবং উহার নাম রাখেন সিংহল।

সিঙ্গুর বর্ত্তমানেও বেশ বর্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী।

তারকেশ্বর—হাওড়া হইতে তারকেশ্বর প্রায় ছত্রিশ মাইল পথ। বাঙলা দেশে চন্দ্রনাথ ছাড়া এত বড় শৈবতীর্থ আর নাই। তারকেশ্বরের প্রসিদ্ধি সারা ভারতে। এখানে প্রত্যহই দর্শকের ভিড়। সর্বাপেক্ষা বেশী ভিড় হয় শিবচতুর্দশীতে এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে। সে সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভক্তেরা আসিয়া এই স্থানে পূজা দেয়। সে এক অপূর্ব গেরুয়া-পরিহিত দৃশ্য। অসংখ্য নরনারীতে তারকনাথের আঙ্গিনা ছাইয়া যায়।

কথিত আছে, এখন যেখানে তারকেশ্বরের মন্দির সেস্থান পূর্বে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। জঙ্গলের এক স্থানে একটি টিপি ছিল। লোকে উহাকে বলিত সিংহল দ্বীপ। সেখানে ছিল একটি বড় নুড়ি। একদিন মুকুন্দ ঘোষ নামে এক গোপ সবিস্ময়ে দেখিল তাহার দুগ্ধবতী গাভীটি ঐ শিলাখণ্ডের উপর দুগ্ধ ঢালিতেছে। সেই রাত্রেই মুকুন্দকে তারকনাথ স্বপ্নে দেখা দিয়া আদেশ দিলেন, "বৎস! তুমিই আমার সেবাইত হইবে।" মুকুন্দ ঘোষ তারকনাথের আদেশ শিরোধার্য করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং শিবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

বরাহমল্ল নামে এক রাজা তারকনাথের মন্দির গড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া তারকনাথের সেবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বর্ধমানের মহারাজও স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তারকনাথের একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। এমনিভাবে কত লোক যে তারকনাথের চরণে ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে তাহার হিসাব নাই। বর্তমানে তারকনাথের জমিদারী অতি বিশাল।

তারকনাথের মন্দিরে পূজা দিবার পূর্বে ভক্তেরা পার্শ্ববর্তী দুধপুকুরে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া তবে মন্দিরে প্রবেশ করে। তারকেশ্বরে একটি দশভুজার মন্দিরও আছে। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। এই নাটমন্দিরে কতশত নরনারী যে রোগমুক্তির

প্রার্থনা লইয়া 'হত্যা' দেয় তাহার ইয়ত্তা নাই। নাটমন্দিরে দিনরাত ধরণা চলিতেছে।

তারকেশ্বর একটি জংসন স্টেসন। আজকাল কলিকাতা হইতে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন যোগে তারকেশ্বর যাওয়া যায়। এখানে ধর্মশালা প্রভৃতি থাকায় যাত্রীদের কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

চন্দননগর—বাঙলা দেশে ফরাসীদের অধিকৃত একমাত্র স্থান ছিল চন্দননগর। গত ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্প্রতি চন্দননগর এবং হুগলী জিলার তারকেশ্বর, হরিপাল ও সিঙ্গুর থানা লইয়া চন্দননগর নামে একটি নূতন মহকুমা গঠিত হইয়াছে।

চন্দননগরে কিরূপে ফরাসীদের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন।

১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আওরঙজেবের রাজত্বকালে ফরাসীরা চন্দননগরে ব্যবসা করার সনন্দ পান। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শোভা সিংহের অত্যাচারের ভয়ে তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য চন্দননগরে ফোর্ট-দ্য-অরলা নামক দুর্গটি নির্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার অনুমতি লাভ করেন। ১৭৩১-৪১ খ্রীষ্টাব্দ ফরাসী চন্দননগরের গৌরবময় যুগ। এই সময়ে ফরাসী গভর্ণর ছিলেন ডুপ্লে। তিনি চন্দননগরকে একটি সুদৃশ্য শহররূপে গড়িয়া তোলেন। তাঁহার চেষ্টায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক্ দিয়াও ফরাসীরা বেশ উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল।

ডুপ্লের দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। শুধু বাণিজ্য লইয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া তিনি ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ডুপ্লের সমর-পরিচালনা গুণে যুদ্ধের প্রথম দিকে ফরাসীদেরই জয় হইতেছিল। কিন্তু ইহা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। সুকৌশলী তরুণ ইংরেজ যোদ্ধা ক্লাইভ ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে যুদ্ধের গতি ফিরিয়া গেল। ফরাসীরা নিদারুণভাবে পরাস্ত হইল।

তাহাদের ভারতে রাজ্যস্থাপনের পরিকল্পনা চিরতরে বিনষ্ট হইল। সন্ধির সর্ত-অনুসারে তাহারা তাহাদের উপনিবেশগুলি ফিরিয়া পাইল সত্য, কিন্তু তাহাদের সবগুলি দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল এবং তাহাদের সর্বপ্রকার সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বিনষ্ট করা হইল। ডুপ্লেকে চরম অবমাননা সহ্য করিয়া ভগ্নহৃদয়ে ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইতে হইল।

এখন চন্দননগর শহরটি সম্বন্ধে কিছু বলিব। চন্দননগর গঙ্গাতীরে অবস্থিত। গঙ্গার ধার দিয়াই একটি প্রশস্ত রাস্তা। রাস্তাটির দৃশ্য মনোরম।. উল্লেখযোগ্য সরকারী কার্যালয়গুলি এই রাস্তাটির উপর।

একসময়ে চন্দননগরে ছিল কয়েকজন বিখ্যাত কবিওয়ালার বাস। ইহাদের মধ্যে নৃসিংহ, রাসু, নিতাই বৈরাগী, এণ্টুনি ফিরিঙ্গী প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েকজন পাঁচালীগায়ক এবং অনেক যাত্রাওয়ালাও চন্দননগরের অধিবাসী ছিলেন।

চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের আশ্রম বাঙলা দেশে সুপরিচিত। এখানে প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ার সময়ে মেলা বসে। এখানকার ফরাসডাঙ্গার সূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড়ের খ্যাতি ভারতের সর্বত্র। এককালে এখান হইতে বিলাতে এই সব কাপড় চালান যাইত। এখানকার তাঁতীদেরও যথেষ্ট সুনাম আছে।

চুঁচুড়া—চন্দননগরে যেমন ফরাসীদের আধিপত্য ছিল, চুঁচুড়াতে ছিল তেমনি ওলন্দাজদের আধিপত্য। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল রাজশক্তির কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া পর্তুগীজরা যখন নিদারুণভাবে নির্যাতিত হইল, তখন ওলন্দাজ বণিকেরা ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইল। সে সুযোগ তাহারা ষোল আনা গ্রহণও করিল। ওলন্দাজরা প্রথম অবস্থায় বণিক্ হিসাবেই এ দেশে আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইংরেজদের রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা দেখিয়া তাহারাও এ দেশে রাজ্যস্থাপনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা

ব্যাটাভিয়া হইতে একদল সৈন্য আনাইয়া চুঁচুড়াকে ব্যাটেভিয়ান শাসনতন্ত্রের অধীন করা হইল বলিয়া সদম্ভে ঘোষণা করিল।

ইংরেজরা ওলান্দজদের এ দম্ভ সহ্য করিবে কেন? অবিলম্বে এই দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল। যুদ্ধে ওলন্দাজরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। ব্যাটেভিয়া হইতে আনীত রণতরীগুলি বিধ্বস্ত হইল। সন্ধির সর্ত অনুসারে ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় শুধু বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করিল। ইংরেজরা তাহাদের গাস্টাভাস্ নামক দুর্গটি ভাঙ্গিয়া সেখানে একটি ব্যারাক প্রস্তুত করিল। এখন সেই ব্যারাকেই হুগলী জেলার সরকারী কাছারি এবং কালেক্টরীর দপ্তরখানা। এতবড় একটানা লম্বা অট্টালিকা সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না।

পরাজয়ের পরেও ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় থাকিয়া অনেকদিন ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়াছিল। ব্যবসায়ে তাহারা যথেষ্ট উন্নতিও করিয়াছিল।

দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীনের অমর কীর্তি চুঁচুড়ায় অবস্থিত হুগলী মহসীন কলেজ, কলেজিয়েট স্কুল এবং ইমামবাড়া মাদ্রাসা।

স্যার সৈয়দ আমীর আলির বাসভবন ছিল চুঁচুড়ায়। এই আমীর আলি ছিলেন প্রিভি কাউন্সিলের সর্বপ্রথম ভারতীয় সদস্য। ইঁহারা দুইজন ছাড়া অক্ষয়কুমার সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাম-রাম বসু ইঁহারাও চুঁচুড়ার বাসিন্দা ছিলেন।

চুঁচুড়ার যজ্ঞেশ্বর জীউ শিবের খ্যাতি আছে।

হুগলী—বাঙলা দেশের প্রথম দেশী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় হুগলীতে। পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁহার জামাতা মনোহর দাসের সহযোগিতায় উইলকিন্স নামে জনৈক ইংরেজ এই ছাপাখানাটি স্থাপন করেন। এই ছাপাখানায় ছাপা হইয়া বাঙলা ভাষার বহু মূল্যবান গ্রন্থ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

ইমামবাড়া—হুগলীতে হাজী মহম্মদ মহসীনের প্রতিষ্ঠিত ইমামবাড়া একটি বিশাল অট্টালিকা। ইমামবাড়া দেখিবার জন্য

আজও বহুলোক প্রতিদিন এখানে আসে। ইহা নির্মাণ করিতে সে যুগে প্রায় পৌনে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইমামবাড়ার গাত্রে কোর-আন-শরীফের শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। প্রতিবৎসর মহরমের সময়ে এখানে মহা সমারোহ হইয়া থাকে। মহসীনের সমাধিও হুগলীর দ্রষ্টব্যের মধ্যে অন্যতম।

গৌরী সেন—বাঙলায় একটা কথা আছে—লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন। এই গৌরী সেন কে এবং এরূপ কথার উৎপত্তি হইল কিরূপে? গৌরী সেন ছিলেন হুগলীর অধিবাসী। তিনি নাকি হুগলীর প্রত্যেক দোকানে ঢালা হুকুম দিয়াছিলেন, যে কেহ তাঁহার নাম করিয়া জিনিস চাহিবে তাহাকে তাহার প্রার্থিত জিনিস যেন অবশ্যই বিনামূল্যে দেওয়া হয়। পরে তাঁহার কাছে চাহিলেই তিনি ঐ সকল জিনিসের দাম দিয়া দিবেন।

বাণিজ্যের মারফৎ গৌরী সেনের আয় ছিল যেমন প্রচুর, তিনি দান করিতেনও তেমনি মুক্তহস্তে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এক শিবমন্দির ছাড়া বর্তমানে হুগলীতে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।

খান জাহান খাঁ—হুগলীর গৌরী সেন যেমন অদ্বিতীয় দাতা হিসাবে দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তেমনি চরম অলসতা ও কল্পনাতীত বিলাসিতার জন্য দেশজোড়া কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন হুগলীর ফৌজদার নবাব খান জাহান খাঁ। এখনো কোন লোকের নিশ্চেষ্টতা বা অলসতা দেখিলে আমরা বলি তুমি দেখছি একেবারে নবাব খাঞ্জা খাঁ আর কি।

সপ্তগ্রাম—সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রাম ছিল দীর্ঘ দিন যাবৎ বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। ইহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সুদূর রোম পর্যন্ত। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, মাধবাচার্যের চণ্ডীতে এবং লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর গ্রন্থে বাঙলার এই সমৃদ্ধ বন্দরের উল্লেখ আছে। ইহার অফুরন্ত ঐশ্বর্য জনপ্রবাদের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই সুসমৃদ্ধ বন্দরটির অধঃপতন শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সরস্বতী নদী মজিয়া যাইবার ফলে। দেখিতে দেখিতে ইহা রিক্ত, পরিত্যক্ত হইয়া প্রেতপুরীর আকার ধারণ করিল।

কথিত আছে পৌরাণিক রাজা প্রিয়ব্রতের সাতজন পুত্র এখানে আসিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। তাই হিন্দুদের নিকট ইহা একটি পুণ্যতীর্থ। এখানে দ্বাদশ গোপালের মধ্যে প্রধান শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্তের শ্রীশ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভক্ত নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস বহুদিন এই সপ্তগ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা একটি বৈষ্ণব তীর্থ। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে সপ্তগ্রামে একটি বিরাট বৈষ্ণব মহোৎসব হইয়া থাকে।

সপ্তগ্রামে একটি টাকশাল ছিল। গৌড়াধিপতি হুসেন শাহের নাম অনুসারে মুঘল আমলে সপ্তগ্রামের নাম রাখা হয় হুসেনাবাদ। এই হুসেনাবাদে মুদ্রিত হুসেন শাহ, শের শাহ ইত্যাদি অনেক মুসলমান নৃপতির নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এককালে এখানে প্রচুর কাগজ প্রস্তুত হইত।

সপ্তগ্রামে একটি অতি প্রাচীন মস্‌জিদ আছে। মসজিদের শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, ইহা ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

হুগলী জিলার রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায়। কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করেন সাধক-শ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং দেবানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন অমর কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পুরুলিয়া

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর হইতে বিহার রাজ্যের মানভূম জেলার পুরুলিয়া অঞ্চল পশ্চিম বঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহা এখন বর্ধমান বিভাগের অন্যতম জেলা।

আঁয়তনের দিক্ হইতে ইহার স্থান পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে পঞ্চম, কিন্তু লোক-সংখ্যার দিক্ হইতে ইহার স্থান মাত্র নবম। সুতরাং এই জেলায় লোক-বসতি আদৌ ঘন নয়।

এই জেলায় কয়েকটি পাহাড় আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল বাগমুণ্ডি, অযোধ্যা ও কাঁসাই।

এই জেলার একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য নদী হইল কাঁসাই। কুমারী নামে এই নদীর একটি উপনদী আছে।

পুরুলিয়ার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান, ভুট্টা, ইক্ষু এবং কয়েকপ্রকার ডাইল। লাক্ষা এই জিলার একটি প্রধান সম্পদ্। গালা প্রস্তুত হয় লাক্ষা হইতে।

নগরাদি—পুরুলিয়া—এই জেলার সদর। পুরুলিয়ায় একটি কলেজ ও একটি বিশাল কুষ্ঠাশ্রম আছে। **আদ্রা**—এই জেলার একটি বড় রেলওয়ে জংসন।

রঘুনাথপুর—এখানকার তসর শিল্পের যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

বাঙলার কথা

পশ্চিম বঙ্গ (২)

প্রেসিডেন্সী বিভাগ

কলিকাতা

পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা হুগলী নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। ব্রিটিশ আমলে ইহা ছিল সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় নগরী বলিয়া পরিচিত। এই কথার তাৎপর্য হইল এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী সুবিশাল লণ্ডন মহানগরীর পরই ছিল কলিকাতার স্থান।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, হাজার বছর আগে কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে ডাঙ্গা বলিয়া কিছু ছিল না,—উহা ছিল জলময়। প্রাকৃতিক কারণে ধীরে ধীরে জলের মধ্য হইতে ডাঙ্গার সৃষ্টি হইল এবং বহু বছর পরে উহা মানুষের বাসোপযোগী হইয়া উঠিল। কলিকাতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে (আনুমানিক ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত)। তখন উহা ছিল কালীক্ষেত্রের সন্নিকটস্থ ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। আবুল ফজলের বিখ্যাত গ্রন্থ আইন-ই-আকবরীতে কলিকাতার উল্লেখ আছে। উহা ছিল তখন সপ্তগ্রামের অধীনস্থ একটি মহল।

কলিকাতা শহর হিসাবে গড়িয়া ওঠার আগে বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল হুগলী। হুগলীতে তখন ছিল পর্তুগীজদের প্রাধান্য। পর্তুগীজেরা ছিল দারুণ অত্যাচারী। তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে হুগলী মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়া উঠিল। আগেই বলিয়াছি সম্রাট শাহজাহানের আদেশে বাঙলার মুঘল শাসনকর্তা কাসিম খাঁ হুগলীতে পর্তুগীজ শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিলেন (১৬৩২)। ফলে হুগলীতে বহুদিন পরে আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হইল।

ইহার কিছুদিন পরে বাঙলার শাসনকর্তা সুজার নিকট হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা শুল্কের বিনিময়ে বাঙলা দেশে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু কালক্রমে কোম্পানীর সঙ্গে মুঘলদের সজ্মর্ষ শুরু হয়। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর হুগলী কুঠির প্রতিনিধি জব চার্ণক চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিয়া হুগলী বন্দর লুঠ করেন। জব চার্ণকের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনী প্রেরিত হইলে তিনি হুগলী বন্দর ত্যাগ করিয়া উহার ২৭ মাইল দক্ষিণে হুগলী নদীর তীরবর্তী সূতানুটি নামক গ্রামে আশ্রয় লন। কিছুদিন পরে নবাব সরকারের সঙ্গে কোম্পানীর বিবাদের মীমাংসা হয়। ফলে কোম্পানী পুনরায় হুগলীতে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে।

হুগলী অপেক্ষা সূতানুটি সমুদ্রের নিকটে। সূতানুটি হইতে বাণিজ্য জাহাজ নদীপথে একদিকে যেমন বঙ্গোপসাগরে অপর দিকে তেমনি উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রদেশে অতি সহজে যাতায়াত করিতে পারে। সুতরাং বাণিজ্যের পক্ষে এই অঞ্চলই সর্বোৎকৃষ্ট। জব চার্ণক এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া পুনরায় সূতানুটি ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট তিনি ৪ খানি বাণিজ্য জাহাজ, জন ত্রিশেক সৈন্য এবং কিছু সংখ্যক অনুগামী সহ সূতানুটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সূতানুটি গ্রামটি ছিল বাগবাজারের খাল হইতে নিমতলা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার সংলগ্ন গ্রামটির নাম ছিল কলিকাতা। ইহা বিস্তৃত ছিল চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত। চাঁদপাল ঘাট হইতে আদি গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রামটির নাম ছিল গোবিন্দপুর। এই গ্রাম তিনটির পূর্বে ছিল ধাপার বিরাট, অস্বাস্থ্যকর মাঠ। এই অখ্যাত গ্রাম তিনটির সমন্বয়ে কালক্রমে সৃষ্টি হইল বিশাল কলিকাতা মহানগরীর। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে সূতানুটি ও গোবিন্দপুরের নাম লুপ্ত হইল এবং সমগ্র অঞ্চলটিই কলিকাতা নামে পরিচিত হইল।

সে যুগে এই সমগ্র অঞ্চলটির অধিকাংশই ছিল জলাভূমি এবং জঙ্গলময়। বন্য পশুর দল অবাধেই এখানে মনের সুখে বিচরণ করিত। এখানকার অধিবাসিগণ বাস করিত শ্রীহীন স্বাচ্ছন্দ্যহীন কুঁড়ে ঘরে। সুতানুটি অবশ্য কিছুটা উন্নত ছিল। সপ্তগ্রামের পতনের পর কয়েকটি বসাক পরিবার এবং একটি শেঠ পরিবার এখানে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী হইতেও কয়েকজন ভারতীয় বণিক সুতানুটি আসিয়া আড়ৎ খোলেন। সুতরাং জব চার্ণকের পূর্বেই সুতানুটি একটি বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিতেছিল।

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণক একটি ঘোষণার মারফৎ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরে বসতি স্থাপন করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন। কিন্তু এই অঞ্চলের উন্নতি বিধান কল্পে তিনি কিন্তু বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জামাতা চার্লস আয়ার তাঁহার কবরের উপর একটি সমাধি মন্দির নির্মাণ করেন। হেস্টিংস স্ট্রীট ও চার্চ লেনের সংযোগ স্থলে সুবিখ্যাত সেন্ট্ জনের গীর্জা। এই গীর্জার প্রাঙ্গণে জব চার্ণকের সমাধি মন্দির অদ্যাপি দণ্ডায়মান। জব চার্ণকের নাম কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা রূপে চিরদিন ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

চার্লস আয়ার ছিলেন সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে কোম্পানীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইল।

প্রথম হইতেই কোম্পানীর কলিকাতায় একটি দুর্গ নির্মাণ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সরকার-পক্ষের সম্মতি না পাওয়ায় উহা সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভা সিংহ বিদ্রোহী হইলে যেমন সরকার পক্ষ তেমনি কোম্পানী অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। ফলে

সরকার কোম্পানীকে দুর্গ নির্মাণ করার অধিকার দান করিলেন। বর্তমানে যেখানে জেনারেল পোস্ট আফিস, কাস্টম্‌স্ হাউস এবং রেল কোম্পানীর বড় অফিস, সেখানে নির্মিত হইল কলিকাতার প্রথম দুর্গ। ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নাম অনুসারে এই দুর্গের নাম রাখা হইল ফোর্ট উইলিয়ম।

এই সময়ে সম্রাট্ আওরঙজেবের পৌত্র আজিম উস্-সান বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। আজিম উস্-সান ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয়। কোম্পানী তাঁহার নিকট হইতে ১৬০০০৲ টাকার বিনিময়ে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই গ্রাম তিনখানির জমিদারী স্বত্ব অর্জন করিলেন। এই গ্রাম তিনখানির মালিক ছিলেন বেহালা-বরিষার সাবর্ণ-চৌধুরীরা। তাঁহারা মাত্র ১৩০০৲ টাকার বিনিময়ে কোম্পানীর নিকট উহা বিক্রী করিলেন (১০ই নভেম্বর, ১৬৯৮)।

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ ফরুক শিয়র দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে হ্যামিল্টন নামে জনৈক ইংরেজ তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সুচিকিৎসা গুণে সম্রাট্ রোগমুক্ত হইয়া উঠিলেন। ফলে সম্রাট্ হ্যামিল্টন সাহেবের উপর অত্যন্ত প্রীত হইলেন। হ্যামিল্টন সাহেব এই সুযোগে কোম্পানীর পক্ষ হইয়া সম্রাটের নিকট কয়েকটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট সানন্দে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া একটি ফরমান দেন। এই ফরমানের বলে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার ছাড়া কোম্পানী হুগলী নদীর উভয় তীরে ৩৮ খানি গ্রাম কিনিবার অধিকার লাভ করিল। ইহার ফলে কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে যথেষ্ট সুবিধা হইল এবং কলিকাতা দিন দিন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল।

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কলিকাতা ছিল শাসন-ব্যাপারে মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট-জর্জের অধীন। কিন্তু ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে

পৃথক্ বঙ্গ প্রদেশ গঠিত হইল। ইহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট হইলেন জব চার্ণকের জামাতা চার্লস আয়ার।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আওরঙজেবের মৃত্যু হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতময় অরাজকতার তাণ্ডব-নৃত্য শুরু হইল। কোম্পানী এই সুযোগে ফোর্ট উইলিয়মকে আবশ্যকমত বাড়াইয়া লইলেন।

দুর্গের ঠিক পূব দিকেই ছিল একটি দীঘি। এই দীঘিটি পুনরায় কাটাইয়া বড় করা হইল। ইহার চারি পারে সুন্দর সুন্দর গাছ লাগাইয়া উহাকে একটি মনোরম পার্কে পরিণত করা হইল। এই দীঘিটিই বর্তমানের লালদীঘি (ডালহৌসী স্কোয়ার)। লাল দীঘি নামের পিছনে একটি ইতিহাস আছে। এই দীঘির নিকটেই ছিল বেহালার চৌধুরীদের বিরাট কাছারী বাড়ী। সেখানে চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায়ের বিগ্রহ ছিল। দোল উপলক্ষে এই মন্দিরে খুব ধূমধাম হইত এবং দীঘির জল আবিরে লাল হইয়া যাইত। এই কারণেই দীঘির নাম হইল লালদীঘি।

দেখিতে দেখিতে লালদীঘির আশে পাশে উদ্যান-সমন্বিত বহু অট্টালিকা এবং কয়েকটি গীর্জা নির্মিত হইল। গীর্জাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল সেণ্ট্ অ্যানের গীর্জা এবং আর্মেনিয়ানদের নির্মিত সেণ্ট্ নেজারেথের গীর্জা। কলিকাতার বর্তমান গীর্জাগুলির মধ্যে সেণ্ট্ নেজারেথের গীর্জাই সর্বপ্রাচীন। ইহা নির্মিত হইয়াছিল ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে।

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার উপর দিয়া প্রলয়ঙ্কর ঝড় বহিয়া গেল। এই ঝড়ে অধিকাংশ অট্টালিকা বিধ্বস্ত হইল। কাঁচা বাড়ী বলিতে ত একটিও রহিল না। এই সময়ে হুগলী নদীতে প্রায় ২০,০০০ নৌকা, বজরা প্রভৃতি ছিল। উহাদের কোন চিহ্নই রহিল না। লক্ষ লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে বাঙলায় শুরু হইল বর্গীর হাঙ্গামা (১৭৪২)। অসহায় নর-নারীদের আকুল ক্রন্দনে বাঙলার আকাশ-

বাতাস প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। বর্গীদের আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতার ভীত, সন্ত্রস্ত অধিবাসিগণ একটি প্রশস্ত পরিখা (ডিচ্) খনন করিতে শুরু করিলেন। ছয় মাসে পরিখা খননের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইল। এই সময়ে বর্গীদের সঙ্গে নবাব আলিবর্দী খাঁর সন্ধি হইল। ফলে পরিখা খননের কাজও বন্ধ হইল। এই পরিখাটি মারাঠা ডিচ্ নামে পরিচিত হইল। কালক্রমে পরিখাটি আবর্জনাপূর্ণ হওয়ায় কলিকাতার স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর হইয়া দাঁড়াইল। তাই ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উহা ভরাট করিয়া একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা হইল। এই রাস্তাটিই বর্তমানের সুপরিচিত সার্কুলার রোড।

পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরেজরা যখন মীরজাফরকে মস্‌নদে বসাইলেন তখন তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ আদায় করা হইয়াছিল। এই অর্থের কিছুটা ব্যয় করিয়া গোবিন্দপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করানো হইল এবং বর্তমান ফোর্ট উইলিয়মের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। দুর্গ নির্মাণ শেষ হইল ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ২০ লক্ষ স্টার্লিং ব্যয়ে। গোবিন্দপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করার ফলে কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ গড়ের মাঠের সৃষ্টি হইল। এই সময়ে কলিকাতায় টাকশাল স্থাপিত হয়।

সাহেব-পাড়া বলিতে সে যুগে বুঝাইত বৌবাজার ও হেস্টিংস স্ট্রীটের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এই সময়ে সাহেবপাড়া চৌরঙ্গী ধরিয়া দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এই অঞ্চলে সাহেবদের অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ী গড়িয়া উঠিল।

কলিকাতার সমৃদ্ধির সূত্রপাত হয় ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসন-কালে। এই সময়ে কলিকাতা সমগ্র ভারতের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত হইল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই এবং মাদ্রাজ সরকারের উপর বাঙলার গবর্ণরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কলিকাতা হইল সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী।

লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮-১৮০৫) ছিলেন অত্যন্ত জাঁকজমক-প্রিয়। তাঁহারই উদ্যোগে নির্মিত হয় গবর্ণমেণ্ট্ হাউসের সুরম্য প্রাসাদ, বর্তমানে যাহা রাজভবন নামে পরিচিত। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ভেলোসিয়া কলিকাতা ভ্রমণে আসিয়া ইউরোপীয় পল্লীর সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কলিকাতা সম্বন্ধে তিনি বলেন—ইহা সর্বতোভাবে ভারতের রাজধানী হইবার যোগ্য।

সে যুগে যে সব অঞ্চলে দেশীয় লোকেরা বাস করিত তাহা কিন্তু আদৌ সুন্দর ছিল না। এই অঞ্চলের রাস্তাগুলি ছিল যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনি নোংরা। অধিকাংশ বাড়ীর দেয়াল ছিল মাটির, ছাউনি ছিল খড়ের। মাঝে মাঝে দুই একটি একতলা কিংবা দুতলা পাকা বাড়ী দেখা যাইত।

কলিকাতাকে সুন্দর করিয়া তোলার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল কয়েকজন নাগরিকের মনে। এই জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহার সংস্থান করার জন্য লটারি খেলার ব্যবস্থা করা হইল। এই লটারির টাকায় নির্মিত হইল টাউনহলের সুবিশাল অট্টালিকা (১৮০৫-'১৩)। পরে গবর্ণমেণ্টও এই ধরনের লটারির প্রবর্তন করিলেন। উহাতে যে টাকা উঠিল তাহা দ্বারা কয়েকটি পুষ্করিণী খনন করা হইল এবং বহু নালা ডোবা এবং দুর্গন্ধপূর্ণ পুষ্করিণী ভরাট করা হইল। কলিকাতার কয়েকটি বিখ্যাত রাস্তা এবং গঙ্গার পাড়ের ঘাট এই অর্থেই নির্মিত হইয়াছিল। এই সব ব্যবস্থার ফলে কলিকাতার স্বাস্থ্যের যেমন উন্নতি হইল তেমনি উহার সৌন্দর্যও বহুগুণ বাড়িল। পূর্বে রাস্তাগুলির অধিকাংশই ছিল কাঁচা। শীঘ্রই সেগুলি পাকা করা হইল। কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারের (হেদো—বর্তমানে যাহা আজাদ হিন্দ বাগ নামে পরিচিত) এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (বর্তমানে যাহা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার নামে পরিচিত) নির্মিত হইলে কলিকাতার দেশীয় পল্লীর অধিবাসীদের মনে স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। বলা বাহুল্য, কলিকাতার সৌন্দর্য

বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির মূলে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ও কলিকাতা করপোরেশনের দান অসামান্য।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত কলিকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। এই সময় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের ঘোষণা অনুযায়ী রাজধানী স্থানান্তরিত হইল দিল্লীতে। ফলে রাজনৈতিক দিক্ হইতে কলিকাতার গুরুত্ব হ্রাস পায়। কিন্তু বন্দর হিসাবে এবং শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ভারতে কলিকাতার স্থান আজ পর্যন্ত সকলের উপরে। এই শহরে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৫৯·৩ জন।

টালীগঞ্জ সহ কলিকাতার আয়তন ৩৬·৯২ বর্গ মাইল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী ইহার লোক-সংখ্যা ২৯,২৭,২৮৯। বৃহত্তর কলিকাতার লোক-সংখ্যা ৪৫ লক্ষের বেশী।

কলিকাতার কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

যাদুঘর (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম)—কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সড়ক চৌরঙ্গীর উপর যাদুঘরের সুবিশাল অট্টালিকা সহজেই লোকের চোখে পড়ে।

কলিকাতার ১নং পার্ক স্ট্রীটে এশিয়াটিক সোসাইটি নামে একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্র বলিয়া ইহার খ্যাতি জগৎময়। এই এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী যাদুঘরের প্রতিষ্ঠা হয়। ডাঃ ওয়ালিস্ ছিলেন ইহার প্রথম কিউরেটর। যাদুঘরে প্রথম অবস্থায় ছিল শুধু ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব, এই তিনটি বিষয়ের কিছু কিছু সংগ্রহ। বিখ্যাত উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী ডাঃ ওয়ালিসের অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ সেবার ফলে দিন দিন যাদুঘরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার একটি পৃথক্ যাদুঘর স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাদের ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহসমূহ প্রস্তাবিত যাদুঘরে দান করিতে সম্মত হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যাদুঘর স্থাপন করা সম্পর্কে আইন

পাশ হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যাদুঘরের ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয় এবং উহা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই কলিকাতার এই যাদুঘরটি এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুঘর বলিয়া সবত্র স্বীকৃত হয়।

যাদুঘরে গ্যালারী আছে অনেকগুলি। এইগুলি পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, চারুকলা এবং কৃষিজ ও খনিজ শিল্প—এই ছয়টি বিভাগে বিভক্ত। চারুকলা বিভাগ ব্যতীত অন্য বিভাগগুলির পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও গবেষণা মন্ত্রী (Ministry of Natural Resources and Scientific Researches)। যাদুঘরে এমন বহু সংগ্রহ আছে যাহা যত্ন করিয়া দেখিলে শুধু যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা নয়, ইহাতে জ্ঞানও যথেষ্ট বাড়ে। জ্ঞান-লাভের উদ্দেশ্যে দেখিতে হইলে যাদুঘরে সংরক্ষিত জিনিসপত্র কয়েক দিন নয়, কয়েক সপ্তাহই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে হয়।

যাদুঘরে কতকগুলি গ্যালারী আছে যাহা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। শুধু সত্যিকার জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তিগণই সেখানে প্রবেশ করিতে পারেন। এই গ্যালারীগুলি বহু অমূল্য সংগ্রহ দ্বারা সমৃদ্ধ।

আলিপুরের চিড়িয়াখানা—কলিকাতার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দ্রষ্টব্যস্থান আলিপুরের চিড়িয়াখানা। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার তৎকালীন ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্প্‌ল ইহা স্থাপন করেন। তখন ইংলণ্ডের বর্তমান রাণী ২য় এলিজাবেথের প্রপিতামহ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড ছিলেন প্রিন্স্-অব-ওয়েলস্, অর্থাৎ ইংলণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। তিনি স্বয়ং ভারত-ভ্রমণে আসিয়া এই পশুশালার উদ্বোধন করেন।

তদবধি প্রত্যহ শত শত লোক অসীম আগ্রহে চিড়িয়াখানা দেখিতে আসে। আজকাল ছুটির দিন হইলেই প্রায় ২০, হাজার

দর্শকের আগমনে চিড়িয়াখানা যেন এক বিরাট আনন্দের মেলায় পরিণত হয়।

চিড়িয়াখানার আয়তন ৪৩ একর, অর্থাৎ উহা মাঝারি আকারের একটি গ্রামের আয়তনের সমান। ইহা পশুশালা নামে পরিচিত হইলেও এখানে নানা জাতীয় পাখী, মাছ, কুমীর এবং সাপেরও অপূর্ব সমাবেশ। শীতকালে হুইস্‌লিং টীল নামে এক জাতীয় পাখী কোন্ সুদূর দেশ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে আসিয়া বাসা বাঁধে এবং শীতের অবসানে আবার চলিয়া যায়। কী আকর্ষণে ইহারা আসে তাহা ইহারাই জানে। ইহারা আসিয়া আশ্রয় লয় চিড়িয়াখানার সুদীর্ঘ দীঘিতে।

চিড়িয়াখানায় পশু আছে বহু বিচিত্র রকমের। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল গির অরণ্যের সিংহ, সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, অষ্ট্রেলিয়ার এমু ও সিম্পাঞ্জী, মণিপুরী হরিণ, মেরুবাসী শ্বেত ভল্লুক, তিব্বতী বনমার্জার এবং উট, গণ্ডার, হিপোপোটেমাস, হাতী, জিরাফ, গণ্ডার, বনমানুষ, গিবন এবং নানা জাতীয় হরিণ, বানর প্রভৃতি। চিড়িয়াখানায় বিরাট আকারের কয়েকটি কচ্ছপ ও রাজহাঁস সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিড়িয়াখানায় কুমীরগুলিকে রাখা হইয়াছে বিশেষভাবে প্রস্তুত বাঁধান জলাশয়ের মধ্যে। বিভিন্ন জাতীয় সাপও অত্যন্ত যত্নের সহিত রাখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, চিড়িয়াখানার হিংস্র পশুগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় সুদৃঢ় বেষ্টনীর মধ্যে। তা' ছাড়া অন্য অনেক পশু এবং পাখীকেও ঘেরাও জায়গায় রাখা হয়।

এক এক জাতীয় পশু ও পাখীর এক এক রকমের ডাক। চিড়িয়াখানার হাজার হাজার পশু-পাখীর মিলিত ডাকের ফলে সেখানে সদাসর্বদাই বিচিত্র শব্দ-সমারোহ লাগিয়া আছে।

চিড়িয়াখানার এতগুলি বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীকে খাওয়ানো এক ব্যাপার। বিভিন্ন রকমের পশু-পাখীর বিভিন্ন রকমের খাদ্য। এই

বিরাট সব খাদ্য সংগ্রহ করা, উহা প্রস্তুত করা এবং প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে খাইতে দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এই জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের এবং বিপুল আয়োজনের। অবশ্য বনের স্বাধীন পশু-পক্ষী এবং খাঁচায় আবদ্ধ পশুপক্ষীর খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। খাঁচার পশুপাখীরা এমন সব জিনিস খায় স্বাধীন অবস্থায় যাহা তাহারা চোখেও দেখে না। যেমন লিলু নামে একটি সিম্পাঞ্জীর দৈনন্দিন খাদ্য হইল রুটি, মাখন, কলা, শশা, আপেল, কমলা লেবু, পেঁপে, আলু সিদ্ধ প্রভৃতি। সোহন নামে একটি সিম্পাঞ্জী বেশ ভদ্রলোক। তাহার খাদ্যের তালিকার মধ্যে আছে নামকরা কোম্পানীর বিস্কুট, জ্যাম এবং চা। খারাপ চা হইলে তাহার রাগ দেখে কে! সে তৎক্ষণাৎ উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

চিড়িয়াখানার সাপদের খাদ্য হইল ইঁদুর, ফড়িং, কাঁকড়া, আরসোলা চড়ুই পাখী, মুরগী প্রভৃতি।

ভোজনের ব্যাপারে পাখীরাই যেন অধিকতর বিলাসী। কোন কোন পাখীর প্রিয় খাদ্য হইল পিঁপড়ার ডিম। কলিকাতায় উহা বিক্রী হয় ১১ টাকা কিলো দরে। প্রত্যেকদিন চিড়িয়াখানায় আড়াই কিলো পিঁপড়ার ডিমের প্রয়োজন হয়।

অনেক পাখী আছে যাহাদের খাদ্যের উপরে পোকা-মাকড় উড়িয়া না বেড়াইলে তাহাদের আহারে তৃপ্তি হয় না। সুতরাং তাহাদের খাওয়ার সময় কর্তৃপক্ষকে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে হয়।

প্রাণী মাত্রেরই ব্যারাম পীড়া আছে। বলা বাহুল্য, চিড়িয়াখানায় প্রাণীদের অসুখ-বিসুখ হইলে বিশেষ যত্নের সঙ্গেই চিকিৎসা ও পরিচর্যা করা হয়। ইহাদের ঔষধ-পত্র মানুষেরই মত। আফ্রিকা হইতে আনীত লিও-নামে একটি সিংহের খাঁচায় বাস করার ফলে পায়ে পক্ষাঘাত হয়। কর্তৃপক্ষগণ অবিলম্বে চিকিৎসার জন্য তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তাহাকে দেওয়া হইল এমিটিন এবং ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স ইনজেকসন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চিড়িয়াখানার সম্প্রসারণের জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পশুরা যাহাতে স্বাধীনভাবে উন্মুক্ত আকাশতলে বিচরণ করিতে পারে এজন্য খাঁচার পরিবর্তে তাহাদের প্রশস্ত ঘেরাও জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

চিড়িয়াখানার প্রবেশ-মূল্য মাত্র আট আনা। ইহাতেই বৎসরে বহু লক্ষ টাকা আয় হয়। ইহার পরিচালনার ব্যয় অবশ্য অনেক বেশী।

চিড়িয়াখানায় একটি গ্রন্থাগার আছে। ইহাতে বই-এর সংখ্যা কয়েক হাজার। বই ছাড়া প্রাণি-তত্ত্ববিষয়ক সাময়িক পত্রও আছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলঃ—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। তখন ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জন। মহারাণীর স্মৃতিরক্ষা কল্পে একটি সৌধ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং জনগণের নিকট চাঁদার জন্য আবেদন করিলেন। রাজন্যবর্গ এবং জনগণ মুক্তহস্তেই চাঁদা দিলেন। স্মৃতিসৌধের নক্সা ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন সুবিখ্যাত স্থপতি উইলিয়ম এমার্সন। সৌধ নির্মাণের ভার ন্যস্ত হইল মার্টিন কোম্পানীর উপর।

ময়দানের এই মনোরম সৌধটির নির্মাণ কার্য শুরু হইল ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং সমাপ্ত হইল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে ব্যয় হইয়াছিল ৮৫,২৭,৭৮৭ টাকা। এই স্মৃতি-সৌধটি কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বস্তু। ইহার রয়্যাল গ্যালারীতে মহারাণীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে অঙ্কিত বহু চিত্র আছে। গম্বুজের নিম্নস্থ হলঘরে মহারাণীর একটি প্রতিমূর্তি। এই মূর্তিটির সৌন্দর্য অনবদ্য। স্মৃতি-সৌধের কক্ষগুলির মধ্যে দরবার-কক্ষের সৌন্দর্য অতুলনীয়। স্মৃতি-সৌধের চিত্রশালাটি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী স্যার জস্‌য়া রেনল্ড, জন জোফানী, টমাস্ ড্যানিয়েল, উইলিয়ম ড্যানিয়েল, উইলিয়ম হোজেস এবং রবিবর্মা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর চিত্রের দ্বারা সুসমৃদ্ধ।

স্মৃতি-সৌধে শুধু যে চিত্রই রক্ষিত আছে তাহা নয়। মহারাণীর নিজের ব্যবহৃত অনেকগুলি জিনিসও এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। বহু মূল্যবান্ ঐতিহাসিক দলিলপত্র এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদি স্মৃতি-সৌধের সংগ্রহ-শালাটিকে জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিদের নিকট আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

অক্টারলোনী মনুমেণ্ট :—চৌরঙ্গীর সন্নিকটে ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে এই সু-উচ্চ মনুমেণ্টটি দণ্ডায়মান। নেপাল যুদ্ধের (১৮১৪-'১৬) বিজয়ী সেনাপতি অক্টারলোনীর স্মৃতিরক্ষার্থে এই মনুমেণ্ট্‌টি নির্মিত হইয়াছিল। ইহার উচ্চতা ১৫৮ ফুট। ভিতরকার একটি ঘুরানো সিঁড়ি দিয়া ইহার উপরে উঠিতে হয়। মনুমেণ্টের চূড়া হইতে সমগ্র কলিকাতা নগরীটি দেখা যায়। কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের অনুমতি ব্যতীত মনুমেণ্টে ওঠা যায় না।

কালীঘাটের কালীমন্দির :—ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের নিকট কালীঘাট তীর্থসদৃশ। কালীঘাটের কালী কিন্তু পূর্বে কালীঘাটে ছিলেন না, ছিলেন ভবানীপুরে। বেহালা-বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীরা প্রচুর অর্থব্যয়ে কালীঘাটে আদি গঙ্গার তীরে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করান এবং ভবানীপুর হইতে এই মন্দিরে কালী মূর্তিটি নিয়া আসেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত রায় চৌধুরী পরিবারের কালীকান্ত রায়চৌধুরী মন্দিরটির সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে নূতন রূপ দান করেন।

কোম্পানীর আমলে শুধু ধর্মপ্রাণ হিন্দুরাই নন, কোম্পানীর পক্ষ হইয়া অনেক ইংরেজও ব্রাহ্মণদের সাহায্যে জাঁকজমক সহকারে কালীমাতার পূজা দিতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহে জয়লাভ এবং অন্য বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এই ধরনের পূজার ব্যবস্থা হইত।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান—সুবিশাল কলিকাতায় দ্রষ্টব্য স্থানের অন্ত নাই। কিন্তু এখানে সবগুলি সম্বন্ধে বলা সম্ভব নয়। তাই আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থানের নামই শুধু এখন করিলাম :—হাইকোর্ট, রাজভবন, বিধান পরিষদ্ ও বিধান সভা, টাউন হল, নিউ

রাইটার্স বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস, সেনেট হাউস, বিড়লা প্লেনেটোরিয়াম, ইনডাস্ট্রিয়াল ম্যুজিয়ম, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, টাকশাল, পরেশনাথের মন্দির (গৌরীবেড়ে ও বেলগাছিয়া), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, হগ সাহেবের বাজার, রবীন্দ্র সরোবর, ইডেন গার্ডেন।

চব্বিশ পরগণা

কলিকাতা মহানগরীর পশ্চিমে হুগলী নদী, কিন্তু ইহার বাকী তিন দিকেই চব্বিশ পরগণা জিলা। যে আলিপুরকে অনেকেই খাস কলিকাতার অংশ বলিয়া মনে করেন সেই আলিপুরই হইল চব্বিশ পরগণা জিলার সদর। আলিপুর ছাড়া বারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট, ডায়মণ্ড হারবার ও বনগাঁ, এই কয়টি মহকুমা লইয়া চব্বিশ পরগণা জিলা গঠিত। বনগাঁ কিন্তু পূর্বে ছিল যশোহর জিলার অন্তর্ভুক্ত। ভারত-বিভাগের ফলে এই মহকুমাটি পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

আলিপুর—আলিপুর চিড়িয়াখানার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। চিড়িয়াখানার সন্নিকটেই একটি বিশাল সুরম্য প্রাসাদ। ইহার নাম বেলভেডিয়ার প্যালেস। স্বাধীনতার পূর্বে ইহা ছিল লাটপ্রাসাদ। কয়েক বৎসর হইল সুবিখ্যাত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিটি এই প্রাসাদে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখন ইহার নাম আর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নয়, ন্যাশনাল লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীতে বই এর সংখ্যা কয়েক লক্ষ।* প্রত্যহ শত শত জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি এই লাইব্রেরীতে

*১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বই এর সংখ্যা প্রায় দশলক্ষ ছিল। কিন্তু এই সংখ্যা প্রতি দিনই বাড়িতেছে। সম্প্রতি এই মর্মে একটি আইন পাস হইয়াছে যে, যে সব বই ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষায় ছাপা হইবে তাহার প্রত্যেকখানিরই কপি প্রকাশকদিগকে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দিতে হইবে।

বসিয়া বই পড়েন এবং লাইব্রেরী হইতে বই বাড়ী লইয়া যান। এখানে বসিয়া পড়িবার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। লাইব্রেরীটি একটি দেখিবার মত জিনিসও বটে। এমন সুদৃশ্য ও পরিচ্ছন্নভাবে নির্মিত ভবন কলিকাতায় আর দ্বিতীয় একটি আছে কিনা সন্দেহ। ইহা শুধু কলিকাতার নয়, সমগ্র ভারতের গৌরবের বস্তু। এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা করেন ভারত সরকার।

যাদবপুর:—ইহা কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ একটি ক্রমবর্ধমান শহর। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল এই স্থানের একটি সুবিখ্যাত আরোগ্য সদন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন দেশপ্রেমিক দানবীরের অর্থানুকূল্যে এখানে একটি জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া উহা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রূপান্তরিত হয়। গত ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রাজ্যসরকার-পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে। তদবধি এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যতীত অন্য নানা বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থাও হইয়াছে। এখানকার আরও দুইটি প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ভারতময়—একটির নাম সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট। অপরটির নাম ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স।

কিছুদিন পূর্বেও যাদবপুর ছিল একটি অপরিচ্ছন্ন, নগণ্য পল্লী। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকটি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠার ফলে ইহা সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে।

দমদম—দমদমের খ্যাতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতেই। এখানে একটি যুদ্ধে ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। সেযুগে এখানে একটি বৃহৎ সেনানিবাস ছিল। সেনানিবাসে বাস করিত গোরা (ইংরেজ) সৈন্যগণ। গোরাদের একটি বাজার এখানে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া এই স্থান গোরাবাজার নামেও পরিচিত হইয়া ওঠে। এখানে এখনও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের

একটি কারখানা আছে। এক সময়ে দমদমে নির্মিত 'বুলেটের' (গুলীর) খুব নাম ছিল। দমদমে যশোর রোডের পাশে একটি উঁচু ঢিবির উপর নির্মিত সুবিখ্যাত ক্লাইভ-ভবন সহজেই পথচারীদের চোখে পড়ে। এক সময়ে লর্ড ক্লাইভ এই ভবনে বাস করিতেন। বর্তমানে কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবার এই ভবনে বাস করিতেছে। পূর্বে দমদমে সাহেবদের অনেক সুন্দর সুন্দর বাগানবাড়ী ছিল। এখন আর সে সবের চিহ্ন বড় একটা দেখা যায় না। এখন দমদমের খ্যাতি শুধু বিমানঘাঁটির জন্য। দিন দিন এই বিমানঘাঁটির পরিসর, সৌন্দর্য ও গুরুত্ব বাড়িতেছে। দমদমের জেসপের কারখানা এবং হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কারখানাও সুবিখ্যাত।

বজবজ—বজবজের প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু হইল পেট্রোল ও কেরোসিন মজুত করার বিরাট বিরাট গুদাম।

মুসলমান আমলে বজবজে একটি দুর্গ ছিল। লর্ড ক্লাইভ এই দুর্গটি অধিকার করেন। কয়েক বৎসর হইল এই দুর্গের কামান এবং অন্যান্য আসবাব-পত্র কলিকাতায় আনিয়া রাখা হইয়াছে। ফলে দুর্গটি এখন খালি পড়িয়া আছে।

বাটানগর—বজবজের অনতিদূরে বাটানগরে জুতা তৈয়ারীর একটি বিরাট কারখানা আছে। ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এই কারখানার মালিক 'বাটা' ইউরোপের চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিবাসী।

ডায়মণ্ড হারবার—হুগলী নদীর তীরে। ইহা একটি ছোট মহকুমা শহর।

বঙ্গোপসাগর হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত হুগলী নদী বেশ প্রশস্ত এবং নৌবাহনযোগ্য, ইহার পরেই নদীতে সর্বদা চড়ার সৃষ্টি হয় বলিয়া উহা জাহাজ চলাচলের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই বিদেশ হইতে কলিকাতার দিকে যে সব জাহাজ আসে, সেগুলি ডায়মণ্ড হারবারে আসিয়াই নঙ্গর করিতে বাধ্য হয়। সেখান হইতে

সুদক্ষ পাইলটের সাহায্যে উহাদিগকে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে কলিকাতা বন্দরে চালাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ডায়মণ্ড হারবারের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

গঙ্গা সাগর সঙ্গম—ডায়মণ্ড হারবার হইতে চল্লিশ মাইল দূরে গঙ্গাসাগর সঙ্গম। ইহা হিন্দুদের নিকট পবিত্র তীর্থস্থান। কথিত আছে এই সাগর-সঙ্গমে সগর রাজার ষাটহাজার ছেলে কপিল মুনির অভিশাপে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে গঙ্গার কৃপায় তাঁহারা এখানেই মুক্ত হইয়াছিলেন।

গঙ্গাসাগর সঙ্গমে একটি দ্বীপ আছে। উহার নাম গঙ্গাসাগর দ্বীপ। এই দ্বীপে কপিল মুনির মূর্তি ও মন্দির আছে। এখানে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে বিরাট মেলার অনুষ্ঠান হয়। সহস্র সহস্র ধর্মপ্রাণ হিন্দু অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও পুণ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষায় এই উৎসবে সমবেত হইয়া সাগর-সঙ্গমে স্নান করেন। পূর্বে যখন দেশে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত ছিল না তখন প্রতি বৎসর শত শত লোককে সাগর-সঙ্গমে স্নান করিতে আসিয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হইত।

সাগরদ্বীপে যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের একটি নৌবহর এবং সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে সাগর দ্বীপ হইতে ধূমঘাট পর্যন্ত সমস্ত জলপথ জাহাজের সাহায্যে পাহারা দিবার ব্যবস্থা ছিল।

বারাকপুর—কলিকাতা হইতে বারাকপুরের দূরত্ব ১৪ মাইল। ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে বারাকপুরের নাম ছিল চানক। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা এখানে সেনানিবাস স্থাপন করেন। তাই ইহার নাম হইল বারাকপুর।* ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরেই সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এত বড় বিদ্রোহ ভারতে আর কোন দিন হয় নাই।

*ইংরেজী ব্যারাক (Barrack) শব্দ হইতে বারাকপুর নামের উৎপত্তি। Barrack অর্থ সেনানিবাস

বারাকপুরের লাটপ্রাসাদ এবং সরকারী বাগান বড় মনোরম। গঙ্গাতীরস্থ এই বাগানটি তরুবীথি সজ্জিত হইয়া দর্শকের নয়নমনকে মোহিত করে। এখানকার গান্ধীঘাট একটি পুণ্য তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

বারাকপুরের অন্তর্গত মণিরামপুরে ছিল স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন। পৃথিবীতে যাঁহারা দেশপ্রেমের জন্য অমরত্ব লাভ করিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথের নাম তাঁহাদের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

নৈহাটি—ইহা একটি শিল্প-প্রধান শহর। এখানে অনেক পাটের কল আছে। এই নৈহাটির অন্তর্গত কাঁঠালপাড়ায় বাঙলার সাহিত্য-সম্রাট্ অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, ও পুরাতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও ছিলেন এই নৈহাটির অধিবাসী।

হালিশহর—কালী-সাধক স্বনামধন্য রামপ্রসাদের জন্মস্থান হালিশহর আজ একটি শিল্পপ্রধান শহর বলিয়া পরিচিত। একদিন এই হালিশহরের আকাশ বাতাস রামপ্রসাদের মধুর সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইত। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন রামপ্রসাদের একজন অনুরাগী ভক্ত। রামপ্রসাদের সুমধুর শ্যামা-সঙ্গীত নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পর্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। আজও বাঙলার সর্বত্র রামপ্রসাদী সঙ্গীত লোকের মনে অপার ভক্তি ও আনন্দের সঞ্চার করে।

প্রতি বৎসর কালীপূজার সময়ে হালিশহরে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত রামপ্রসাদের স্মৃতি-উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে একটি বিরাট মেলারও অনুষ্ঠান হয়।

বোড়াল—সুযোগ্য সেন নামে সেন বংশীয় একজন রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন বলিয়া শোনা যায়। এখানে প্রাচীনকালের কতকগুলি স্তূপ ও দীঘি আছে। এখানে ত্রিপুরাসুন্দরীর একটি

মূর্তি আছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। খ্যাতনামা সমাজ-সংস্কারক মনীষী রাজনারায়ণ বসু বোড়ালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলি এককালে বাঙলা দেশে নবজাগরণ আনিয়াছিল। তাঁহার ভিটা এখন জঙ্গলাকীর্ণ, পরিত্যক্ত। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এই মনীষীর দৌহিত্র।

পীর মোবারকের মস্‌জিদ ও দরগাহ্‌---ক্যানিংএর পথে ঘুটিয়ারী শরিফ একটি রেল স্টেসন। স্টেসনের অনতিদূরে অবস্থিত পীর গাজী মোবারক আলির দরগাহ্‌ ও মস্‌জিদ মুসলমানদের তীর্থ। গাজী সাহেবের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বহু বিচিত্র কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। সেকালে এই অঞ্চল সুন্দরবনেরই অংশ ছিল বলিয়া এই স্থান ছিল বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি। ইহাদের হাতে বহু লোকের প্রাণ যাইত। গাজী সাহেব নিজ শক্তি বলে এই সব হিংস্র জন্তু তাড়াইয়া দিয়া ঘুটিয়ারী শরিফকে আবার মানুষের বাসের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। কথিত আছে, একবার অনাবৃষ্টি হওয়ায় তিনি বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে সমাধিস্থ হন। কিন্তু তিন দিনেও তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিল না দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ মনে করে গাজী সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। তাই তাহারা তাঁহার কবর দেয়। পরে স্বপ্নযোগে তিনি এক শিষ্যকে জানান, তাহারা তাঁহাকে কবর দিয়াছে জীবন্ত অবস্থায়। তদবধি প্রতি বৎসর ঘুটিয়ারী শরিফে মেলা বসে এবং বহু লোক পীরের দরগাহে শিরণি দেয়।

দক্ষিণ রায়—ধপধপির দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা বলিয়া পূজিত। লোকের বিশ্বাস তাঁহার নাম করিয়া সুন্দরবনে প্রবেশ করিলে বাঘের কোন ভয় থাকে না এবং মনস্কামনাও সিদ্ধ হয়। মাঘ মাসের ১লা তারিখে ধপধপিতে মহা সমারোহে দক্ষিণ রায়ের পূজা হয়। এই উপলক্ষে তখন এক বিরাট মেলা বসে।

ধপধপিতে দক্ষিণ রায়ের একটি অতি বিরাট মূর্তি আছে। এত বড় মূর্তি কোথাও বড় একটা দেখা যায় না।

চক্রতীর্থ—ডায়মণ্ড হারবার লাইনের মায়াপুর স্টেসন হইতে মাইল চারেক দক্ষিণ-পূর্বে বড়াশী মাধবপুর গ্রাম। এখানে অম্বুলিঙ্গ শিবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। বর্তমানে উহা বদরিকানাথ নামেই সুপরিচিত। অম্বুলিঙ্গের নিকটে একটি পুষ্করিণীর নাম শিবকুণ্ড। ইহার জল পবিত্র, এই বিশ্বাসে বহু লোক এখানে স্নান করে। এখানে ত্রিপুরা সুন্দরীর মূর্তিও আছে। অনেকে বলেন, পুরাণে উল্লিখিত চক্রতীর্থ এই বড়াশী-মাধবপুরেই অবস্থিত। ভৃগুনন্দী তিথিতে সহস্র সহস্র যাত্রী পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হয়। প্রবাদ এই যে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের যখন স্বর্গে যাইবার কোন পথই খোলা ছিল না তখন তিনি এই ভৃগুনন্দী তিথিতে চক্রতীর্থে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করেন।

মথুরাপুরের মাইল ছয়েক পশ্চিমে মন্দির বাজারের কেশবেশ্বর মন্দিরটির ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কেশব রায় চৌধুরী সম্ভবত একজন ভুঁইয়া ছিলেন। তিনি নিজের নাম অনুসারে মন্দিরের বিগ্রহের নাম দিয়াছেন কেশবেশ্বর।

সুন্দরবন—সুন্দরবনের সম্পূর্ণ অংশই চব্বিশ পরগণার মধ্যে নয়; ইহার কিয়দংশ খুলনা ও বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্ভুক্ত। এই বনে অসংখ্য সুন্দরীগাছ আছে বলিয়াই নাকি ইহার নাম সুন্দরবন হইয়াছে। সুন্দরবন অসংখ্য নদী, নালা, খাল ও বিলে পরিপূর্ণ। এখানকার রয়াল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় জাতের বাঘ। ইহা কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড়, মণিরাজ, শাঁখামুঠি প্রভৃতি বিষধর সর্পের আবাসভূমি। এখানে কুমীর ও হাঙ্গরেরও অভাব নাই। এরূপ বৈচিত্র্যময় অরণ্য ভারতবর্ষে আর একটিও নাই। এই অরণ্য হইতে প্রচুর মধু, মোম প্রভৃতি সংগৃহীত হয়।

সুন্দরবনের কয়েকটি স্থানে মাটি খোঁড়ার ফলে অট্টালিকা, মন্দির প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, হিউ এন সাঙ্ যে সমুদ্রোপকূলবর্তী সমতট রাজ্যের বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হয়ত এই সুন্দরবনেরই একাংশ ছিল।

চব্বিশ পরগণার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান :—

দক্ষিণেশ্বর—দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের কথা কে না জানে? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ইহাই ছিল সাধনা ক্ষেত্র। গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই কালী মন্দিরটির শোভা অপূর্ব। প্রতিদিন এখানে অসংখ্য দর্শকের সমাগম হয়।

বেলঘরিয়া—এখানকার 'টেক্সমাকো' নামক বিরাট কারখানাটি পশ্চিম বঙ্গের একটি গৌরবের বস্তু। স্টেট্ ট্রান্সপোর্টের বিরাট কারখানাটিও এখানে অবস্থিত।

টিটাগড়—এখানকার কাগজের কলের খ্যাতি সমগ্র ভারতময়।

ইছাপুর—এখানে একটি বিরাট বন্দুকের কারখানা আছে।

বনগ্রাম—ইহা চব্বিশ পরগণা জিলার অন্যতম মহকুমা-শহর। ইহা ইচ্ছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। শিয়ালদহ হইতে যশোহরের দিকে যাইতে হইলে ইহাই পশ্চিম বঙ্গের শেষ রেল স্টেসন। শহরটি ছোট হইলেও বেশ কর্ম-চঞ্চল।

কাঁচড়াপাড়া—এখানকার রেলওয়ে কারখানাটি পূর্ব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেল কারখানা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অশোকনগর (হাবড়া কলোনী)—উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় পশ্চিম বঙ্গে যে কয়েকটি শহর উপনিবেশ (আরবান কলোনী) স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অশোকনগরের স্থান সকলের উপরে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু শিক্ষিত পরিবার এখানে বাসস্থাপন করিয়াছেন। এখানকার প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন রাস্তাগুলি সত্যই দেখিবার মত। সরকার প্রচুর অর্থব্যয়ে এখানে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গোলবাজার, বয়েজ-

হোম, পি. এল. ক্যাম্প* (পারম্যানেন্ট্ লায়াবেলিটি ক্যাম্প) উল্লেখযোগ্য।

বাণীপুর—অশোকনগরের সংলগ্ন এই ছোট গ্রামটি গত ৭।৮ বছরের মধ্যে বেসিক ট্রেনিং-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে বেসিক ট্রেনিং কলেজ আছে তিনটি,—জুনিয়ার, সিনিয়ার ও পোস্ট গ্রাজুয়েট। এখানে একটি জনতা কলেজ এবং ফিজিক্যাল ট্রেণিংএর পোস্ট-গ্রাজুয়েট কলেজও আছে। এখানকার আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান,—রাজ্যসরকার পরিচালিত একটি বৃহদায়তন অনাথ আশ্রম।

নদীয়া

বঙ্গ বিভাগের ফলে নদীয়া জেলাটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকের তেরোটি থানা লইয়া গঠিত হইয়াছে পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান নদীয়া জিলা।

নবদ্বীপ—একদিন বাঙলার শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। তখন এখানে পণ্ডিতদের যেন একটি বিরাট হাট বসিয়াছিল। নবদ্বীপের কৃতী সন্তান বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের এক একজন দিক্‌পাল।

মিথিলার পরাজয়—সেকালে বাঙ্গালী ছাত্রদের ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে হইত সুদূর মিথিলায়। বাঙলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। যাঁহারা মিথিলায় থাকিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন

* কয়েকশত নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল নর-নারীকে সরকার এই ক্যম্পে রাখিয়া তাহাদের সর্বপ্রকার ব্যয় বহন করিতেছেন।

মিথিলার পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের কোন বই-ই বাঙলায় লইয়া আসিতে দিতেন না। সে যুগের মিথিলার পণ্ডিতগণ ছিলেন এমনই সঙ্কীর্ণমনা।

রঘুনাথ শিরোমণি নামে নবদ্বীপের এক মেধাবী ছাত্র মিথিলায় গিয়া সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের শিষ্য হইলেন। গুরু. অচিরেই এই তরুণ বাঙ্গালী ছাত্রের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইলেন। একদিন এই মহাজ্ঞানী পণ্ডিতকে ন্যায়শাস্ত্রের তর্কের বিচারে হার স্বীকার করিতে হইল তাঁহার এই তরুণ বাঙ্গালী শিষ্যের কাছে।

রঘুনাথ শিরোমণি যখন বাঙলায় ফিরিয়া আসিলেন তখন নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে এক অপূর্ব সাড়া পড়িয়া গেল। ইহার কারণ কি? রঘুনাথ শিরোমণি সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছেন। আর চিন্তা নাই। নবদ্বীপেই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা শুরু হইবে। তাহাই হইল। রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথিগুলি সবই মন হইতে লিখিয়া ফেলিলেন। ফলে অন্যান্য পণ্ডিতেরা উহা পাঠ করিয়া যথা সময়ে ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহারাও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা শুরু করিলেন; দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীসমূহ ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার বিখ্যাত কেন্দ্র বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ শিরোমণির এই যশোগাথা কবি সত্যেন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন সুবিখ্যাত 'আমরা' নামক কবিতায়। পংক্তি ক'টি শোনো—

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এলো দেশে যশের মুকুট পরি'।

বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্য—নবদ্বীপের সব চেয়ে বড় গৌরবের কথা,—বাঙলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব এই নবদ্বীপেই জন্ম গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব বাল্যকালে ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের গতি পরিবর্তিত হইল। তাঁহার

পাণ্ডিত্যের যশঃসৌরভে নদীয়ার আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু কতকগুলি পাষণ্ড নানা উপায়ে নিমাইকে অপদস্থ এবং বিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। নিমাই নিজ চরিত্র-মাহাত্ম্যে সকল বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কালজয়ী হইলেন। নিমাই 'শ্রীচৈতন্য' আখ্যায় ভূষিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য যে বৈষ্ণব ধর্মের বন্যা বাঙলা দেশে বহাইয়া দিলেন তাহার প্রভাবে ভারতীয় ধর্মজীবনে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হইল। তাঁহার বাণী যুগে যুগে ভারতের বুকে অক্ষয়, অমর, উজ্জ্বল হইয়া রহিবে। তিনি শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া আজও বহু ভক্তের নিকট পূজা লাভ করিতেছেন।

নবদ্বীপের আদি কথা

নবদ্বীপের সমৃদ্ধির সূত্রপাত সেন রাজাদের আমলে। সেন রাজারা এখানে গঙ্গাতীরে বসবাস করিবার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করান। গঙ্গার পূর্বতীরে এখন যে অংশ মায়াপুর নামে পরিচিত সেই অঞ্চলে বল্লাল সেনের আমলের একটি প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ আজও পড়িয়া আছে। ইহা বল্লাল ঢিবি নামে পরিচিত। এই ঢিবিটি প্রায় চারশত ফুট লম্বা এবং পঁচিশ ফুট উঁচু। সরকার ইহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কাহারও কাহারও মতে এই মায়াপুরই প্রাচীন কালের নবদ্বীপ এবং এখানেই শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মায়াপুরে দেখিবার মত স্থান অনেকগুলিই আছে—শ্রীশ্রীযোগপীঠ মন্দির বা চৈতন্যদেবের জন্মস্থান, চৈতন্য মঠ, চাঁদ কাজীর সমাধি, শিবের ডোবা, বল্লাল দীঘি প্রভৃতি।

(১) শ্রীশ্রীযোগপীঠ মন্দির বা চৈতন্যদেবের জন্মস্থান—

এই মন্দিরের চূড়ায় বারো মাস আলোকসজ্জার ব্যবস্থা আছে। বহু দূর হইতেও এই মন্দিরের সুউচ্চ চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে অনেকগুলি বিগ্রহও আছে। মন্দিরের নিকটে ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিট্যুট নামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস অবস্থিত।

(২) শ্রীবাস অঙ্গন—যোগপীঠের উত্তরে শ্রীবাস অঙ্গন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায় ও পার্ষদগণকে লইয়া এই শ্রীবাস অঙ্গনে ভগবানের মহিমা কীর্তন করিতেন।

(৩) চাঁদ কাজীর সমাধি—মায়াপুর হইতে আধ মাইল দূরে চাঁদ কাজীর কবর। কথিত আছে, চাঁদ কাজী ছিলেন গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের শিক্ষক। তাই নবদ্বীপে তাঁহার প্রভাব ছিল অসামান্য। একদিন শ্রীচৈতন্য নগর সংকীর্তনে বাহির হইলে কাজী সাহেব আদেশ দিলেন, নগরে কেহ হরি নাম করিতে পারিবে না। চৈতন্যদেব এরূপ অন্যায় আদেশ গ্রাহ্য করিবার পাত্র নন। তিনি তাঁহার কীর্তনীয়ার দল লইয়া সোজা কাজী সাহেবের বাড়ীর দিকে চলিলেন। সকলে তো বিস্ময়ে স্তব্ধ! কাজী সাহেবের আদেশ অমান্যের পরিণাম নিশ্চয়ই সাজ্ঘাতিক কিছু হইবে। চৈতন্যদেব কাজী সাহেবের বাড়ী পৌছিয়াই তাঁহাকে ডাকিয়া মধুরকণ্ঠে কীর্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কথা বলিলেন। কাজী সাহেব চৈতন্যদেবের যুক্তিপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হইয়া সংকীর্তনের উপর সর্বপ্রকার বাধা-নিষেধ তুলিয়া লইলেন। তদবধি তিনি হইলেন চৈতন্যদেবের একজন অতি অনুরাগী ভক্ত। বৈষ্ণবেরা আজও কাজী সাহেবের কবরের পাশ দিয়া যাইবার সময় তাঁহার প্রতি নতমস্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কৃষ্ণনগর—কৃষ্ণনগর নদীয়া জিলার সদর এবং প্রধান শহর। ইহার পাশ দিয়া খড়িয়া নদী প্রবাহিত। এই স্থানের দৃশ্য অতীব মনোহর।

পূর্বে কৃষ্ণনগরের নাম ছিল রেউই। পরবর্তীকালে এখানে শ্রীকৃষ্ণের পূজা অর্চনা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া এই স্থানের নূতন নাম হয় কৃষ্ণনগর।

প্রাচীন রাজবংশ—নদীয়ার যে রাজবংশ দেশ শাসন করিতেন তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল মাটিয়ারীতে। এই রাজবংশের রাজা রাঘব মাটিয়ারী ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন এবং ক্রমে ইহা রাজধানীতে পরিণত হয়। এই রাজবংশের রাজা রঘুরাম বীরত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সাধারণের নিকট তিনি রঘুবীর নামেই সুপরিচিত। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের নাম কে না জানে? রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে সর্ববিষয়েই নদীয়ার অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বহু কবি ইঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। স্বনামধন্য রায় গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে তিনি তাঁহার অমর কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। রসরাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভাতুড়ীও তাঁহার একান্ত অনুগ্রহভাজন ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ছিলেন অতি বিদ্বান্ ব্যক্তি।

কৃষ্ণচন্দ্র লর্ড ক্লাইভের নিকট হইতে কয়েকটি কামান উপহার পাইয়াছিলেন। তাহা আজ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে রক্ষিত আছে। কৃষ্ণচন্দ্রের পর হইতে এই বংশের যশ প্রতিপত্তি কমিতে থাকে।

মৃৎশিল্প—কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি বিশ্বজনবিদিত। এখানকার শিল্পীদের তৈরী মাটির নানাবিধ সামগ্রীর পাশে আসল জিনিস রাখিয়া দিলে চিনিয়া বাহির করা কঠিন, কোন্‌টি আসল, কোন্‌টি মাটির।

সুধীজনের জন্মভূমি—নবদ্বীপের ন্যায় কৃষ্ণনগরও সুধীজন-মণ্ডিত পুণ্যভূমি। বঙ্গভারতীর অমর কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানসেবী জগদানন্দ রায়, ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণনগরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

শান্তিপুর—শান্তিপুরকে বৈষ্ণবদিগের পীঠস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শান্তিপুরের অন্তর্গত বাব্‌লা পাড়ায় অদ্বৈত

পদচিহ্ন। মুসলমানদের বিশ্বাস, এই পদচিহ্ন স্বয়ং পয়গম্বর মহম্মদের। কদম শব্দের অর্থ পা এবং রসুল অর্থ পয়গম্বর।

অন্য অনেক মস্‌জিদের মত কদম রসুলও তৈয়ারী হইয়াছিল হিন্দুমন্দিরের মালমসলার সাহায্যে।

মালদহের আম—মালদহের ঐতিহাসিক মর্যাদা যতই থাকুক, সাধারণ লোকের নিকট মালদহের খ্যাতি প্রধানতঃ উহার আমের জন্য। মালদহে কি কি জাতীয় আম উৎপন্ন হয় তাহা এখন আলোচনা করা যাউক। আমের মরসুমে প্রথম উৎকৃষ্ট জাতীয় আম হইল গোপালভোগ ও বৃন্দাবন আম। বৃন্দাবন আম আকারে ছোট হইলেও ইহার স্বাদ ও গন্ধ দুই-ই চমৎকার। ইহার পরেই দেখা দেয় ল্যাঙড়া, ক্ষীরসাপতি ও কিষণভোগ। সকলের শেষে ফলে সুবিখ্যাত ফজলী।

এত বিভিন্ন জাতীয় উৎকৃষ্ট আম আর কোন জেলায় কিংবা কোন দেশে জন্মায় না।

মালদহের সুসন্তান—চক্রপাণি দত্ত (১১শ শতাব্দী), হলায়ুধ মিশ্র (১২শ-১৩শ শতাব্দী), রূপ ও সনাতন (১৬শ শতাব্দী), ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন (১৮শ শতাব্দী) প্রভৃতির জন্মস্থান এই মালদহ জেলায়।

বঙ্গবিভাগের ফলে পুরাতন জলপাইগুড়ি জেলার ৫টি থানা বাদে অবশিষ্ট অংশ লইয়া বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হইয়াছে।

এই জেলার দুইটি মহকুমা—জলপাইগুড়ি (সদর) ও আলিপুর দুয়ার। এই জেলার উত্তরাংশকে বলে দুয়ার। এখানে স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাহাড় আছে।

জলপাইগুড়ি শহরের প্রান্ত দিয়া তিস্তা নদী প্রবাহিত। করলা নামে একটি ছোট নদী এই শহরের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

করলার সেতুর উপর দাঁড়াইলে মেঘমুক্ত দিনে তুষারাবৃত গিরিরাজ হিমালয়ের অপূর্ব শোভা সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়।

জলপাইগুড়ি নামের কারণ কি? কেহ কেহ বলেন, এককালে এখানে অজস্র জলপাইগাছ ছিল বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহার নিকটেই জল্পেশ্বর শিবের মন্দির অবস্থিত বলিয়া ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

পীঠস্থান জল্পেশ্বর—কথিত আছে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (কামরূপের) রাজা জল্পেশ্বর এই অঞ্চলের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দৈবাৎ এই শিবলিঙ্গটি আবিষ্কার করেন এবং মন্দির তৈয়ারী করিয়া উহাতে বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজের নামেই ইহার নাম রাখিলেন জল্পেশ্বর। এখন হইতে তিনশ' বছর আগে কোচবিহারের রাজা জল্পেশ্বরের মন্দিরটির সংস্কার সাধন করেন। কিন্তু ইহা দেখিতে অনেকটা মসজিদের মত হইয়াছিল বলিয়া পুনরায় উহা নূতন করিয়া নির্মাণ করিতে হয়।

জল্পেশ্বর শৈবদের একটি পীঠস্থান। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। তখন সহস্র সহস্র পাহাড়িয়া এখানে নানাবিধ জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে আসে।

ঐতিহাসিক স্থান ভিতরগড়—জলপাইগুড়ি শহর হইতে দশ মাইল পশ্চিমে ইতিহাস-বিখ্যাত প্রাচীন দুর্গ ভিতরগড়ের জীর্ণ অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, পৌরাণিক যুগের পৃথুরাজ এখানে রাজত্ব করিতেন। ঐতিহাসিকদের মতে এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল পালযুগে তিব্বতীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। পরপর চারটি বেষ্টনীর মধ্যস্থলে গড়। গড়ের চারিপাশে পরিখা। গড়ের মধ্যে একটি স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকা। ইহাতে দশটি ঘাট ছিল। ইহা 'মহারাজ দীঘি' নামে পরিচিত। পুরাণে আছে পৃথুরাজ এই দীঘির জলে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

আজও জলপাইগুড়ির বনে-জঙ্গলে দু'চার ঘর কীচক বাস করে। ইহারা বন্য জাতি এবং অসভ্য। পশুপক্ষী শিকার করিয়া ইহারা জীবিকা নির্বাহ করে।

বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল—সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীতে যে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের কথা আছে তাহা জলপাইগুড়ি জেলায় শিলিগুড়ির কাছে অবস্থিত। এখানে একটি ছোট মন্দির আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় ইহাকেই ভবানী পাঠকের মন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেবীডাঙ্গা, দেবীঘাট, দেবীগঞ্জ, দেবীডোবা প্রভৃতির সহিত দেবী চৌধুরাণীর স্মৃতি বিজড়িত।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান ঃ

বকসা—এখানে একটি সেনা-নিবাস আছে।

আলিপুর দুয়ার—ইহা একটি মহকুমা শহর এবং বড় জংসন-স্টেশন।

দার্জিলিং জেলা

দার্জিলিং সৌন্দর্যের মায়াপুরী। অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ইহা সমগ্র ভারতে 'শৈলনিবাসের রাণী' নামে বিখ্যাত। স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং অতুলনীয় সৌন্দর্যের জন্য ইহা ইংরেজ আমলে বাঙলার লাটসাহেবের গ্রীষ্মাবাস রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

নামের উৎপত্তি

কথিত আছে পূর্বে এই স্থানে দুর্জয়লিঙ্গ নামে মহাদেবের একটি মন্দির ছিল। সেই দুর্জয়লিঙ্গের নাম হইতেই ইহার নাম দার্জিলিং হইয়াছে। দার্জিলিং শহরের বর্তমান অবজারভেটারীর উপর নাকি দুর্জয়লিঙ্গের মন্দিরটি অবস্থিত ছিল।

এ বিষয়ে আর একটি মত হইল এখানে তিব্বতীয় বৌদ্ধদের একটি মঠ ছিল। সেই মঠের নাম দোর্জে হইতে দার্জিলিং নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

দার্জিলিং-এর পথ

দার্জিলিং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলানিকেতন। সৌন্দর্যের সেই লীলা-কুঞ্জে যাইবার সমগ্র পথও কে যেন প্রাকৃতিক শোভায় সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। শিলিগুড়ি স্টেশনের পর হইতেই প্রকৃতির অপরূপ শোভায় মুগ্ধ হইতে হয়।

দার্জিলিং যাইতে হইলে শিলিগুড়ি স্টেশন হইতে নামিয়া পুনরায় অন্য গাড়ীতে চড়িতে হয়। শিলিগুড়ি হইতেই দার্জিলিং জেলা আরম্ভ হইয়াছে।

শিলিগুড়ি কথাটা আসিয়াছে 'শিলা' অর্থাৎ পাথর হইতে। এই অঞ্চল পাথরময়। শিলিগুড়ির পাশ দিয়া মহানদী বহিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেও ইহার বেশ খ্যাতি আছে। এখান হইতে তিব্বতীয় পশম, মৃগনাভি, শাল প্রভৃতি এবং কাঠ, কমলালেবু এবং চা নানাস্থানে চালান হয়।

শিলিগুড়ি হইতে শুরু হইয়াছে দার্জিলিং যাইবার রেলপথ। ইহা মাত্র দুই ফুট চওড়া। অবশ্য গাড়ীও সেই অনুপাতে ছোট। উঁচু-নীচু সঙ্কীর্ণ রেলপথ দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পাক খাইয়া এই রেলপথ গিরিচূড়ার অভিমুখে উঠিয়া গিয়াছে। গাড়ীগুলিকে অনেকটা খেলা-ঘরের গাড়ী বলিয়াই মনে হয়।

এখান হইতে একটি নূতন রেলপথ গিয়াছে আসামের দিকে। এই রেলপথ আসাম-লিঙ্ক নামে পরিচিত।

তরাই—রেলপথের দুইধারে হিমালয়ের পর্বতশ্রেণীর নিম্নভূমি তরাই। তরাইয়ের বুকে দিগন্তবিস্তৃত চা-বাগান ও ঘন বন। তরাইএর গভীর অরণ্যানী দেখিলে ভয়, বিস্ময় ও আনন্দ মনকে সমভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

প্রকৃতির এই জঙ্গল বাঘ, সিংহ, সাপ প্রভৃতি শত শত হিংস্র জন্তুর বিচরণ ক্ষেত্র। কিন্তু প্রকৃতির শ্যামল শ্রীর দিকে চাহিলে ঐ সকল ভয়ঙ্কর জন্তুর কথা মনে উদয়ই হয় না,—আনন্দের আতিশয্যে যেন

মন নাচিতে থাকে। দুপাশে সবুজ বন, উর্ধ্বে কালো পাহাড়। কোন কোন পাহাড়ের মাথায় আবার তুষার কিরীট, আর উপরে চন্দ্রাতপের মত নীল নভোপট।

পার্বত্য রেলপথ—শিলিগুড়ি হইতে সাত মাইল দূরে শুক্‌না স্টেশন। এই পর্যন্ত রেলপথ আসিয়াছে সমতল পথ দিয়া। কিন্তু শুক্‌নার পর হইতেই পাহাড়ের চড়াই বা খাড়া পথ। পথের এক দিকে নেপাল, আর অন্যদিকে সিকিম ও ভুটান।

শুক্‌নার পর হইতে প্রকৃতি দেবী যেন ক্রমশ অপরূপ সাজে দেখা দিতে থাকেন। রেলপথের দুপাশে শ্যামল বনানী, তাহাতে রং-বেরঙের ফুল, সেই সঙ্গে নানারকম বন-বিহঙ্গের মিলিত কলতান আগন্তুকের মনপ্রাণ মুগ্ধ করিয়া দেয়।

শিলিগুড়ি হইতে বারো মাইল দূরে রং টং। গাড়ী রং টং পৌঁছিবার পূর্বেই গাড়ীর গতিপথ আঁকা-বাঁকা হইয়া যায়, ঠিক সোজা খাড়াপথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া গাড়ী তখন চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতে থাকে। এই প্রথম চক্রটি '১নং লুপ' নামে পরিচিত। দার্জিলিংগামী গাড়ীকে এই ভাবে আরও তিনটি লুপ অতিক্রম করিতে হয়। এই সকল লুপ অতিক্রম করিবার সময়ে গাড়ী যে ভাবে চলে তাহা দেখিবার মত। ইঞ্জিনসুদ্ধ গাড়ীখানি তখন একবার গা বাহিয়া নীচের দিকে নামিতে থাকে। আবার পরমুহূর্তে উচ্চতর পথ ধরিয়া উপরের দিকে অগ্রসর হয়।

দার্জিলিং যাইবার পথে পাহাড়ের উপর 'পাগলা ঝোরা' নামে একটি স্রোতস্বতী। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে ইহার উন্মত্ত জলধারায় রেলপথ ধ্বসিয়া যাইত। ইহাতে রেল কোম্পানীর ভয়ানক ক্ষতি হইত। বিপুল ক্ষতি সহ্য করার পরে অবশেষে 'পাগলা ঝোরা'কে আয়ত্ত করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার জলধারাকে দুই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া স্রোতের প্রখরতা অনেকখানি সংযত করা হইয়াছে। পাগলা ঝোরা এখন শৃঙ্খলিত।

বাঙলা দেশের অমর কবি সত্যেন্দ্রনাথ 'পাগলা ঝোরা'র স্বাধীন উদ্দাম গতির এই দুর্দশা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত একটি কবিতায় 'পাগলা ঝোরা'র বিলাপ-সঙ্গীত ভাষা পাইয়াছে। পাগলা ঝোরার সে বিলাপ বড়ই করুণ।

'তোমরা কি কেউ শুনবে না গো পাগলা-ঝোরার দুঃখ-গাথা,
পাগলা বলে কর্বে হেলা, কর্বে হেলা মর্ম্ম ব্যথা,
জন্ম আমার হিম উরসে কুলে আমার তুল্য নাই,
সিন্ধুনদের সোদর আমি, গঙ্গাদিদির পাগলা ভাই।
তবুও শিকল পরিয়ে দিলে, রাখলে আমায় বন্দী বেশে,
ক্ষুদ্র মানুষ, স্বল্প আয়ু আমায় কিনা বাঁধলে শেষে।
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাকবে আরো,
রুদ্র তালে নাচব কবে তোমরা কেহ বলতে পারো।'

এই পাগলা ঝোরার কাছে জল লইবার জন্য গাড়ী থামে।

মহানদী : কার্শিয়াং

'পাগলা ঝোরা' ছাড়াইয়া মহানদী স্টেশন। সেখান হইতে প্রকৃতি দেবীর আবার এক নূতন শোভা চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। দেখা যায়, সম্মুখে সুদূরবিস্তৃত শ্যামল সমতল ক্ষেত্র। তাহাতে তিস্তা, মহানদী ও বালাসন নামে তিনটি স্রোতস্বতী তাহাদের রজত-শুভ্র জলধারা লইয়া বহিয়া চলিয়াছে।

ইহার কিছু পরেই কার্শিয়াং স্টেশন। ইহাও একটি বিখ্যাত শৈল-নিবাস ও স্বাস্থ্যকুঞ্জ।

ঘুম পাহাড়—কাঞ্চনজঙ্ঘা

কার্শিয়াং-এর চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে অগণিত চা-বাগান পাহাড়ের কঠিন কর্কশ দেহখানি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। হিমালয়ের কয়েকটি শৃঙ্গ এখান হইতেই প্রথম দেখা যায়।

কার্শিয়াং হইতে আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ঘুম স্টেশন। রেল স্টেশনের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান। রেলপথ এখান হইতে ক্রমশ নীচে নামিয়া অবশেষে দার্জিলিং-এ গিয়া পৌঁছিয়াছে।

ঘুম স্টেশনের পর দার্জিলিং পৌঁছিতে একটি লুপ অতিক্রম করিতে হয়।

এই লুপ হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘার যে অপরূপ সৌন্দর্য চোখে পড়ে তাহা অনির্বচনীয়।

কাঞ্চনজঙ্ঘা উচ্চতায় পৃথিবীর তৃতীয় শৃঙ্গ। ইহার তুষার-ধবল শৃঙ্গের দৃশ্য দার্জিলিং-এর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

দার্জিলিং-এর দৃশ্য

দার্জিলিঙের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য। আকাশের চেহারা এখানে সর্বদাই পরিবর্তনশীল। পাহাড়ের গায়ে আকাশের বুকে সর্বত্রই অনন্ত শোভা-বৈচিত্র্য। এখানে প্রায় সর্বত্রই নানা রকমের রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া থাকে। এত রকমারী ফুল ভারতের আর কোথাও ফোটে কিনা সন্দেহ। দেখিয়া মনে হয় যেন কোনও এক নিপুণ শিল্পী তাহার তুলিকার সাহায্যে এখানে-ওখানে উজ্জ্বল রঙীন চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছে। আকাশের বুকে মেঘের কি বিচিত্র খেলা! কোথাও মেঘগুলি মাথার উপর, কোথাও বা তাহারা নীচে বাতাসে ভর করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, আর তাহাদের উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া নানারকম রঙ ফুটিয়া উঠিতেছে। পর্বতগাত্রে ও মেঘের বুকে এইরূপ রঙের খেলা দর্শকের মনকে মুগ্ধ করে।

কোথাও দেখিতেছি মাথার উপর ছোট ছোট বাড়ী, কোথাও পায়ের তলায় ছবির মত বাড়ী। ইহা যেন এক রূপকথার রাজ্য।

'ম্যাল রোড' দার্জিলিং শহরে ভ্রমণের সর্বপ্রধান পথ। ইহার এক পাশে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সুদৃশ্য প্রাসাদ। তাহার অনতিদূরে প্রকৃতির স্বাভাবিক উদ্যান বার্চ হিল পার্ক।

ম্যাল রোডের নীচে বৌদ্ধ ভুটিয়াদের গোম্ফা বা মঠ। এই দেবস্থানের নিকটে ছোট বড় নানারকম বাঁশের মাথায় রঙ বেরঙের কাপড় নিশানের মত ঝুলানো। নিশানের কাপড়ে ভুটিয়া ভাষায় কতকগুলি কল্যাণ মন্ত্র লিখিত আছে। ভুটিয়াদের বিশ্বাস নিশান যখন পত্ পত্ করিয়া বাতাসে আন্দোলিত হইতে থাকে তখন ঐ কল্যাণ মন্ত্রগুলি তাহাদের দেবতার কাছে পৌঁছায়, দেবতা তাহাদের ভূতশান্তি করিয়া দেন।

হিমালয় অঞ্চলে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

গোম্ফার মধ্যে বুদ্ধদেব, বিষ্ণু, অমিতাভ ও গুরু পদ্মসম্ভব প্রভৃতির মূর্তি ও পট স্থাপিত আছে। প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা হইতেছে।

পার্বত্য বৌদ্ধদের গুরু পদ্মসম্ভবের কীর্তি প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। সুদূর বাঙলাদেশ হইতে এই পদ্মসম্ভব ও শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর ধর্মপ্রচারক হিসাবে এই অঞ্চলে আসিয়া যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন হিমালয় পর্বতশ্রেণীর এখানে সেখানে আজও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। ভক্তগণ আজও পদ্মসম্ভবকে বুদ্ধদেবের সহিত সমান আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন।

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত

দার্জিলিং-এর যাদুঘর এবং 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' দর্শনীয় জিনিসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বোটানিক্যাল গার্ডেনের অদূরে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। ক্ষীণকায়া কাগঝোরা নামক নদী তাহার চলিবার পথে হঠাৎ একস্থানে প্রায় এক শত ফুট নীচে আসিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছে। ইহাই ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।

পাগলা ঝোরার ন্যায় ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের দৌরাত্ম্যও এক সময়ে কম ছিল না। তখন তাহার প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তি দেখিয়া খুব সাহসী লোকও শিহরিয়া উঠিত। কিন্তু নিকটবর্তী পথঘাট ও

ঘরবাড়ী প্রভৃতি ইহার মধ্যে বারংবার ধ্বসিয়া পড়ায় অবশেষে ইহাও অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

টাইগার হিল

'টাইগার হিল' দার্জিলিং অঞ্চলের শোভার আকর। এখানে উঠিয়া দক্ষিণ দিকে তাকাইলে দেখা যায় সেই অঞ্চলের অন্যতম মনোরম শৈলাবাস কার্শিয়াং, সোনার বাঙলার শস্যশ্যামল সমতল ভূমি, আর তিস্তা, মহানদী ও মেচী নদীর রজত-শুভ্র সূক্ষ্ম জলধারা।

উত্তরপশ্চিমে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ এভারেস্ট।

এভারেস্টের আকর্ষণে কত ব্যক্তিই যে প্রাণপাত করিয়াছেন, টাইগার হিলে উঠিলে সর্বাগ্রে সেই কথাই মনে উদিত হয়। এই অজেয় গিরিশৃঙ্গকে অবশেষে পরাভব স্বীকার করিতে হইল আমাদেরই স্বদেশবাসী দুর্জয় বীর তেনজিং ও নিউজিল্যাণ্ডবাসী লৌহ-মানব এডমণ্ড হিলারীর নিকট।

'টাইগার হিল' হইতে সূর্যোদয়ের যে অপরূপ দৃশ্য দেখা যায় ভাষায় তাহা অবর্ণনীয়। পৃথিবীর কোন শোভার সহিতই বোধ হয় ইহার তুলনা হয় না। তরুণ সূর্য তাহার অরুণ ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া উর্ধ্বে উঠিতে থাকে, আর শুভ্র পর্বতশৃঙ্গে তাহা বিভিন্ন বর্ণে প্রতিফলিত হয়। সৌন্দর্যপিপাসু ব্যক্তিরা কত দূর দেশ হইতে কত কষ্ট সহ্য করিয়া এই টাইগার হিলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দর্শন করিতে আসেন।

বিশালকায় ওক বৃক্ষ, চাঁপা ফুল জাতীয় ম্যাগ্নোলিয়া, সু-উচ্চ পাইন এবং রোডোডেণ্ড্রন গাছ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লতাগুল্ম ও নানা জাতীয় ফার্ন, কত বিচিত্র বর্ণের ফুল, রাশি রাশি বন্য গোলাপ, 'ক্রিপ্টোমিরিয়া' জাতীয় ঝাউ বন, সুবিস্তৃত প্রান্তর, পর্বতের যত কিছু বৈচিত্র্য ও শোভাসম্পদ হিমালয়ের এই অংশে তাহার অনন্ত প্রাচুর্য।

সারা পৃথিবী ঘুরিয়া আসিলেও সোনার বাঙলার এই পার্বত্য নগরী কাহারও তুলনায় বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ বলিয়া মনে হইবে না। সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা হইতেও ভ্রমণকারীরা আসিয়া বাঙলার এই পার্বত্য নগরীর সৌন্দর্য-দর্শনে মুগ্ধ হন।

এই দার্জিলিং-এর 'স্টেপ এসাইড' নামক ইতিহাস-বিখ্যাত ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন বাঙলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

দার্জিলিং জেলার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান—কার্শিয়াং ও শিলিগুড়ির কথা আগেই বলিয়াছি। ইহা ছাড়া এ জেলার আর দুটি মাত্র স্থান উল্লেখযোগ্য,—মংপু ও কালিম্পং। মংপুতে সিঙ্কোনার চাষ হয়। ইহার ছাল হইতেই কুইনিন তৈয়ারী হয়। কালিম্পং শহরটি দার্জিলিং ও কার্শিয়াং-এর মতই স্বাস্থ্যকর। তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলে এই শহরের মারফৎ।

কোচবিহার

কোচবিহারের আদি নাম কোচবধূপুর। হুসেন শাহ যখন গৌড়াধিপতি তখন ক্ষত্রিয় দলপতি বিশ্বসিংহ এই অঞ্চলের কতকগুলি ছোট ছোট পার্বত্য জাতিকে নিজের অধীনে একত্র করিয়া এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়া গৌরব অর্জন করিয়াছেন এবং নিজেদের রাজ্যসীমা বহুদূর পর্যন্ত বাড়াইয়াছেন। এ গেল মুসলমান যুগের কথা।

তারপর এ দেশে আসিলেন ইংরেজরা। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভুটিয়ারা কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসে। তখন বিপন্ন কোচবিহাররাজ ভারতের বড়লাট হেস্টিংসের সাহায্যে ভুটিয়াদের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার পর বৎসর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত কোচবিহারের সন্ধিপত্র

স্বাক্ষরিত হয়। ফলে কোচবিহার ইংরেজদের অন্যতম মিত্ররাজ্যে পরিণত হয়।

ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া ভারত যখন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল তখন অন্যান্য বহু দেশীয় রাজ্যের ন্যায় কোচবিহারও ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে ইহা পরিণত হইল পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম জিলায়।

কোচবিহার শহর—কোচবিহারের মত এমন সুন্দর, এমন মনোরম শহর পশ্চিম বাঙলায় আর দুটি নাই। ইহার রাস্তাগুলি যেমন প্রশস্ত তেমনি পরিচ্ছন্ন। রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ সু-উচ্চ তরুরাজি সুশীতল ছায়াদানে পথিকের ক্লান্তি নিবারণ করার জন্যই যেন নিরলস ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

কোচবিহারের রাজপ্রাসাদটি দেখিবার মত। ভিক্টোরিয়া কলেজ, গ্রন্থাগার, রাণীর বাগান, সাগর দীঘি, মদনমোহনের মন্দির সবই নয়ন-মনোহর। এখানে রাসযাত্রার মেলা উপলক্ষে প্রচুর সুন্দর সুন্দর পুতুল আমদানি হয়।

প্রাচীন কামতা রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ—দিনহাটা কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বড় রেলওয়ে স্টেসন। এখান হইতে মাইল দশেক পশ্চিম-দিকে ধরলা নদীর তীরে প্রাচীন কামতা রাজ্যের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। কামতা কথাটি ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরেরই (কামরূপের) অংশ। মহাভারতে এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের উল্লেখ আছে।

কোচবিহারের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান হইল—মাথাভাঙ্গা, মেকলিগঞ্জ ও তুফানগঞ্জ।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা

বঙ্গ বিভাগের ফলে পুরাতন দিনাজপুর জিলার মাত্র দশটি থানা লইয়া পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঠিত হইয়াছে। ইহা সমগ্র দিনাজপুর জিলার তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এই জেলার সঙ্গে পরে যুক্ত হইয়াছে পূর্ণিয়া জেলার জাতীয় সড়কের পূর্ব দিকস্থ ৭৫৯ বর্গমাইল পরিমিত স্থান। এই অংশের লোকসংখ্যা প্রায় পৌনে তিন লক্ষ। সমগ্র পশ্চিম দিনাজপুর জেলার লোকসংখ্যা হইল প্রায় সোয়া সাত লক্ষ।

এই জেলার ভূমি সমতল ও উর্বর। আত্রাই, পুনর্ভবা, মহানন্দা প্রভৃতি এই জেলার প্রধান নদী। এখানে প্রচুর ধান জন্মে। ইহা ছাড়া পাট, আখ, তামাক, প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়।

এ জেলার মহকুমা দুইটি—বালুরঘাট (সদর) ও রায়গঞ্জ। বালুরঘাট আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত। ইহাই এখন জিলার সদর।

পূর্ণিয়া জেলার যে অংশ পশ্চিম দিনাজপুরের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে ইসলামপুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায় বাণিজ্যের ইহা একটি প্রধান কেন্দ্র।

এই জেলার বাণগড় একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। পুরাণেও বাণগড়ের উল্লেখ আছে। পুরাণ হইতে জানা যায় বাণ রাজার এক হাজার হাত ছিল। শিবের বরে তিনি নাকি যুদ্ধে অজেয় হন। তাঁহার কন্যা উষার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়। সেই সময়ে কোন কারণে তাঁহার সঙ্গে পার্থসারথির যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দৈত্যরাজ বাণের মৃত্যু ঘটে।

বাণগড় নাকি এই বাণরাজারই গড় অর্থাৎ দুর্গ ছিল।

এ গেল পৌরাণিক কাহিনী। এখন ইতিহাসের দিক্ হইতে বাণগড় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের উদ্যোগে বাণগড়ে খননকার্য চালান হয়। ইহার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে পাওয়া

গিয়াছে একটি বৌদ্ধ চৈত্য, একটি শিবমন্দির, কারুকার্যখচিত একটি স্তম্ভ এবং কাম্বোজ ও পাল রাজবংশের একটি করিয়া লিপি। ইহা ছাড়া অসংখ্য মূর্তি, মন্দির, প্রাসাদের ভগ্নপ্রস্তর, ইষ্টকখণ্ড প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আবিষ্কৃত জিনিসগুলি পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পালবংশীয় দুর্বল রাজা দ্বিতীয় বিগ্রহপালকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কাম্বোজগণ উত্তরবঙ্গ অধিকার করেন। কিন্তু পরে বিগ্রহপালের বীরপুত্র প্রথম মহীপাল কাম্বোজ-রাজকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিয়া লন। এ বিষয়ে পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

বাঙলার কথা

পার্বত্য ত্রিপুরা

ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য ত্রিপুরা ছিল ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইলে অন্য শত শত দেশীয় রাজ্যের ন্যায় পার্বত্য ত্রিপুরাও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে পার্বত্য ত্রিপুরায় রাজশাসনের অবসান হইয়াছে। ইহা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সাক্ষাৎ শাসনাধীনে।

পার্বত্য ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস—পার্বত্য ত্রিপুরায় যে রাজবংশ রাজত্ব করিত তাহা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত। এই বংশের আদি পুরুষ দ্রুহ্যু। দ্রুহ্যু হইতে আরম্ভ করিয়া ইঁহাদের বংশাবলীতে ধারাবাহিক ভাবে ১৮৪ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। এককালে পার্বত্য ত্রিপুরার রাজবংশের খ্যাতি ছিল গৌরবোজ্জ্বল। পার্বত্য জাতিরাও ত্রিপুরা রাজবংশের বশ্যতা স্বীকার করিত। আরাকানী আর মগেরা চিরকাল স্বাধীনতাপ্রিয়। তাহারা কোনদিন কাহারও কাছে মাথা নত করে নাই। কিন্তু তাহাদিগকেও এক সময়ে ত্রিপুরা-রাজ্যের শাসনদণ্ডের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাস লিখিবার প্রথার তেমন প্রচলন ছিল না। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থখানির নাম 'রাজমালা'। রাজমালার ঐতিহাসিক মর্যাদা অসামান্য।

রাজমালা ত্রিপুরা রাজবংশের পুরুষানুক্রমিক ইতিহাস। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশ নানাবিধ কিংবদন্তী এবং কল্পনাপ্রসূত গল্পাদিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং এই অংশকে কোনমতেই খাঁটি ইতিহাস বলা চলে না। কিন্তু ইহার বাকী দুই ভাগ নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বলিয়া স্বীকৃত। দ্বিতীয় ভাগ শুরু হয় ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে।

ত্রিপুরা রাজবংশের রাজচিহ্ন ত্রিশূল এবং চন্দ্র। এই বংশের রাজা ত্রিলোচনের জন্ম শিবাংশে হইয়াছিল বলিয়া শিবের ত্রিশূল রাজচিহ্নরূপে গৃহীত হইয়াছে, এবং ইঁহারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া 'চন্দ্র'ও রাজচিহ্নরূপে স্থান পাইয়াছে। রাজা ত্রিলোচনপালের যুগ ছিল মহাভারতের যুগ। তিনি নাকি পাণ্ডবদের সমসাময়িক, যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া পাণ্ডবদের রাজসভায় তিনি যোগদানও করিয়াছিলেন।

বীরাঙ্গনা ত্রিপুরাসুন্দরী—ত্রিপুরা রাজবংশের প্রথা অনুসারে ত্রিপুরারাজ্যে রাজ-জামাতাই সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইতেন। এই প্রথার মূলে একটি বিশেষ কারণ আছে। রাজা ছেংথোম্পার আমলে ত্রিপুরা একবার গৌড়রাজ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। রাজা ছেংথোম্পা ছিলেন নিতান্তই কাপুরুষ। গৌড়েশ্বরের সেনাপতি হীরাবন্ত খাঁর নাম শুনিয়াই তিনি ভয়ে হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন —এ যুদ্ধে আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত। সুতরাং যুদ্ধ না করিয়া বশ্যতা স্বীকার করাই আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

রাজার এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী যারপরনাই ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি রাজাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি কোন্ মুখে এমন কথা বলিলেন! আপনার কোন পূর্বপুরুষ বিনাযুদ্ধে ক্ষুদ্র একখণ্ড জমিও কি কখনো আক্রমণকারীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন? আপনার ইচ্ছা হয় আক্রমণকারীর সঙ্গে সন্ধি করিয়া আপনি বশ্যতা স্বীকার করুন। কিন্তু দেহে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি অবশ্যই যুদ্ধ চালাইয়া যাইব।" এই বলিয়া রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী যখন সত্য সত্যই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন তখন বাধ্য হইয়া রাজাও যুদ্ধে যোগ দিলেন।

এই যুদ্ধে উভয়দলের প্রচুর লোকক্ষয় হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হইলেন ত্রিপুরারাজ। বিজয়ী রাজা রণক্লান্ত অবস্থায় যখন বিশ্রাম করিতে চাহিলেন, তখন দেখিলেন যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র মৃতদেহ পড়িয়া আছে, কোথাও এতটুকু স্থান নাই যে তিনি বসিতে

পারেন। এ অবস্থায় কি করিবেন এরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার জামাতা এক মৃতহস্তীর দাঁত ভাঙ্গিয়া আনিয়া তাহাই পাতিয়া রাজাকে বসিতে দিলেন। রাজা জামাতার শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং তাঁহাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন। তখন হইতে রাজ-জামাতা মাত্রই এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইতেন।

ত্রিপুরায় বাঙ্গালী—পূর্বে ত্রিপুরার অধিবাসীরা বাঙ্গালীদের সুনজরে দেখিত না। এমন কি রাজ্যমধ্যে বাঙ্গালী দেখিলেই তাহারা হত্যা করিত। কিন্তু মহারাজা রত্নফা বাঙ্গালীদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং আদর করিতেন। তিনি দশ হাজার ঘর বাঙ্গালীকে আপনার রাজ্যে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং ত্রিপুরায় তাহাদের বসবাসের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তখন হইতেই এখানে বাঙ্গালীর প্রভাব শুরু হয় এবং বাঙলা দেশের মতই ত্রিপুরার সভ্যতা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ত্রিপুরার রাজারা সকলেই ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। এখানকার রাজ্যের সরকারী দলিলপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় রাজকীয় কার্য বাঙলা ভাষাতেই পরিচালিত হইত।

ত্রিপুরারাজ রত্নফাকে গৌড়েশ্বর সুলতান সামসুদ্দীন 'মাণিক্য' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন এবং তখন হইতে ত্রিপুরার প্রত্যেক রাজাই বংশানুক্রমে এই উপাধি ধারণ করিতেন।

আগরতলা—স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী ছিল আগরতলা। ইহা আখাউরা জংসন হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। মোটর বাস বা ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া আখাউরা হইতে আগরতলায় যাওয়া যায়।

আগরতলা আধুনিক যুগের আদর্শ নগরী। ইহা অবশ্য অন্যান্য বড় বড় শহরের মত জনবহুল নয়। কিন্তু শহরের রাস্তা-ঘাট যেমন প্রশস্ত তেমনি পরিচ্ছন্ন, বাড়ীগুলিও সুসজ্জিত, সুরুচিসম্পন্ন। শহরের নানাস্থানে স্বচ্ছজলপূর্ণ দীঘি ও তরুবীথিকাবহুল উদ্যান থাকিয়া ইহার শোভা শতগুণ বাড়াইয়াছে।

রাজপ্রাসাদ 'উজ্জয়ন্ত' নামটি যেমন সুন্দর, তেমনি উহার চেহারাও বেশ মনোরম। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন পটে আঁকা ছবি।

ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশই পাহাড়-পর্বত ও বনজঙ্গলে পূর্ণ। এই সব জঙ্গল অসংখ্য বাঘ, হাতী, হরিণ, মহিষ, সাপ প্রভৃতির আবাসভূমি। এই রাজ্যে খনিজ সম্পদও প্রচুর।

ত্রিপুরার বয়ন-শিল্পের খ্যাতি অনেক দিনের।

ত্রিপুরেশ্বরী—ত্রিপুরা রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রিপুরেশ্বরী। যেখানে দেবীর মন্দির সেখানে নাকি সতীর একটি চরণ পড়িয়াছিল।

পূর্ব পাকিস্তান

পূর্ব পাকিস্তান

পূর্ব পাকিস্তানে ৩টি বিভাগ: (১) ঢাকা (২) চট্টগ্রাম ও (৩) রাজসাহী।

ঢাকা বিভাগে জিলা ৪টি:—(১) ময়মনসিংহ (২) ঢাকা (৩) ফরিদপুর ও (৪) বাখরগঞ্জ।

চট্টগ্রাম বিভাগে জিলা ৫টি:— (১) চট্টগ্রাম (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম (৩) নোয়াখালি (৪) ত্রিপুরা ও (৫) শ্রীহট্ট (পূর্বতন শ্রীহট্ট জিলার অধিকাংশ)

রাজসাহী বিভাগে জিলা ৮টি:—(১) রাজসাহী (পূর্বতন মালদহের ⅓ সহ) (২) রংপুর (৩) দিনাজপুর (পূর্বতন দিনাজপুরের ⅔ অংশ ও জলপাইগুড়ির সামান্য অংশ) (৪) পাবনা (৫) বগুড়া (৬) যশোহর (পূর্বতন যশোহরের বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা বাদে) (৭) কুষ্টিয়া (পূর্বতন নদীয়ার পূর্বাংশ) ও (৮) খুলনা।

সীমা—পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরে পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা ও আসাম রাজ্য; পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য, আসাম ও ব্রহ্মদেশ; পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার।

প্রাকৃতিক গঠন—প্রাকৃতিক গঠন অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানকে তুইটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়:—(১) পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পলিগঠিত সমতলভূমি, (২) উত্তর ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উচ্চভূমি।

(১) **পলিগঠিত সমতলভূমি**—পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও উহাদের অসংখ্য শাখা ও উপনদীর পলি দ্বারা এই অঞ্চল গঠিত। সুতরাং এই অঞ্চল সমভূমি। তবে ময়মনসিংহ জিলার উত্তরাংশ গারো পাহাড়ের সন্নিকটবর্তী বলিয়া সেখানকার ভূমি কিছুটা উঁচু। ঢাকা জিলার সামান্য কিছু জায়গাও উঁচু। উহা গড় নামে অভিহিত।

(২) **উত্তর ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উচ্চভূমি**—পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তর ত্রিপুরা ও লুসাই পাহাড়ের নীচের দিকের অংশ পর্বতময়। মৌসুমী বায়ুর জন্য এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। কিন্তু ভূমি অনুর্বর বলিয়া এখানে ভাল ফসল জন্মে না। এই অঞ্চল চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য দ্বারা পূর্ণ।

নদনদী—পূর্ব পাকিস্তানে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রধান নদী। এখানে গঙ্গা পদ্মা নামে অভিহিত। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনা গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার (ব্রহ্মপুত্রের) মূলশাখা ভৈরববাজারের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া চাঁদপুরের নিকট পদ্মার সহিত মিশিয়াছে। সুরমা নদী ও বরাক নদী মিলিত হইয়া মেঘনা নামে পদ্মার সঙ্গে মিশিয়াছে। মেঘনা ও পদ্মার মিলিত স্রোতও মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

তিস্তা, করতোয়া, আত্রেয়ী (আত্রাই), মধুমতী, ইছামতী, তেঁতুলিয়া—এগুলিও পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য নদী। তিস্তা, আত্রেয়ী ও করতোয়া, উত্তর বঙ্গের এই নদী তিনটিই যমুনায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীগুলি নৌবাহনযোগ্য। ফলে বহু নৌকা ও স্টীমার যাত্রী ও মাল লইয়া এই নদীগুলি দিয়া সর্বদা যাতায়াত করে।

কৃষিদ্রব্য—পূর্ব পাকিস্তানের প্লাবিত নিম্নভূমি অঞ্চলে প্রচুর ধান ও পাট জন্মে। পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় পৃথিবীর আর কোন দেশেই এত পাট জন্মায় না। পূর্ব পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে তামাক, ইক্ষু, তৈলবীজ ও নানাবিধ রবিশস্য জন্মে। সমুদ্র উপকূলে জন্মে প্রচুর নারিকেল সুপারি ও তাল।

শিল্প—শিল্পের দিক্ হইতে পূর্ব পাকিস্তান আদৌ উন্নত নয়। তবে ইদানীং সেখানে কিছু কিছু শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। নারায়ণগঞ্জ,

া, খুলনা প্রভৃতি স্থানে সর্বসুদ্ধ ৯টি কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। ফলে এখন পূর্ব পাকিস্তান কাপড়ের দিক হইতে প্রায় স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে পাটের কলের সংখ্যা এখন ১১টি। কলগুলির মধ্যে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিল্ একটি অতি বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান। পূর্ব পাকিস্তানে ৬টি চিনির কল আছে এবং কাগজের কল আছে ১টি। চন্দ্রকোণার কাগজের কলটি পাকিস্তানের একটি গর্বের বস্তু।

কয়েক প্রকার কুটির শিল্পে পূর্ব পাকিস্তান বেশ উন্নত। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল সোনারূপার শিল্প, শঙ্খ শিল্প, তাঁত শিল্প ও চর্ম শিল্প। কাপড় কাচা সাবান তৈরীর ব্যাপারেও পূর্ব পাকিস্তান যথেষ্ট উন্নত।

পূর্ব পাকিস্তান পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম জনবহুল অঞ্চল। প্রতি বর্গমাইলে ৭৯২ জন লোকের বাস। অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে।

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা জেলা

পূর্ব পাকিস্তানের জেলাগুলির মধ্যে ঢাকার স্থান সকলের উপরে। শিক্ষাদীক্ষায়, ঐশ্বর্যে, রাজনৈতিক চেতনায়, দেশ-সেবায়, এক কথায়, সর্ববিষয়েই ঢাকা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয়।

বিক্রমপুর : এই জেলার বিক্রমপুর একটি প্রাচীন ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। বিক্রমপুর পরগণার* সীমানার বারবার পরিবর্তন হইয়াছে। ইহার কিছু অংশ ফরিদপুরের অন্তর্গত। বিক্রমপুরের খ্যাতি পাল এবং সেন রাজাদের আমল হইতে। বিক্রমপুরী বিহার নামক বিখ্যাত বিহারটি পাল রাজাদের কীর্তি। সম্ভবতঃ ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পালরাজ ধর্মপালের আনুকূল্যে। এই বিহারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহু জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপক। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র এবং ইন্দ্রভূতির কন্যা লীলাবজ্র।

আধুনিক যুগেও বহু মনীষীর জন্ম হইয়াছে এই বিক্রমপুর পরগণায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্বনামধন্যা সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, সোহহং স্বামী, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি দিক্‌পাল এই সুপ্রাচীন ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পবগণার অধিবাসী ছিলেন।

রামপাল—ইহা প্রাচীন বিক্রমপুর সরকারের বা বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। প্রবাদ, এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন পালবংশীয় রাজা রামপাল।

---

* পদ্মানদী বিক্রমপুর পরগণাকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তরাংশ ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত এবং দক্ষিণাংশ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত।

পাল এবং পরবর্তী সেন রাজাদের আমলে ইহা একটি সমৃদ্ধ ও বিশাল নগর ছিল। বল্লালসেন নদীয়া ত্যাগ করার পর হইতে এই স্থান হইতে রাজ্য শাসন করিতেন। এখানে পাল যুগের বহু শিল্প দ্রব্য ও প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। বল্লালসেনও এখানে বহু সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। বল্লালবাড়ী, বল্লাল দীঘি প্রভৃতি সেন যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। বল্লালবাড়ী নামে পরিচিত বল্লালসেনের প্রাসাদ এখন একটি প্রকাণ্ড ঢিবি মাত্র। বল্লালদীঘি ছিল দৈর্ঘ্যে এক মাইল এবং প্রস্থে ৫০০ গজ। গত শতাব্দীতে এই অঞ্চলে এক কৃষক মাটি খুঁড়িতে গিয়া অন্ততঃ ৭০ হাজার টাকা মূল্যের এক হীরকখণ্ড পাইয়াছিল—এই ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় সেই যুগে এই অঞ্চলটি কিরূপ ঐশ্বর্যশালী ছিল। রামপালের নিকট ধামদ গ্রামে একখানি সোনার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহার পাতার সংখ্যা ২৪। প্রতিটি পাতার ওজন ৩০ ভরি সোনা।

রামপালের উত্তরে অবস্থিত কজি-কসবা গ্রামে আদম শহীদ অথবা বাবা আদমের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসজিদের দুটি প্রকাণ্ড পাথরের স্তম্ভ বল্লালসেনের গদা নামে পরিচিত। মসজিদটি পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হইয়াছিল। ইহার ঢাকার প্রাচীনতম মসজিদ। কাহারও কাহারও মতে রামপাল বজ্রযোগিনী গ্রামের একটি অংশ।

বজ্রযোগিনী :

"বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।"

এই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের জন্ম হয় রামপালের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বজ্রযোগিনী গ্রামে। দশম শতকের শেষভাগে গৌড় রাজ-পরিবারে তাঁহার জন্ম। ধনৈশ্বর্য কিম্বা সাংসারিক সুখভোগের প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল জ্ঞানার্জন। যৌবনে তিনি শিক্ষালাভ করেন

বরেন্দ্রভূমির সুসন্তান এবং বিক্রমশীল বিহারের আচার্য জেতারির কাছে। পরে তিনি সুমাত্রায় গিয়া প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পাণ্ডিত্যের খ্যাতির জন্য তিনি বিক্রমশীল মহাবিহারের প্রধান আচার্যের পদ লাভ করেন। ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহার বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছড়াইয়াছিল। তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দীর্ঘ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে গমন করেন এবং সেখানেই পরিণত বয়সে এই জ্ঞানতপস্বী দেহরক্ষা করেন। বিক্রমপুরের এই কৃতী সন্তানের খ্যাতি একদিন সুমাত্রা হইতে তিব্বত পর্যন্ত সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল—এ কথা মনে করিয়া বাংলার অধিবাসীরা আজিও গর্ববোধ করিয়া থাকেন।

পাল রাজাদের আমলে বজ্রযোগিনী তান্ত্রিক সাধনার কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত ছিল। এই স্থানে প্রাচীন যুগের বহু বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। বজ্রযোগিনী ভৈরবের শক্তি; পরে এই দেবী ছিন্নমস্তা নামে পরিচিত হন। নেপালে এখনও বজ্রযোগিনীর মন্দির আছে। ব্রিটিশ আমলে বজ্রযোগিনী গ্রাম শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে খুবই উন্নত ছিল। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ে এক হাজারের বেশী ছাত্র অধ্যয়ন করিত এবং এই সময় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনেও এই গ্রামের দান ছিল অসাধারণ।

আধুনিক যুগেও বহু বিদ্বান্ ও কৃতী ব্যক্তির জন্মস্থান রূপে এই গ্রামটি যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়ে এই গ্রামে কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত প্রসন্ন তর্করত্ন ও কবি আনন্দ মিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁহারা কলিকাতায় না আসার জন্য অনেকেই হয়তো তাঁহাদের নাম জানেন না। ইহার পরবর্তী যুগেও অনেকেরই নাম করা যায়, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী স্বদেশপ্রেমিক

শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ, বিখ্যাত গণিতবিদ্ স্বর্গত সোমেশচন্দ্র বসু প্রভৃতি। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী স্বর্গত মোহিনীমোহন জ্যোতিঃশাস্ত্রীর নামও উল্লেখযোগ্য। বর্তমান যুগেও অনেকেরই নাম করা যায়, তাঁহাদের মধ্যে 'যুগান্তর' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক কবি-সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, বিখ্যাত প্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও সুসাহিত্যিক শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুবর্ণগ্রাম—সুবর্ণগ্রাম সোনারগাঁও নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। এখন নারায়ণগঞ্জের পূর্বদিকে প্রায় আট মাইল দূরে যে স্থানটি পালাম নামে পরিচিত তাহাই এককালে সোনারগাঁও নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার মধ্যস্থলে।

মুসলমান আমলের প্রথম দিকে দীর্ঘদিন ধরিয়া সোনারগাঁও ছিল পূর্ব বঙ্গের রাজধানী। সে যুগে এখানে একটি টাকশালও ছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে যখন বাঙলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় তুলিয়া আনা হইল তখন স্বভাবতই সোনারগাঁও-এর প্রাধান্য লুপ্ত হইল। কালক্রমে এই অঞ্চল বন-জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এখনও এখানে অনেক প্রাচীন গড় ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঢাকা

ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস—১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার সুবাদার ইসলাম খাঁ জাহাঙ্গীরনগর নাম দিয়া বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকায় বাঙলার রাজধানী স্থাপন করিলেন। কিন্তু শাহজাদা সুজা যখন বাঙলার সুবাদার হইয়া আসিলেন তখন তিনি ঢাকা হইতে তাঁহার রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত করিলেন। সম্রাট্ আওরঙজেবের আমলে মীরজুমলা বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া পুনরায় ঢাকাতে রাজধানী লইয়া আসিলেন (১৬৬০)। মীরজুমলার মৃত্যুর পরে সায়েস্তা খাঁ বাঙলার সুবাদার হইয়া আসিলে ঢাকার সৌভাগ্যরবির উদয় হইল।

তাঁহার চেষ্টায় ঢাকা ঐশ্বর্যে, সম্পদে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। সায়েস্তা খাঁর পরে বাঙলার সুবাদার হইয়া আসিলেন আওরঙজেবের পৌত্র আজিম্ উস্ সান। আগেই বলিয়াছি দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খাঁর সঙ্গে তাঁহাব তীব্র মনোমালিন্য শুরু হয়। ইহার ফলে তিনি তাঁহার দপ্তর মুর্শিদাবাদে তুলিয়া লইয়া গেলেন। অচিরেই মুর্শিদাবাদ বাঙলার রাজধানী বলিয়া গণ্য হইল।

ঢাকা হইতে বাঙলার রাজধানী উঠিয়া গেলে ঢাকার শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য একটি পদের সৃষ্টি হইল। উহার নাম নায়েব নাজিম, বা নবাব নাজিম।*

ঢাকা নাম কেন হইল—ঢাকার নাম কেন ঢাকা হইল এ সম্বন্ধে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে। ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির সুবিখ্যাত। অনেকে বলেন এই ঢাকেশ্বরী হইতেই ঢাকা নামের উৎপত্তি। আবাব অনেকে বলেন, ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই কারণে ঢাকাব নামানুসারে ঢাকেশ্বরী নাম হইয়াছে। আবার অনেকে বলেন, ঢাকাতে নাকি সতীর মাথার মুকুটের 'ডাক সাজের' খানিকটা পড়িয়াছিল। সেই ডাক হইতে ডাকা এবং ডাকা শব্দ হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি।

ঢাকার প্রাচীন কীর্তি—ঢাকা নগরীর প্রাচীন কীর্তিগুলির কিছু কিছু এখনও বর্তমান।

ঢাকা শহরে প্রাচীন মস্‌জিদের অভাব নাই। চক বাজারে যে বড় মস্‌জিদটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সায়েস্তা খাঁর আমলে নির্মিত হইয়াছিল। ঢাকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মস্‌জিদটি বেগম বাজারে অবস্থিত। ইহা মুর্শিদ কুলী খাঁর কীর্তি। বড় কাটরা এবং ছোট কাটরা মুসলমান আমলের দুটি বৃহৎ সৌধ। দুটিই সরাইখানা,

* বর্তমানে ঢাকার নবাব পরিবারের লোক বলিয়া যাঁহাবা পরিচিত তাঁহাদের সঙ্গে এই নবাব-নাজিমদের কোন সম্পর্ক নাই, ইঁহারা কাশ্মীরের মুসলমান।

প্রথমটি তৈয়ারী করান শাহজাদা সুজা এবং দ্বিতীয়টি তৈরী করান সায়েস্তা খাঁ। লাল বাগের কেল্লা মুঘল আমলের আর একটি কীর্তি। আলমগীরের পৌত্র আজম শাহ্ যখন বাঙলার সুবাদার হইয়া ঢাকায় বাস করিতেছিলেন তখন হইতে এই দুর্গটির নির্মাণ কার্য শুরু হয়। তারপর সায়েস্তা খাঁর আমলে লালবাগের কেল্লার নির্মাণ কার্য অনেকদূর অগ্রসর হয়।

বর্তমানে এই সুবিখ্যাত দুর্গটির শুধু সু-উচ্চ প্রাচীরগুলি এবং তোরণ সগর্বে দাঁড়াইয়া আছে, আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই।

বুড়ীগঙ্গার অপর পাড়ে জিঞ্জিরা নামক গ্রামে একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ এই প্রাসাদটি তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় হত্যার পরে তাঁহার মাতা, বেগম এবং শিশু কন্যাকে বন্দী করিয়া এখানে কিছুদিন রাখা হইয়াছিল।

ঢাকার পুরাতন কীর্তির মধ্যে লালবাগ মস্‌জিদ এবং হুসেনী দালানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান ঢাকা—ঢাকা বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। পাকিস্তান সৃষ্টির পরে এখানে একটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাকিস্তান পার্লামেণ্টের অধিবেশনও এখানে বৎসরে একবার করিয়া বসে। সুতরাং এই নগরীর মর্যাদা বড় সামান্য নয়।

ঢাকার কতকগুলি জিনিস, যেমন ঢাকাই শাড়ী, ঢাকাই মস্‌লিন, ঢাকাই শাঁখা, ঢাকাই অলঙ্কার, ঢাকাই মিষ্টান্ন প্রভৃতির খ্যাতি দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—রমনার জনবিরল শান্ত পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিশাল অট্টালিকা সমূহ সত্যই দেখিবার মত। সমগ্র কলিকাতা খুঁজিলেও এরূপ সুবিশাল, অথচ নয়ন-মনোহর বিদ্যালয়-ভবন কোথাও চোখে পড়িবে না। পূর্বে এই

বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ছিল শুধু ঢাকা শহরের সীমানার মধ্যেই নিবদ্ধ। কিন্তু এখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলি ব্যতীত অন্য প্রত্যেকটি জেলাই এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এক সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় বহু সুপণ্ডিত অধ্যাপকের সমাবেশে সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

যাদুঘর—বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটেই ঢাকার যাদুঘর। এখানে বিক্রমপুর এবং পূর্ববঙ্গের আরও বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক প্রাচীন মূর্তি প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত আছে।

রমনার মাঠ—রমনার সবুজ প্রান্তর দেখিতে সত্যই অতি সুন্দর। রমনার বাড়ীগুলি সুদৃশ্য পুষ্পবীথি-সমন্বিত। প্রত্যেক বাড়ীতেই ফুলের বাগান আছে। বাড়ীগুলি দেখিতেও প্রায় একই রকমের।

দেবস্থানঃ ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরবাটির খ্যাতি ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পরেই। ইহা বারভূঞাদের অন্যতম চাঁদরায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ আছে।

রমনার বুড়া শিব বাড়ী—অনেকে বলেন, স্বয়ং শঙ্করাচার্য বুড়া শিবের প্রতিষ্ঠাতা। এ কথা সত্য হইলে এই শিব-মন্দিরের বয়স হাজার বছরের‌ও অনেক বেশী।

রমনার কালীবাড়ী—কথিত আছে, ব্রহ্মানন্দ গিরি নামে জনৈক সাধক এই কালীগৃহের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নাকি প্রথম জীবনে অত্যাচারী দুর্বৃত্ত ছিলেন। পরে অনুতপ্ত হইয়া তিনি সাধনায় মগ্ন হন। ব্রহ্মানন্দের বিশ্বাস ছিল এই যে, যে-সব পাপ কাজ তিনি করিয়াছেন তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী দেবতারা। অতএব তিনি তাঁহার আরাধ্যা দেবীকে কঠোর শাস্তি দিবেন। দিন-রাত সাধনা করিয়া ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং কালীকে বলিলেন, 'তুমি এই পাথরটা বহিয়া লইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চল।' দেবী বলিলেন, "বেশ, পাথর তুলিয়া লইলাম। আমি তোমার দেওয়া শাস্তি শুধু ততদিনই স্বীকার করিয়া লইব, যতদিন তুমি আমাকে ভক্তি করিবে

ঐকান্তিকতার সঙ্গে। একটু অবহেলা করিয়াছ কি তুমি আমাকে আর জীবনে কখনও দেখিতে পাইবে না।' এই কথা বলিয়া দেবী ভক্তের দেওয়া পাথর ঘাড়ে করিয়া ব্রহ্মানন্দের পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন। এইরূপ বহুক্ষণ চলিল। রমনার মাঠে যেই তাঁহারা দু'জনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি ব্রহ্মানন্দের মনে দেবীর প্রতি অবজ্ঞার ভাব জাগিয়া উঠিল। সেই মুহূর্তে ব্রহ্মানন্দ সবিস্ময়ে দেখিলেন, দেবী অদৃশ্য হইয়াছেন। পাথরটা নির্জন প্রান্তরে পড়িয়া আছে।

তারপর এই স্থানেই নির্মিত হইল কালীবাড়ী। এখনও কালী-বাড়ীর প্রাঙ্গণে পাথরটা পড়িয়া আছে। ইহা ব্রহ্মানন্দের সিদ্ধাসন নামে পরিচিত।

ঢাকার আর একটি প্রাচীন দেবস্থান নবাবপুরের **লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির**। ঢাকার সুবিখ্যাত বসাক বংশের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণদাস মুৎসুদ্দি নামে এক ব্যক্তি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

ঢাকার মস্‌লিন—ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি প্রাচীন গ্রীস, রোম, প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেকালে মসলিন ছিল এক অতি মহার্ঘ বিলাসের বস্তু। একখানি মসলিনের মূল্য ছয় সাত হাজার টাকা পর্যন্ত ছিল বলিয়া শোনা যায়। মস্‌লিনের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। একগজ চওড়া এবং কুড়ি হাত লম্বা একখানি মস্‌লিনের কাপড় একটি আঙটির মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া অনায়াসে এদিক হইতে ওদিকে টানিয়া বাহির করা যাইত। মাপিয়া দেখা গিয়াছে এক পোয়া ওজনের মসলিনের কাপড়ের সূতা লম্বায় আড়াই শত মাইল দীর্ঘ। সম্রাট্ শাহজাহান এবং আওরঙজেবের আমলে মসলিনের আদর ছিল খুবই বেশী। মসলিন যাহাতে ভারতের বাহিরে না যায়, এ সম্বন্ধে সম্রাটেরা খুব হুঁসিয়ার ছিলেন।

অন্যান্য শিল্প—মস্‌লিন আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। তবে ঢাকাই শাড়ীর কদর এখনও বাঙলার সর্বত্র। শঙ্খের শিল্পও ঢাকার একটি গর্বের জিনিস।

নারায়ণগঞ্জ—শীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত এই বন্দরটি পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। ইহা একটি বড় রেলওয়ে এবং স্টীমার স্টেসন। এখানকার আদমজী জুট মিল একটি বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান।

এই শহরটির বয়স প্রায় দুই শত বৎসর। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি বড় লবণের গোলা ছিল। তখন চীনা ও মগ বণিকেরা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এখানে আসিত। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বন্দর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কিছুদিন পরেই ইহা একটি মহকুমা শহর বলিয়াও পরিচিত হইয়া উঠে।

প্রাচীন কীর্ত্তি—সুবিখ্যাত বারভূঞা ঈশা খাঁর প্রপৌত্র মনোয়ার খাঁ নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত নবীগঞ্জ পল্লীতে একটি বিরাট সৌধ নির্মাণ করেন। হজরত মহম্মদের পদচিহ্নযুক্ত একখানি প্রস্তর খণ্ড ইহার মধ্যে রক্ষিত আছে।

জলদুর্গ—নারায়ণগঞ্জে দুইটি জলদুর্গ আছে। ইহার মধ্যে একটির নাম সোনাকান্দার দুর্গ। ইহা গম্বুজের মত গোল। বর্ষাকালে নৌকায় করিয়া ইহা প্রদক্ষিণ করা যায়। ইহার প্রাচীর গাত্রে কোথাও এক হাত কোথাও বা দুই হাত অন্তর কামান রাখিবার গর্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছিদ্রপথে কামানের মুখ উন্মুক্ত রাখিয়া শত্রুদের প্রতিরোধ করা হইত। বাদশাহ আলমগীরের আমলে সুবাদার মীরজুমলা বাঙলার রাজধানী ঢাকা নগরীকে সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এই জলদুর্গ স্থাপন করেন।

ভৌমিক ঈশা খাঁ—নারায়ণগঞ্জের সন্নিকটে ইতিহাস-বিখ্যাত খিজিরপুর গ্রাম। এই গ্রামে ছিল ঈশাখাঁর রাজধানী। ঈশা খাঁ প্রথম জীবনে ছিলেন হিন্দু রাজপুত। পরে তিনি ইসলামধর্মে দীক্ষালাভ করেন। সেনা বিভাগে প্রবেশ করিয়া তিনি স্বীয় যোগ্যতা বলে আড়াইহাজারী মনসবদার হন। অতঃপর তিনি শক্তি সঞ্চয় করিয়া একটি রাজ্য স্থাপন করেন।

শ্রীপুরের ভৌমিক চাঁদ রায় ও কেদার রায় প্রথমে ঈশা খাঁর পরম বন্ধু ছিলেন। কিন্তু যেদিন ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করেন সেই দিন এই ভুঞা বংশ ঈশা খাঁর চরম শত্রুতে পরিণত হইলেন। চাঁদ রায় দুঃখের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া কিছু দিনের মধ্যেই প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কেদার রায় প্রতিশোধ লইবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন।

এদিকে ঈশা খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেই দিল্লীশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দমন করার উদ্দেশ্যে শাহবাজ খাঁকে সসৈন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শাহবাজ খাঁ ঈশা খাঁর সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না। অবশেষে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠান হইল বহু-সমরবিজয়ী দুর্ধর্ষ নায়ক মানসিংহকে। কিছুদিন যুদ্ধের পর উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। অতঃপর ঈশা খাঁ বাইশটি পরগণার জমিদারী লইয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রজা শাসন করিতে লাগিলেন।

খিজিরপুরে একটি মমর মূর্তি আছে। অনেকে বলেন সেটি নাকি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কন্যার প্রতিকৃতি। খিজিরপুর হইতে ছয় মাইল দূরে দেওয়ানবাগে ঈশা খাঁর দুর্গ ছিল। সেখানকার মাটি খুঁড়িয়া সাতটি কামান পাওয়া গিয়াছে। এগুলির মধ্যে একটি কামান সের শাহের আমলের।

মুন্সীগঞ্জ—এই মহকুমা শহরটি নারায়ণগঞ্জ হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। সুবিখ্যাত বিক্রমপুর পরগণা এই মহকুমারই অন্তর্গত। এখানেও একটি জলদুর্গ আছে। রামপাল সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা হইয়াছে। সেই রামপালও মুন্সীগঞ্জের অধীন। অনেকে অনুমান করেন, এক কালে পালবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল রামপালে। সেন বংশীয়েরাও শেষের দিকে এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রদেব নামে চন্দ্রবংশীয় এক রাজার একখানি তাম্রশাসন এখানে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং রামপাল

যে হিন্দু যুগে একটি সুসমৃদ্ধ স্থান ছিল এ সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভাওয়াল—পূর্ববঙ্গের জমিদারগণের মধ্যে এক কালে ভাওয়ালের চৌধুরী বংশ ছিল সুবিখ্যাত। এই বংশের রাজা কালীনারায়ণ এবং রাজেন্দ্রনারায়ণের নাম বিদ্যোৎসাহী হিসাবে স্মরণীয়। ভাওয়ালের জমিদারীর অধিকাংশই ছিল বনে পরিপূর্ণ। এই বন হইতে তাঁহাদের প্রচুর আয় হইত। চৌধুরীদের বাসস্থান জয়দেবপুর গ্রামটি বহু বৃহদায়তন অট্টালিকা, মন্দির প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ।

স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস এই জয়দেবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ জেলা

ময়মনসিংহ জেলা আয়তনের দিক হইতে অতি বিশাল, কিন্তু ইহার প্রাচীন ইতিহাস তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

এককালে এই জেলার অধিবাসীরা অতি সুন্দর পল্লীসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। বাহিরের জগৎ এই পল্লীগাথার কোন সংবাদই জানিত না। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এগুলি সংগ্রহ করিয়া যখন প্রকাশ করিলেন তখন বাঙলাদেশের পাঠক সমাজে অপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকেরাও কত উচ্চ ভাবপূর্ণ কথা অতি সহজ সরল ভাষায় গানের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে পারে তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ময়মনসিংহ গীতিকা।

ময়মনসিংহ শহর—ময়মনসিংহ জেলা আকারে বিশাল হইলেও শহরটি কিন্তু তেমন বড় নয়। তবে ইহা একটি বড় রেলওয়ে জংসন এবং বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানকার আনন্দমোহন কলেজ বিখ্যাত দেশনায়ক আনন্দমোহন বসুর পবিত্র স্মৃতি বহন করিতেছে। বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিদ্যাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

অশোকাষ্টমীর শুভ দিনে ময়মনসিংহে বহু লোক ব্রহ্মপুত্র স্নানের জন্য সমবেত হয়।

ময়মনসিংহ শহরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরিয়া একটি রাজপথ শহরের পাশে পাশে চলিয়াছে। এখান হইতে অপর পারের দৃশ্য এতই মনোরম যে নিতান্ত অরসিকের মনও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

আজকাল ব্রহ্মপুত্র কখনও শুষ্ক থাকে, আবার কখনো তাহা তাণ্ডব নৃত্যের ছন্দে মাতিয়া ওঠে। কিন্তু এককালে বারো মাসই ইহার তর্জন-গর্জন শোনা যাইত।

সিংহজানি—ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে আসামের দিক হইতে সন্ন্যাসীরা দল বাঁধিয়া আসিয়া ময়মনসিংহ জেলার নানাস্থানে যথেচ্ছ অত্যাচার করিত। নিরস্ত্র অধিবাসীরা বহুদিন নিরুপায় ভাবে নীরবে ইহাদের অত্যাচার সহ্য করিল। অবশেষে গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে ইংরেজ সরকারের নিকট প্রতিকারের দাবী জানাইল। ইহার ফলে সিংহজানিতে স্থাপিত হইল একটি সেনানিবাস। সেনাদলের কঠোর শাসনের ফলে সন্ন্যাসীদের উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। যে বৎসর সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয় (১৮৫৭) সে বৎসর এই সেনানিবাসটি তুলিয়া লওয়া হয়।

ময়মনসিংহের একটি মহকুমা শহরের নাম জামালপুর। জামালপুরের সদর শহরটি স্থাপিত হইয়াছে সিংহজানিতে।

সিংহজানি হইতে প্রায় আট মাইল দূরে গড় জরিপা নামক স্থানে একটি বিরাট প্রাচীন গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, কোচরাজ দলীপ সিংহ এই গড়টি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

টাঙ্গাইল—ইহা ময়মনসিংহ জিলার অন্যতম মহকুমা শহর। টাঙ্গাইলের খ্যাতি ইহার উৎকৃষ্ট তাঁতের শাড়ীর জন্য। এই শাড়ীর রঙ্ যেমন সুন্দর তেমনি পাকা।

পদ্মাপুরাণের লেখকের জন্মভূমি—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নীলগঞ্জ স্টেশন হইতে মাত্র আধ মাইল দূরে পাতী-পাতুয়ারী গ্রাম। এই গ্রামেই কবি দ্বিজ বংশীদাস ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। ইঁহার রচিত পদ্মাপুরাণ একখানি সুবৃহৎ অথচ সুখপাঠ্য কাব্যগ্রন্থ। ইহা ময়মনসিংহের হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক উৎসবাদিতে সশ্রদ্ধভাবে আদ্যন্ত গীত হয়। দ্বিজ বংশীদাস সুগায়ক ছিলেন। 'তিনি গ্রামে গ্রামে লোকসঙ্গীত এবং গাথা গাহিতেন। শোনা যায়, দ্বিজ বংশী একবার ডাকাতের হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা যখন দ্বিজ বংশীর সুললিত কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত শুনিল তখন তাহারা তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ময়মনসিংহ জিলার অনেক লোক দ্বিজ বংশীদাস রচিত পদ্মাপুরাণের গান গাহিয়া জীবিকা অর্জন করেন।

ময়মনসিংহের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী এই দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। কবি হিসাবে চন্দ্রাবতীর খ্যাতিও বড় কম নয়। রামায়ণ, কেনারামের উপাখ্যান, মলুয়া প্রভৃতি গ্রন্থ চন্দ্রাবতীর লেখা। চন্দ্রাবতীর কাব্য-গাথাগুলি বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

নেত্রকোণা—ইহা মগরা নদীর তীরবর্তী একটি মহকুমা শহর। এক কালে ইহার আশে-পাশে কতকগুলি পার্বত্য স্বাধীন রাজ্য ছিল। এগুলির মধ্যে সুসঙ, খালিয়াজুরী ও মদনপুরের নাম উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বহু গারো ও হাজং উপজাতির লোক ছিল।

পাট—ময়মনসিংহে প্রচুর পাট চাষ হয় এবং ইহা বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়।

গঞ্জ—ময়মনসিংহে অনেকগুলি গঞ্জ ও বন্দর আছে। যথা,— ঈশ্বরগঞ্জ, রায়ের বাজার, খালবোলা বাজার, কিশোরগঞ্জ, পিংনা প্রভৃতি।

জমিদার-প্রধান স্থান—ময়মনসিংহ জিলার মুক্তাগাছা, সেরপুর, গৌরীপুর, কালিপুর, মুক্তাগাছা, রামগোপালপুর, আঠারবাড়ী, প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ ছিলেন এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ সম্মানিত। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন যেমন প্রভূত ঐশ্বর্যশালী, তেমনি বদান্য এবং সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতানুরাগী।

ফরিদপুর জেলা

ভূষণা—ভূষণার অধিপতি মুকুন্দরায় ছিলেন দ্বাদশ ভৌমিকদের অন্যতম। ইনি অতিশয় তেজস্বী এবং ক্ষমতাশালী ছিলেন। বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে বারভূঞারা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, মুকুন্দরায় এই বিদ্রোহে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নবাব ইসমাইল খাঁ মুকুন্দরায়ের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়া তাঁহার সহায়তায় কামরূপ জয় করেন।

মুকুন্দরায়ের পুত্রের নাম সত্রাজিৎ। তাঁহারই নামে খুলনার সত্রাজিৎপুরের নাম হইয়াছে।

এককালে ভূষণার সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্প, গালা, কাগজ, মোম, তামা, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি এবং সোনারূপার কারুশিল্পের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিদ্যাসুন্দরে আছে—"বনাত মখমল পট্টু ভূষণাই" খাস। ভূষণার বিখ্যাত বস্ত্র 'খাসা' নামেই পরিচিত ছিল।

মুকুন্দরায়ের রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ বনে-জঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়াছে। তাহারই মধ্যে কোন রকমে জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে রণ-রঙ্গিণী দেবীর মন্দির, আর গোপীনাথ জীউর আখড়া।

ভূষণার আধ মাইল পূর্ব দিকে ফরিদপুরের অন্যতম বাণিজ্য-কেন্দ্র বোয়ালমারি বাজার।

কেদার রায়ের স্মৃতিচিহ্ন—বিখ্যাত গ্রাম নড়িয়ার নিকটে কেদারপুর গ্রামটি কেদার রায়ের স্মৃতি বহন করিতেছে। এখানে

কেদার রায় একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, পরিখা এবং ইঁট কাঠের স্তূপ এখনও পড়িয়া আছে। ইহার নিকটে নলতা নামক গ্রামে একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চল যে এক কালে জনাকীর্ণ এবং সমৃদ্ধ ছিল এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সীতারামের গড়—সীতারাম রায় ছিলেন ভূষণার অন্যতম রাজা। ভূষণা ফরিদপুরে, কিন্তু সীতারামের রাজধানী ছিল যশোহর-খুলনার অন্তর্গত মহম্মদপুরে। সীতারাম যখন শক্তি সঞ্চয় করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সীতারাম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অগণিত মুঘল বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ দিন সাফল্যের সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। ফলে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে হইল।

সীতারামের খ্যাতি কিরূপ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় লোক-গাথায়ঃ

ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গলা বাহাদুর।
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর॥
বাঘ মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খায়।
রামশ্যাম পুঁটলী বেধে গঙ্গাস্নানে যায়॥

পাংশা নামক গ্রামের নিকটে সীতারামের গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান।

ফরিদপুর—জিলার সদর ফরিদপুর মরা পদ্মা নামক একটি খালের উপর অবস্থিত। পদ্মার স্রোত এক কালে ফরিদপুরের পাশ দিয়াই প্রবাহিত ছিল, উহা মজিয়া যাওয়ার ফলেই মরা পদ্মার উৎপত্তি।

শহরের উত্তরে ফরিদ খাঁর দরগাহ্ দেখা যায়। ফরিদ খাঁ ছিলেন বিখ্যাত পীর। তাঁহার নাম অনুসারেই ফরিদপুর শহরের নামকরণ হইয়াছে।

ফরিদপুর পূর্বে ছিল একটি নগণ্য গ্রাম। এখানকার বনে একদল দুর্দান্ত দস্যুর আড্ডা ছিল। ইহাদের নেতা ছিল সবদার নামে এক রমণী। এই দস্যুদলের দমনের উদ্দেশ্যেই ইংরেজ সরকার এখানে প্রথম এক মহকুমা প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে মহকুমা পরিণত হইল সদরে। বলা বাহুল্য, দস্যুদল সম্পূর্ণরূপেই দমিত হইয়াছিল।

বাঙলার যে ক'জন সুসন্তান ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেসের) সভাপতির গৌরবজনক পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন দেশনায়ক **অম্বিকা চরণ মজুমদার** ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি জন্মগ্রহণ করেন এই ফরিদপুরে। তাঁহার নাম অনুসারে ফরিদপুর স্টেসনটির নাম হইয়াছে অম্বিকানগর।

জগদ্বন্ধু সুন্দর নামে এক ভক্ত সাধকের আশ্রম ছিল ফরিদপুরে।

ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজটির এক সময়ে যথেষ্ট সুনাম ছিল।

মাদারীপুর—ফরিদপুর জেলার সদর হইলেও মহকুমা শহর মাদারীপুরের প্রাধান্য উহা অপেক্ষা অনেক বেশী। বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবেও ফরিদপুর অপেক্ষা মাদারীপুরের গুরুত্ব বহুগুণ বেশী। মাদারীপুরের এক পাশে আড়িয়ল খাঁ নদী এবং আর এক পাশে কুমার নদ প্রবাহিত। ফলে এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। নদীর ভাঙ্গনে মাদারীপুর শহরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এই জন্য কিছুটা দূরে নূতন করিয়া শহর গড়িতে হইয়াছে।

বিখ্যাত বিপ্লবী পূর্ণ দাসের কর্মকেন্দ্র দীর্ঘ দিন ছিল এই মাদারীপুরে।

মাদারীপুরের নিকটে **চরমুগরিয়া** পাট ব্যবসায়ের একটি অতি বিখ্যাত কেন্দ্র।

মেঘা মিঞা ও রতিরামের কাহিনী:—মাদারীপুরের নিকটে ঘাটমাঝি গ্রাম। এখানকার জমিদার মেঘা মিঞা ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী। রতিরাম নামে তাঁহার কর্মচারী ছিলেন অতি চতুর।

তিনি মেঘা মিঞার জমিদারীর মধ্যে কিছুটা তালুক কিনিলে মেঘা মিঞা ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং রতিরামের সমুদয় সম্পত্তি লুটিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরীত। সুচতুর রতিরাম গোপনে গোপনে নিজের শক্তি বিস্ময়কর রকমে বাড়াইয়া মেঘা মিঞার সম্পূর্ণ জমিদারী লুটিয়া লইয়া নিজেই জমিদার হইয়া বসিলেন। মেঘা মিঞাকে তখন সপরিবারে পথে বসিতে হইল। তাই এ অঞ্চলে একটি প্রবাদ আছে—

মেঘা মিঞা চেগা হইল
বিধি হইল বাম
ঘাট মাঝি লুটিয়া লইল
বুড়া রতিরাম।

বাণীবহের চৌধুরী বংশ ঃ—বাণীবহ গ্রামের নাওয়ারা চৌধুরীদের খ্যাতিতে এককালে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। এই বংশের আদি পুরুষ সংগ্রামসিংহ ছিলেন জাতিতে রাজপুত। তিনি সম্রাট্ আওরঙজেবের অধীনে একজন সেনানায়ক ছিলেন। সেই সময়ে বাঙলা দেশে বৈদেশিক জলদস্যুদেব উৎপাত অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। সম্রাট আওরঙজেব তাহাদের দমন করার উদ্দেশ্যে এই সুবিখ্যাত সেনাপতিকে নাওয়ারা মহলের সর্বময় কর্তা করিয়া পাঠাইলেন। নাওয়ারা মহল পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। জলদস্যুদের আড্ডা ছিল এখানেই। সংগ্রামসিংহ এবং তাঁহার বংশধরগণ যোগ্যতার সঙ্গে দস্যুদের বশে রাখিয়াছিলেন। বংশানুক্রমে দীর্ঘদিন এ দেশে বাস করায় এই রাজপুত পরিবার কালক্রমে সম্পূর্ণরূপেই বাঙ্গালী হইয়া গেলেন। এই অঞ্চলে ইঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

গোয়ালন্দ ঘাট ঃ—ইহা পূর্ব পাকিস্তানের একটি বিখ্যাত রেল ও ষ্টীমার স্টেশন। এখান হইতে নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ঘাট, জগন্নাথ-গঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি নানাস্থানে যাওয়া যায়। এখানে নদীর (পদ্মার) ভাঙ্গন সর্বদাই লাগিয়া আছে। তাই এখানে স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ী

করিয়া বাস করা অসম্ভব। এই কারণে এখানে আছে শুধু অস্থায়ী ছোট ছোট চালাঘর। গোয়ালন্দে প্রচুর ইলিস মাছ পাওয়া যায়।

কোটালিপাড়া—কোটালিপাড়া ছিল হিন্দুযুগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে বহু অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক কারণে এই অঞ্চলের কোন কোন স্থানের মাটি বসিয়া যাওয়ায় কোটালিপাড়ার দুর্দিন দেখা দেয়। কিছু কাল পূর্বেও কোটালিপাড়া ছিল বহু সংস্কৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাসভূমি।

বাখরগঞ্জ জেলা

বাখরগঞ্জ জেলার ন্যায় নদীবহুল জেলা বাঙলা দেশেও বোধ হয় দ্বিতীয় আর একটি নাই। ইহার সর্বত্র জুড়িয়া রহিয়াছে অসংখ্য নদ নদী, খাল, বিল প্রভৃতি। তাই এই জেলার মাটিতে ফলে অফুরন্ত ধান, পাট প্রভৃতি।

পূর্বে এই জেলার সদর ছিল বাখরগঞ্জ। নবাবী আমলে এই অঞ্চল ছিল নিতান্তই অখ্যাত। আগা বখর খাঁ নামে জনৈক কর্মচারী এখানকার সর্বময় কর্তা হইয়া আসেন। তাঁহার নাম অনুসারেই এই গ্রামটির নাম হয় বাখরগঞ্জ। বৃটিশ আমলে ইহ জেলার সদরে পরিণত হয় এবং ইহার নামেই জেলার নাম হয় বাখরগঞ্জ। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে জেলার সদব স্থানান্তরিত হয় বরিশালে। তখন হইতে বাখরগঞ্জের পতন শুরু হয় এবং বরিশাল শহর ক্রমশঃ উন্নত হইয়া সমগ্র বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু জেলার নাম এখনও বাখরগঞ্জই রহিয়া গিয়াছে।

বরিশাল—কীর্তনখোলা নদীর তীরবর্তী এই শহরের সাধারণ দৃশ্য চিত্তাকর্ষক। ঝাউগাছ সমন্বিত নদী তীরের রাস্তাটির সৌন্দর্য

অনুপম। প্রত্যহ ভোরে ও সন্ধ্যায় বহু লোক এই রাস্তায় বেড়াইয়া অসীম তৃপ্তি অনুভব করে।

বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের খ্যাতি ছিল একসময়ে বাঙলার সর্বত্র। বরিশালের মুকুটহীন রাজা অশ্বিনীকুমার দত্ত স্বীয় পিতা ব্রজমোহনের নামে এই কলেজ স্থাপন করিয়া ইহার উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করেন। তিনি স্বয়ং এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন এবং ছাত্রদিগকে খাঁটি মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় মিশিতেন এবং বাক্য এবং কার্যদ্বারা তাহাদিগকে সংশিক্ষা দান করিতেন। অশ্বিনীকুমারের হাতে-গড়া এই সব ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে জীবনের নানাক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া উঠিয়া বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমারের সাহিত্য-প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। ইহার পরিচয় তাঁহার 'ভক্তিযোগ' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সমগ্র ভারতবাসী জানিল, অশ্বিনীকুমার শুধু শিক্ষাব্রতী ন'ন, সমাজসেবী ন'ন, উচ্চশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাও বটে। রাজরোষে পড়িয়া অশ্বিনীকুমারকে দীর্ঘকাল বৃটিশের কারার অন্তরালে যাপন করিতে হইয়াছিল।

বরিশাল বরাবরই শিক্ষার দিক্ হইতে অগ্রণী। এখানে এক সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বিদ্যালয়ও এখানে আছে, এখানকার মূকবধির বিদ্যালয়টির খ্যাতি বহুদূরবিস্তৃত।

বরিশাল একটি বিষয়ে বাঙলার অন্য সব জেলা অপেক্ষা পিছনে পড়িয়া আছে—এ জেলায় অদ্যাবধি কোন রেল-লাইন স্থাপিত হয় নাই, ইহার কারণ এই জেলার অসংখ্য নদ-নদী ও খাল প্রভৃতি।

রেল লাইন না থাকিলেও বরিশালের ন্যায় ষ্টীমার সার্ভিস আর কোথাও নাই। এ বিষয়ে বরিশাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

চন্দ্রদ্বীপের কথা—মুঘল যুগে বাখরগঞ্জ জেলা ছিল বাক্‌লার অন্তর্গত এবং তাহারও পূর্বে এই অঞ্চল চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলকে লোকে এখনও বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করে। এই চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এই:—মহাপ্রতাপশালী রাজা দনুজমর্দনদেবের গুরু ছিলেন বিখ্যাত তপস্বী চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী। এক সময়ে দনুজ গুরুকে সঙ্গে করিয়া নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একদা গভীর রাত্রে চন্দ্রশেখর শুনিতে পাইলেন কে যেন বলিতেছে—"আমি তোমাদের নৌকার তলদেশেই আছি। আমাকে এখনই উদ্ধার কর।" এই স্বপ্ন দেখা মাত্র চন্দ্রশেখর শিষ্য দনুজমর্দনকে ঘুম হইতে জাগাইয়া সব বলিলেন এবং তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "বৎস, তুমি এখনই দেবতার উদ্ধার কর।" গুরুভক্ত দনুজ তখনই জলে নামিয়া পড়িলেন এবং ডুব দিয়া দুইটি মূর্তি সংগ্রহ করিলেন, একটি কাত্যায়নী মূর্তি, অপরটি মদনগোপাল মূর্তি।

রাজগুরু চন্দ্রশেখরের নাম হইতেই নাকি চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি।

রাজা দনুজের কথা—রাজা দনুজের প্রতাপ ছিল অসামান্য। তিনি নিজ বাহুবলে উত্তরবঙ্গের পাণ্ডুয়া হইতে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বাঙলার নানাস্থানে তাঁহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মুদ্রার একপিঠে বাঙলা হরফে তাঁহার নিজের নাম লেখা অপর পিঠে লেখা—'চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য।'

দুঃখের বিষয় তাঁহার মৃত্যুর পরে আর কেহ রাজ্য পরিচালনা করার মত যোগ্যতা লইয়া সিংহাসনে বসেন নাই। ফলে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার বংশধরদের রাজ্যসীমা বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপেই সীমাবদ্ধ হয়।

তাঁহাদের রাজধানী ছিল কচুয়ায়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বংশের রাজা কন্দর্পনারায়ণ রাজধানী মাধবপাশাতে স্থানান্তরিত করেন।

কন্দর্পনারায়ণ ছিলেন বীর রাজা। তাঁহারই রাজত্বকালে বিখ্যাত পর্যটক র‍্যালফ্ ফিচ্ এদেশে আসেন। তিনি তাঁহার বিবরণীতে কন্দর্পনারায়ণের বীরত্ব ও সাহসিকতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র :—কন্দর্পনারায়ণের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার আটবৎসর বয়স্ক পুত্র রামচন্দ্র রাজা হন। প্রতাপাদিত্য বন্ধুপুত্র বামচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ কবিতেন। প্রতাপ নিজ কন্যাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রামচন্দ্র সানন্দে তাহাতে সম্মতি দিলেন। কিন্তু বিবাহেব পবে কোন এক কারণে রামচন্দ্র ও প্রতাপের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। ফলে প্রতাপ আপনার কন্যাকে নিজের কাছেই রাখিয়া দিলেন।

অনেক বৎসর পরে রাজকন্যা বিমলা প্রচুর অর্থ ও লোকজন লইযা পিতৃগৃহ হইতে স্বামী-গৃহেব উদ্দেশ্যে যাত্রা কবিলেন। কয়েক দিন পবে মাধবপাশার নিকটে 'আসিয়া বিমলার নৌকা লাগিল। চারিদিকে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, বৌঠাকুরাণী আসিয়াছেন। বিমলার আশা ছিল, এই সংবাদ শোনা মাত্র তাঁহার স্বামী অবশ্যই লোক-লস্কব লইয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য ছুটিয়া আসিবেন। কিন্তু এ কি, রাজবাড়ী হইতে একটি কাক-প্রাণীও আসিল না! বিমলার মন ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু বুদ্ধিমতী বিমলা ধৈর্য হারাইলেন না, নিজের মনের ভাবও কাহাবো নিকট প্রকাশ করিলেন না। এ দিকে প্রজারা সব দলে দলে আসিতে লাগিল বৌরাণীকে দেখিবার জন্য। নদীর তীরে তীরে সে যেন এক হাট বসিয়া গেল। দরিদ্র এবং ভিক্ষুকদের বৌরাণী টাকা-পয়সা, কাপড়, খাদ্য অনেক কিছুই দিতে লাগিলেন। সেখানে অচিরেই সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসিতে আরম্ভ করিল। এই হাটেব নাম হইল বৌঠাকুরাণীব হাট। কিছু দিন এইরূপে কাটিলে সব শেষে একদিন রামচন্দ্র স্বয়ং আসিলেন নিজ

রাণীকে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য। রামচন্দ্র ও বিমলার অবশিষ্ট জীবন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিয়াছিল। তাহাদের দুই পুত্র কীর্তিনারায়ণ এবং বাসুদেব ছিলেন বীর ও সদাচারী।

রায়ের কাঠি—বরিশালের অন্যতম মহকুমা শহর পিরোজপুর। পিরোজপুরের মাইল তিনেক উত্তরে রায়ের কাঠি গ্রামটি প্রাচীন এবং বিখ্যাত। রায়ের কাঠির রায়বংশ বাঙলা দেশের এক পুরাতন সম্ভ্রান্ত বংশ। ইহারা কায়স্থ বংশীয় জমিদার। ইহাদের উপাধি ছিল 'রাজা'। এই রাজবংশের আদি পুরুষ মদনমোহন রায় চব্বিশ পরগণা জেলার দেগঙ্গা নামক স্থান হইতে রায়ের কাঠিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

রায়ের কাঠিতে একটি পুরাতন কালীবাড়ী আছে। এই মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রুদ্রনারায়ণ রায় এই কালী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।

এই প্রাচীন জমিদার পরিবারের বাসভবনগুলি দেখিলে রাজবাড়ী বলিয়াই মনে হয়।

পাদ্রী শিবপুর—আগা বাখর খাঁর কথা আগেই বলিয়াছি। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে রাজবল্লভ বাখরগঞ্জ অঞ্চলের কর্তৃত্ব পাইলেন। রাজবল্লভ নিজ শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাণ্ডেল হইতে কয়েক ঘর পর্তুগীজকে বাখরগঞ্জের নিকটে শিবপুর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই পর্তুগীজদের বংশধরগণ আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে বাস করিতেছেন। ইহারা কথাবার্তা বলেন খাঁটি বরিশালী ভাষায়। এখানে তাঁহাদের একটি গীর্জা আছে। শিবপুরের ডোমিঙ্গো ডি সিলভা নামক জনৈক ধনী পর্তুগীজ ব্যবসায়ী দানশীলতার জন্য যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

সুজাবাদ—সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা যখন বাঙলার সুবাদার তখন মগদের উৎপাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য

তিনি বরিশাল হইতে মাইল পাঁচেক দূরে সুজাবাদ নামক গ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এখনও ঐ গ্রামে সুজা-নির্মিত কেল্লাটির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

লাখুটিয়া—বরিশালের মাইল পাঁচেক দূরে সুবিখ্যাত লাখুটিয়া গ্রাম। এই গ্রামের রায়েরা ছিলেন সুশিক্ষিত প্রগতিপন্থী ব্রাহ্মণ জমিদার। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত রাজচন্দ্র কলেজ (আর. সি. কলেজ) এক সময়ে সুবিখ্যাত ব্রজমোহন কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গণ্য হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (ডি. এল. রায়ের) অন্তরঙ্গ বন্ধু সুকবি দেবকুমার রায় এই বংশের সুসন্তান। এই পরিবারের ইন্দ্রলাল রায় প্রথম মহাযুদ্ধে বৈমানিক হিসাবে যোগ দেন এবং অতীব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার মাতা ছিলেন ইংরেজ মহিলা।

লাখুটিয়ায় ইঁহাদের বাসভবনটি দেখিবার মত।

শিকারপুর—বরিশাল শহর হইতে মাইল বারো-তেরো দূরে সুগন্ধা বা সুনন্দা নদীর তীরে শিকারপুর গ্রাম। প্রবাদ, এখানে দেবীর নাসিকা খসিয়া পড়িয়াছিল। এখানকার দেবী বিগ্রহ সুগন্ধা বা উগ্রতারা নামে পরিচিত। শিবরাত্রির দিন এখানে মহাসমারোহে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা হয় এবং বিরাট মেলা বসে।

পোনাবালিয়া—পোনাবালিয়ার শিবস্বয়ম্ভুর মন্দির সুবিখ্যাত। শিবরাত্রির দিন এখানে বিপুল জনসমাগম হয়।

এখানকার প্রাচীন জমিদার বংশীয় রায়চৌধুরীগণ সুশিক্ষিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এই বংশের অন্যতম কৃতী সন্তান।

গৈলা—ইহা একটি বৈদ্যপ্রধান গ্রাম। বিদ্যাবত্তার জন্য ইহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। এখানকার কবীন্দ্র কলেজ সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পূর্ববঙ্গে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। এ যুগের অন্যতম বিখ্যাত দার্শনিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই

গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবিকণ্ঠাভরণ ত্রিলোচন পণ্ডিতও ছিলেন এই গ্রামেরই অধিবাসী।

মনসামঙ্গল-রচয়িতা সুবিখ্যাত কবি বিজয়গুপ্তের জন্মস্থান ফুল্লশ্রী গৈলারই সংলগ্ন গ্রাম। ফুল্লশ্রীর মনসা-বাড়ী তীর্থস্থান সদৃশ।

চাঁদসী—বিখ্যাত বন্দর গৌরনদীর নিকটে চাঁদসী গ্রাম। চাঁদসীর দেশীয় চিকিৎসার যশঃসৌরভে একদিন চতুর্দিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। আজিও ভারতের নানা স্থানে চাঁদসীর ডাক্তার দেখা যায়। ইঁহারা অনেকেই চাঁদসী গ্রাম চোখেও দেখেন নাই। চাঁদসীর ডাক্তারদের প্রণালী অনুসারে ইঁহারা ক্ষতের চিকিৎসা করেন বলিয়াই ইঁহারা এই নামে পরিচিত।

কীর্তিপাশা—পূর্ববঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ঝালাকাঠি হইতে তিন মাইল দূরে কীর্তিপাশা গ্রাম। এই গ্রামের সুবিখ্যাত জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন রোহিণী কুমার রায়চৌধুরী। অমায়িকতা, বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, উদারচিত্ততা প্রভৃতি দুর্লভ গুণাবলীর জন্য ইনি জনগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহার নাম এক সময়ে বাখরগঞ্জ জেলায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। ইনি ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

কীর্তিপাশার এই জমিদার পরিবার সুশিক্ষিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মাহিলাড়া—অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্মস্থান বাটাজোড়ের সংলগ্ন মাহিলাড়া নামক গ্রামটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। এই গ্রামের কয়েকজন সুসন্তান পাণ্ডিত্যের জন্য ভারত-ব্যাপী প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ্ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

গাভা—এই গ্রামের ঘোষ-দস্তিদারগণ কৌলীন্যের জন্য সমগ্র বঙ্গের কায়স্থ সমাজে বিশেষ সমাদৃত। ইঁহাদের মধ্যে এমন কয়েক-জন পণ্ডিত আছেন যাঁহাদের খ্যাতি দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত।

বানরিপাড়া—এই গ্রামের গুহঠাকুরতাগণও কৌলীন্যের জন্য গাভার ঘোষদের ন্যায় সুবিখ্যাত। ইহাদের মধ্যেও কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত আছেন।

বানরিপাড়া গ্রামটি দেখিতে শহরের মত। রাস্তাঘাট ও বাড়ী-গুলি দেখিতে খুবই সুন্দর।

চাখার—খালিসাকোঠার নিকটবর্তী চাখার গ্রামটি ইদানীং বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। এই গ্রামে অবিভক্ত বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকের জন্ম হয়। তিনি এই গ্রামে নিজের নামে একটি কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। হক সাহেবের আনুকূল্যে চাখার নানা দিক্ হইতে বেশ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে।

বাখরগঞ্জ জিলার কলসকাঠি, জলাবাড়ী, বাসণ্ডা, উলানিয়া, চরাখদি প্রভৃতি জমিদার-প্রধান গ্রামগুলি এক সময়ে খুবই শ্রীসম্পন্ন ছিল। কিন্তু এখন এই গ্রামগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

মুকুন্দদাস—ববিশালের যাত্রা-গায়ক মুকুন্দ দাসের নাম এক সময়ে বাঙলার সবত্র সুপরিচিত ছিল। তিনি ছিলেন অশ্বিনীকুমারের হাতে গড়া মানুষ। তাঁহার যাত্রা গানের মধ্য দিয়া দেশভক্তির উদাত্ত মন্ত্র শুনিতে পাওয়া যাইত। বাংলা দেশে মুকুন্দ দাসের যাত্রার তাই এত সমাদর ছিল।

সোনার বাঙলা

পূর্ব পাকিস্তান (২)

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম জিলা

চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী অনেকগুলি মত আছে। এখানে কয়েকটি মতের উল্লেখ করা হইল।

(১) চট্টগ্রাম অঞ্চলে সর্বপ্রথম আসিয়া যাঁহারা বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা চট্টভট্ট নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের নাম হইতে চট্টল এবং চট্টল হইতে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২) চট্টগ্রাম অঞ্চলে সর্বপ্রথম যাঁহারা আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন তাঁহাদের আদি বাস ছিল সপ্তগ্রামে। তাই তাঁহারা মাতৃভূমির নামে এখানকার নাম দিলেন সপ্তগ্রাম। কয়েক শত বৎসর পরে এই সপ্তগ্রাম বিকৃত হইয়া চপ্টগ্রামে গিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার পরে অপভ্রংশ হইয়া চট্টগ্রাম হইল।

(৩) এই অঞ্চলে ছিল বহু বৌদ্ধের বাস। তাহারা এখানে অনেকগুলি চৈত্য, বিহার প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ইহার নাম দিয়াছিলেন চৈত্য গ্রাম। এই চৈত্যগ্রামই কালক্রমে চট্টগ্রামে পরিবর্তিত হইল।

চট্টগ্রামের পূর্ব ইতিহাস—মুসলমান বিজয়ের পূর্বে চট্টগ্রাম কখনও ছিল হিন্দু ত্রিপুরা-রাজের অধীনে এবং কখনও বা বৌদ্ধ আরাকান-রাজদের অধীনে। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ এই অঞ্চল জয় করিয়া লইলেন এবং ইহার নাম রাখিলেন ইসলামবাদ। কিন্তু তাহাদের এই বিজয়-গৌরব বেশীদিন স্থায়ী হইল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরাকানের বৌদ্ধ রাজা পুনরায় হৃতরাজ্য জয় করিয়া লন। এই বিজয়ী রাজা নাকি তখন বলিয়াছিলেন—চিৎ-ত-গর, অর্থাৎ তোমরা আর যুদ্ধ করিও না। যুদ্ধ করা অন্যায়। কাহারও কাহারও মতে এই চিৎ-ত-গর কথা হইতেই চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

চট্টগ্রাম শহরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—পূর্ব পাকিস্তানের শহর হিসাবে ঢাকার পরেই চট্টগ্রামের স্থান। বন্দর হিসাবে ইহার স্থান সকলের উপরে। সরকারী অফিস আদালত রেল কোম্পানীর বড় কার্যালয় দেশীয় এবং বিদেশীয় অধিবাসীদের বাসগৃহ সমিতিগৃহ প্রভৃতিতে চট্টগ্রাম অট্টালিকাময় বলিলেও চলে। কর্ণফুলী নদীর তীরে ছোট-বড় টিলা-সমন্বিত এই শহরটি দেখিতে ঠিক যেন প্রকৃতির খেলাঘরের মত।

দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ—চট্টগ্রামের সপ্ততলবিশিষ্ট নবগ্রহ মন্দিরটির সৌন্দর্য অনুপম। মন্দিরের উপর হইতে শহরের চারিদিকের দৃশ্য এবং পার্শ্বপ্রবাহিণী কর্ণফুলী নদীর উজ্জ্বল রূপ অতি সুন্দর লাগে।

শহরের অন্দর কিল্লা পল্লীতে অবস্থিত জামে মস্‌জিদ একটি দেখিবার মত জিনিস। নবাব সায়েস্তা খাঁর পুত্র উমেদ খাঁ এই মস্‌জিদটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মস্‌জিদের অভ্যন্তর ভাগ কতকটা দুর্গ বা কিল্লার অনুকরণে গঠিত।

শহরের ছোট একটি পাহাড়ে অবস্থিত চট্টেশ্বরী মন্দিরটির শোভা দর্শকের নয়ন-মন মুগ্ধ করে। চট্টগ্রাম কলেজ, মাদ্রাসা, বৌদ্ধ বিহার প্রভৃতিও দেখিবার মত।

চট্টগ্রামের সুসন্তান—চট্টগ্রামে বহু দেশপ্রেমিকের আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহাদের নাম অবিস্মরণীয় তাঁহাদের মধ্যে জননায়ক দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্থান নিঃসন্দেহে অতি উচ্চে। যতীন্দ্রমোহনের জন্মভূমি চট্টগ্রাম। তাঁহার পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্তও যশস্বী ব্যক্তি ছিলেন। 'পলাশীর যুদ্ধে'র অমর কবি নবীনচন্দ্র সেন এবং কবি শশাঙ্কমোহন সেনও চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান ছিলেন।

চন্দ্রনাথ—চন্দ্রনাথ হিন্দুদের প্রধান তীর্থসমূহের অন্যতম।

* কর্ণফুলী নদীর মোহানা হইতে চট্টগ্রামের দূরত্ব মাত্র ১০ মাইল।

চট্টগ্রাম জংসন হইতে তেইশ মাইল দূরে সীতাকুণ্ড স্টেশনে নামিয়া মাইলখানেক গেলেই চন্দ্রনাথ পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর সুবিখ্যাত চন্দ্রশেখর শিব মন্দির। চন্দ্রশেখরের পাশের চূড়ায় অবস্থিত বিরূপাক্ষদেবের মন্দির। আগে চন্দ্রশেখরের মন্দির দ্বারে পৌঁছিবার অসুবিধা ছিল অনেক। বহু তীর্থযাত্রী সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল রাস্তায় টাল্ সামলাইতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তবুও পুণ্যাকাঙ্ক্ষী যাত্রীদল এই দুর্গম পার্বত্য পথে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে দেবতার দর্শন-লাভের জন্য। বর্তমানে সে অসুবিধা নাই—পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কাটিয়া পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাসকুণ্ড—চন্দ্রনাথের মন্দিরে পৌঁছিবার পথে শত শত সোপান অতিক্রম করিতে হয়। উঠিবার পথে অনেকগুলি তীর্থ আছে। প্রথমেই পড়ে ব্যাসকুণ্ড। এই ব্যাসকুণ্ডের পশ্চিম তীরের একটি মন্দিরে ব্যাসেশ্বর শিব, ভৈরব, চণ্ডিকাদেবী এবং ব্যাসদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

ব্যাসকুণ্ডের পরেই একটু উঠিয়া গিয়া হনুমান মন্দির। হনুমান মন্দির হইতে কিছু দূর নামিয়া গেলেই সীতাকুণ্ড। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে যখন এখানে আসেন তখন মহর্ষি ভার্গব সীতার স্নানের জন্য এই সীতাকুণ্ড কাটাইয়া দেন। এখানকার মন্দিরে সীতাদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহার নিকটেই রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড এবং মন্মথ নদ।

সীতাকুণ্ড ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া গেলে পথে ভবানী দেবীর মন্দির। ইহা একটি পীঠস্থান। কথিত আছে এখানে সতীর দক্ষিণ বাহু আসিয়া পড়িয়াছিল। এই স্থান হইতে আরও খানিকটা উঠিয়া গেলে স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির।

এই স্বয়ম্ভূনাথের প্রকাশ সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে এক রজক বাস করিত। তাহার নাম ছিল শম্ভু।

শম্ভুর একটি কপিলা গাভী ছিল। তাহাকে শম্ভু দিবারাত্র আদর-যত্নে লালন পালন করিত। গাভীকে সে প্রচুর খাইতে দিত কিন্তু তবুও গাভীটির নাকি পেট ভরিত না। তাই সে পলাইয়া পাহাড়ের নির্জন প্রান্তরে চলিয়া যাইত। রাত্রের আগে সে বাড়ী ফিরিত না। দিনের পর দিন এরূপ চলিলে শম্ভু সঙ্কল্প করিল, গাভীটি কোথায় যায় দেখিতে হইবে। একদিন গাভীটিকে অনুসরণ করিতে করিতে সে পাহাড়ের এক জনবিরল প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করিল, গাভীটি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার স্তন হইতে একটি শিলার উপর দুধ ঝরিয়া পড়িতেছে।

সেই রাত্রেই শম্ভু স্বপ্নে দেখিল যে স্বয়ম্ভুনাথ বলিতেছেন—তোর গাভী আমাকেই দুধ দেয়। পর দিন হইতে শম্ভু স্বয়ম্ভুনাথের পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিল। তারপর লোকমুখে এই ঘটনার কথা ত্রিপুরার রাজার কানে গিয়া পৌঁছিল। তিনি শম্ভুকে ডাকিয়া সমস্ত শুনিয়া স্বয়ম্ভুনাথকে নিজ রাজ্য মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু স্বয়ম্ভুনাথ তাঁহাকে স্বপ্নে নিষেধ করিলেন। তখন ত্রিপুরেশ্বর সেখানেই স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন এবং প্রচুর দেবত্র সম্পত্তি এই দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন।

স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির হইতে কিছুদূর নামিয়া গেলে গয়াকুণ্ড। অনেকে গয়াকুণ্ড পর্যন্ত নামিয়া যায় না। ফিরিবার পথে এই ধার দিয়া নামা সুবিধা। এই ধার দিয়া চন্দ্রনাথে উঠিবার পথ অত্যন্ত খাড়াই।

উনকোটি শিব ও বিরূপাক্ষের মন্দির—সোজা যে পথটি পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা ধরিয়া চলিলে উনকোটি শিব এবং বিরূপাক্ষ দেবের মন্দির পথেই পড়ে। বিরূপাক্ষের পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং তাহার দু' পাশে নামিয়া গিয়াছে পাহাড়ের অতল তল। এই পথ দিয়া চলিতে গেলে অতি বীরেরও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। চন্দ্রনাথের পথটি অবশ্য সুগম।

চন্দ্রনাথের মন্দির—চন্দ্রনাথের উপর উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলে অন্তরে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয়। একদিকে চঞ্চল সমুদ্রের অনন্ত নীলিমা, আর এক দিকে সবুজ বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন সু-উচ্চ পর্বতের মহান্ ধ্যানমগ্ন মূর্তি।

শিবরাত্রির সময়ে চন্দ্রনাথে যে মহামেলা হয় তাহাতে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইত।

চন্দ্রনাথ বৌদ্ধদের নিকটও বিশেষ পবিত্র তীর্থ রূপে বিবেচিত। এখানে নাকি বুদ্ধদেবের অঙ্গুলির অস্থি সমাহিত আছে। একটি পাথর দেখাইয়া বলা হয়, উহাতে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে।

চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে যে মেলা হয় সেটি বৌদ্ধদেরই মেলা। এখানে বুদ্ধ কূপ নামে যে কুণ্ড আছে তাহাতে বৌদ্ধেরা আত্মীয়-স্বজনদের অস্থি ফেলিয়া দিয়া যায়।

সীতাকুণ্ডের পরেই বাড়বাকুণ্ড স্টেসন। এখানেও কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি রহিয়াছে। বাড়বা কুণ্ড নামক কুণ্ডের জলের উপর নিয়তই দেখা যায় একটি অগ্নিশিখা নাচিয়া বেড়াইতেছে। ইহাই নাকি মহাদেবের তৃতীয় নয়ন। যাত্রীরা এখানে আসিয়া মহাদেবের তৃতীয় নয়ন দেখিয়া যায়। বাড়বা কুণ্ডের জল সর্বদাই উষ্ণ। বাড়বা কুণ্ডটি আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার গভীরতা অতলস্পর্শী।

আদিনাথ:—চট্টগ্রাম হইতে প্রায় পঁচাত্তর মাইল দূরে আদিনাথ তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। মহিশাখালি নদী এবং বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমের নিকটবর্তী একটি দ্বীপে মৈনাক পাহাড়ের উপর আদিনাথের মন্দির। চট্টগ্রাম হইতে স্টীমারে করিয়া গেলে আদিনাথ পৌঁছিতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে।

কথিত আছে একদিন জনৈক মুসলমান কৃষক একটি উজ্জ্বল শিলাখণ্ড পাইয়া উহা সাগ্রহে তুলিয়া লইল। সে মনে করিল অস্ত্রপাতি শান দিবার পক্ষে উহা বেশ কাজে লাগিবে। সে পথে উহা দিয়া আরাম করিয়া পা চুলকাইল। সেদিন রাত্রেই সে এবং

তাহার স্ত্রী বহু দুঃস্বপ্ন দেখিল এবং পর দিন ভোরে তাহাদের একমাত্র সন্তান বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গেল। কৃষক ভয় পাইয়া গ্রামের জমিদারের বিধবা গৃহিণীর নিকট অকপটে সব কথা জানাইল। জমিদার গৃহিণী সহজেই বুঝিতে পারিলেন ঐ শিলা-খণ্ডটি নিশ্চয়ই কোন দেবতা হইবেন। তাই তিনি উহা আপনার গৃহে আনাইয়া সযত্নে রাখিলেন। রাত্রে দেবতা তাঁহাকে স্বপ্ন যোগে বলিলেন—'আমি আদিনাথ শিব। রাবণের স্কন্ধে চাপিয়া এদেশে আসিয়াছি। আমার আবাসস্থল ঐ মৈনাক পাহাড়ে। এতদিন আমি গুপ্তভাবে ছিলাম। এখন তোমরা যখন আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছ তখন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে আমাকে রাখ।'

এই জমিদার পরিবারের চেষ্টায় অচিরেই আদিনাথের মন্দির নির্মিত হইল এবং তীর্থযাত্রীদের সমাগমও শুরু হইয়া গেল।

শিবরাত্রিতে চন্দ্রনাথ দর্শন করিয়া যাত্রীরা দলে দলে আদিনাথের মন্দিরে চলিয়া আসে। এখানে এই সময়ে আট দিন ধরিয়া মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে মগ অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী। ইহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এখানকার বুদ্ধমূর্তিটি বিশাল। এতবড় পিতলের বুদ্ধ-মূর্তি বাঙলা দেশে আর কোথাও নাই। আদিনাথের নিকট সমুদ্রতীরবর্তী শহর কক্সবাজার। কক্সবাজার চট্টগ্রাম জিলার অন্যতম মহকুমা।

কক্সবাজারের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। বহু লোক এখানে স্বাস্থ্যান্বেষণে আসে। এখানকার সামুদ্রিক মৎস্যের কারবার বেশ বড়। এখানকার লুঙ্গী অতি উৎকৃষ্ট।

কর্ণফুলী পরিকল্পনা—কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তি চট্টগ্রাম পাহাড়ে। ইহার অববাহিকায় বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ১৫০ ইঞ্চি। ফলে এখানে মাঝে মাঝেই প্রবল বন্যা হইয়া দারুণ অনিষ্ট সাধন করিত। পাকিস্তান সরকার তাই কর্ণফুলী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহার ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আশী হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎও উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশই বনে-জঙ্গলে এবং পাহাড়-পর্বতে সমাচ্ছন্ন। এই সব বন জারুল, গর্জন প্রভৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। ইহা ছাড়া এই সব বনে অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় বাঁশ এবং বেতও প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যে অসংখ্য বাঘ, গণ্ডার, মহিষ, হাতী এবং পাহাড়িয়া সাপ অবাধে বিচরণ করে। এই অঞ্চলে যে জাতীয় মানুষ বাস করে তাহাদিগকে বলে চাকমা এবং টিপরা।

এখানকার সাধারণ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এক মাত্র কার্পাস তুলাই উল্লেখযোগ্য। এই জেলার প্রধান এবং একমাত্র শহর রাঙ্গামাটি।

ত্রিপুরা জিলা

কুমিল্লা—ত্রিপুরা জিলার সদর এবং প্রধান শহর কুমিল্লা। গোমতী নদীর তীরস্থ এই শহরটি যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি অন্য নানা কারণেও বিখ্যাত। এখানকার ভিক্টোরিয়া কলেজ বাঙলা দেশের একটি উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষায়তন।

কুমিল্লার জগন্নাথের মন্দিরটি দেখিবার মত। ইহা সু-উচ্চ। এই মন্দিরের নিকটেই সপ্তরত্ন মন্দির। ইহাও দেখিবার মত। কুমিল্লায় রথযাত্রার সময়ে পূর্বে খুব সমারোহ হইত। এখানকার এই উৎসব সাড়ে তিন শত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। কুমিল্লায় কয়েকটি বিখ্যাত ব্যাঙ্ক এবং বড় বড় দীঘি আছে*।

কুমিল্লার নিকটে ময়নামতী পাহাড়। এখানকার সার্ভে স্কুলটির খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত।

---

*কুমিল্লা সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটা কথা আছে Comilla is a city of banks and tanks.

পাকিস্তান সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে ময়নামতী পাহাড়ে খনন কার্য চালাইবার ফলে এক সুপ্রাচীন অথচ অতি সমৃদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

লাকসাম—ইহা একটি বিখ্যাত রেলস্টেসন। এখান হইতে একটি শাখা-রেলপথ চাঁদপুর এবং আর একটি পথ নোয়াখালীর দিকে চলিয়া গিয়াছে।

লাকসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভ্রমণকারীদের মনে অপার আনন্দের সঞ্চার করে। সর্বানন্দ ঠাকুরের সুবিখ্যাত আশ্রম লাক্‌সাম হইতে প্রায় বারো মাইল দূরে অবস্থিত। এই সিদ্ধ সাধকের আশ্রমপীঠ মেহারের কালীবাড়ীতে।

ত্রিপুরা জিলার শীতলপাটি, হুঁকা, বেত এবং বাঁশ প্রসিদ্ধ। ময়নামতীর চারখানা তাঁতের কাপড়েরও যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

ব্যবসায় প্রতিভা—ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে কুমিল্লার কয়েকটি দত্ত পরিবার যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন সমগ্র বাঙলায় তাহার তুলনা নাই।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম বাঙলার সবত্র সুপরিচিত। তিনি ছিলেন কুমিল্লার অধিবাসী। কুমিল্লার অভয় আশ্রমের খ্যাতি ছিল এক সময়ে বাঙলার সবত্র।

ত্রিপুরার সুসন্তান—এই জিলার প্রবীণ জননায়ক হরদয়াল নাগ ছিলেন সর্বজনপূজ্য ব্যক্তি। তিনি অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশসেবা করার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান—চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবেড়িয়া এই জিলার দুইটি উল্লেখযোগ্য স্থান। চাঁদপুর স্টীমার ও রেল স্টেসন এবং বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ। ইহা মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। পাট ব্যবসায়ের ইহা একটি বিরাট কেন্দ্র।

নোয়াখালি জিলা

নোয়াখালি জিলা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র। এই জিলার অধিবাসীদের অধিকাংশই চাষ-আবাদ, অথবা সুপারি, চাউল প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া জীবিকা অর্জন করে। এই জিলার সোনাইমুড়ি ও চৌমুহানি সুপারির ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। চৌমুহানিতে একটি কলেজ আছে।

নোয়াখালি শহর—নোয়াখালি মেঘনা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। বর্ষাকালে এই নদীটি অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। বর্ষায় মেঘনা নদীতে বান ডাকে। এই অঞ্চলের লোকেরা উহাকে 'সব' বলে। তালগাছ প্রমাণ ঢেউ গড়াইতে গড়াইতে যখন সমুদ্র হইতে মেঘনা নদীর মধ্য দিয়া ছুটিয়া আসে তখন কী ভয়াবহ তাহার গর্জন, কী ভীষণ তাহার প্রচণ্ডতা! ঢেউএর মাথায় রজতশুভ্র কিরীট যেন ঝকমক করিতে থাকে।

নোয়াখালি শহর হইতে সমুদ্রের দূরত্ব খুব বেশী নয়, তাই এখানকার নদীর জল লোণা, পান করা অসম্ভব। সুতরাং টিউবওয়েল ও পুকুরের জলই একমাত্র ভরসা। কিন্তু উহার স্বাদও তেমন ভাল নয়। এই কারণে নোয়াখালিতে খুবই জলকষ্ট।

মাঝে মাঝে মেঘনার জোয়ারের জল উপছাইয়া আসিয়া শহরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই সময়ে লোকজনের কষ্টের সীমা থাকে না। পুকুরের জলে নদীর লোণা জল প্রবেশ করায় উহা পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

বিপদ এবং অসুবিধার শেষ এখানেই নয়। মেঘনার প্রবল ভাঙনের জন্য শহরের কোন না কোন অংশ প্রতি বৎসরই নিশ্চিহ্ন হইয়া নদীগর্ভে বিলীন হইতেছে। ইহার ফলে প্রায়ই গৃহস্থদিগকে গৃহহারা হইতে হয় এবং নূতন বাসস্থানের সন্ধান করিতে হয়।

এককালে নোয়াখালি শহর বেশ সুন্দর ছিল। এখানে বড় বড় পাকা দীঘি, ঘোড়দৌড়ের মাঠ ইত্যাদি অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু নদীর প্রচণ্ড ভাঙ্গনের ফলে শহরটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে।

নোয়াখালির নিকটবর্তী একটি স্টেশনের নাম মাইজদি। নোয়াখালির এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সরকারী অফিস, আদালত প্রভৃতি সব কিছুই সেখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখন প্রকৃতপক্ষে মাইজদিই জেলার সদর।

নোয়াখালির অপর নাম সুধারাম। সুধারাম মজুমদার নামক এক জমিদার কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম সুধারাম হইয়াছে। এই স্থানের প্রথম রাজা ছিলেন বিশ্বম্ভর শূর। তিনি নাকি মিথিলা হইতে আসিয়া ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্য স্থাপন করেন। এই বিশ্বম্ভরের বংশের লক্ষ্মণমাণিক্যের বিশেষ খ্যাতি আছে। তাঁহার বর্মের ওজন নাকি ছিল এক মণ। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় তিনি কিরূপ শক্তিমান ছিলেন। এই লক্ষ্মণমাণিক্য সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত 'বিখ্যাত বিজয়' মধ্যযুগের একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক। এই বংশের একটি বিশাল কামান আজও বাবুপুর গ্রামে দেখা যায়।

নোয়াখালি জিলা সমুদ্রের নিকটে বলিয়া এখানে প্রচুর নারিকেল ও সুপারি জন্মে। বাস্তবিকপক্ষে নোয়াখালির প্রধান সম্পদই হইল এই দুইটি জিনিস। নোয়াখালি জিলার লোকদের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়া উদ্বৃত্ত নারিকেল ও সুপারি নানা স্থানে চালান দেওয়া হয়।

নোয়াখালি জিলার মুসলমানগণ জাহাজ চালনায় সবিশেষ দক্ষ। এ বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ শুধু চট্টগ্রামের মুসলমানগণ।

গত ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালি জিলায় যে ভীষণ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় তাহার কথা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে। এই দাঙ্গায় শত শত নিরস্ত্র, অসহায় হিন্দু অতি নিষ্ঠুররূপে নিহত হয়,

সহস্র সহস্র হিন্দুর বাড়ীঘর ভস্মীভূত হয় এবং বিষয়-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। দারুণ ত্রাসে হিন্দুগণ আশ্রয়ের সন্ধানে বিভ্রান্তের ন্যায় চতুর্দিকে ছুটিতে থাকেন। এই দাঙ্গার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিদ্বেষ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিভিতে দীর্ঘ দিন সময় লাগিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধী এই নারকীয় ব্যাপারে অন্তরে এতটা আঘাত পাইয়াছিলেন যে, নিজের বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি নোয়াখালি যাত্রা করিলেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বেশ কিছু দিন বাস করিয়া তাহাদের হৃদয় পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রতিদিন পায়ে হাঁটিয়া উপক্রুত অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা তখনকার মত সফল হইয়াছিল।

রাজসাহী বিভাগ

বগুড়া জিলা

বগুড়া শহর—বগুড়া করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা প্রাচীন শহর নয়, আধুনিক শহর। এই শহরের যে অঞ্চলে কোর্ট (আদালত) অবস্থিত, সেখানে সাতটি রাস্তা আসিয়া মিশিয়াছে। এই স্থান **'সাত মাথা'** নামে পরিচিত। শহরের সরকারী এবং বে-সরকারী সকল প্রতিষ্ঠানই এই **সাত সড়কের** উপর অবস্থিত।

করতোয়া মাহাত্ম্য—পুরাণে আছে, মহাদেব এবং উমার বিবাহ-কালে গিরিরাজ হিমালয় নবদম্পতীকে আশীর্বাদ করিবার জন্য অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়াছিলেন। সেই মন্ত্রপূত জলের কয়েক বিন্দু ভূতলে পড়িয়াই নাকি করতোয়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং করতোয়া

পুণ্যতোয়া। শাস্ত্রে আছে বিশেষ বিশেষ লগ্নে করতোয়ায় স্নান করিলে পুণ্য হয়। পুণ্য হউক বা না হউক করতোয়ার তীরে গিয়া দাঁড়াইলে মনে যে আনন্দের শিহরণ জাগে এ কথা অতি সত্য।

বাঙলার প্রাচীন রাজধানী মহাস্থানগড়—আগেই বলিয়াছি মহাস্থানগড়ে মৌর্য যুগের একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মহাস্থান ছিল প্রাচীন পৌণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী। মহাভারতে এই রাজ্যের উল্লেখ আছে। বগুড়া হইতে সাত মাইল উত্তরে করতোয়ার পশ্চিম তীরে এখনও এই সুপ্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

চীন পরিব্রাজক হিউ এন সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিনি যখন পৌণ্ড্ররাজ্যে আসিয়াছিলেন তখন মহাস্থানগড়ের পরিধি ছিল পাঁচ মাইল। এই নগরী ছিল তখন জনবহুল এবং বহু ধনী ব্যক্তির পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত, অর্থাৎ সাত শ' বছর আগেও, মহাস্থান-গড়ে হিন্দু প্রভুত্ব ছিল। রাজা পরশুরামের রাজত্বকালে মুসলমানগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গে মহাস্থানগড়ের গৌরবজনক ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এখন মহাস্থানের মাটির বুকে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নাই। মহাস্থানের প্রাচীন দুর্গের অনেক স্থল এখনও বর্তমান। কালিদহ সাগর, শিলাদেবীর ঘাট, গোবিন্দ দ্বীপ, গোবিন্দের ভিটা এগুলি দেখিবার মত স্থান।

হিউ এন সাঙের বিবরণ পাঠে জানা যায়, তিনি মহাস্থান হইতে প্রায় চার মাইল দূরে গগনচুম্বী এক বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন। গোকুল গ্রামের 'গোকুলের মেঢ়' স্তূপটিও দেখিবার মত।

সুবিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ রামচরিতের লেখক সন্ধ্যাকরনন্দী এই মহাস্থানগড়েরই অধিবাসী ছিলেন।

বগুড়া জিলার সান্তাহার রেলওয়ে স্টেশনটি বিখ্যাত।

রাজসাহী জিলা

রাজসাহী জিলার সীমানা এককালে খুব বিস্তৃত ছিল। বর্তমান মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জিলার কিয়দংশও ছিল রাজসাহী জিলার অন্তর্ভুক্ত।

বাঙলার কয়েকটি প্রাচীন ও সুবিখ্যাত জমিদার-বংশের উত্থান ও পতন হয় এই রাজসাহী জিলায়। সুতরাং রাজসাহীর ইতিহাস বলিতে গেলে ইহাদের ইতিহাসও বলা প্রয়োজন।

রাজা উদয়নারায়ণ—রাজসাহীর জমিদার রাজা উদয়নারায়ণ ছিলেন যেমন তেজস্বী তেমনি দাম্ভিক। রাজস্বের হার লইয়া নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে তাঁহার বিরোধ শুরু হয়। পরে এই বিরোধ হইতে যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। প্রবলপ্রতাপ নবাবের সঙ্গে একজন জমিদার আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন কেন? তিনি পরাজিত হইয়া জমিদারী হারাইলেন। এই জমিদারীর ভার অর্পিত হইল নাটোর রাজবংশের হাতে। পরবর্তীকালে রাজসাহী পরগণার জমিদারী কতকগুলি খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। দিঘাপতিয়া, পুঁটিয়া এবং তাহেরপুরের জমিদার বংশ ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

নাটোর—প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর নাম শোনে নাই বাঙলা দেশে এমন লোক কেহ আছে কি? সেই রাণী ভবানী ছিলেন নাটোরের রাণী। নাটোর রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রামজীবন এবং রঘুনন্দন। তাঁহাদের পরে রামজীবনের দত্তকপুত্র রামকান্ত নাটোরের রাজা হন। তখন নাটোরের জমিদারের উপাধি ছিল 'অর্ধ-বঙ্গেশ্বর'। এই উপাধি হইতেই বোঝা যায় কী বিশাল ছিল নাটোরের জমিদারী। রামকান্ত অল্প বয়সেই মারা যান। তখন তাঁহার সুযোগ্যা বিধবা পত্নী রাণী ভবানী স্বহস্তে জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। রাণী ভবানীর অসীম দয়ার কথা বাঙলার আর্ত-আতুরেরা কখনও ভুলিবে না। ভারতের বহু

তীর্থস্থানে পুণ্যশীলা রাণী ভবানীর দানের নিদর্শন আজিও আছে। কাশীর দুর্গাবাড়ী রাণী ভবানীর কীর্তি। তিনি এক কাশীতেই তিন শ আশীটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রাণী ভবানী শুধু দান-ধ্যানই করিতেন না। তিনি অসামান্য দক্ষতার সহিত প্রজা-শাসন করিয়াও সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল দুর্জয়। তাঁহার বুদ্ধিও ছিল অতি তীক্ষ্ণ। তখন সবে-মাত্র ইংরেজ শাসন আরম্ভ হইয়াছে। দেশের সর্বত্র তখন চরম অরাজকতা। জন্মভূমিব এই নিদারুণ দুদশা দর্শনে তিনি প্রাণে দারুণ বেদনা অনুভব করিতেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে রাণী ভবানীর বিশাল জমিদারীর অধিকাংশই এই বংশের হাত-ছাড়া হইয়া যায় এবং বাকী সামান্য অংশও আবার গৃহবিবাদের ফলে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। নাটোরের প্রাচীন কীর্তির প্রায় সমস্তই ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

দিঘাপতিয়া—রাজা উদয়নারায়ণের ন্যায় দিঘাপতিয়ার রাজা সীতারামও ছিলেন অতি দুর্ধর্ষ-প্রকৃতির লোক। মুর্শিদকুলি খাঁ কোন কারণে তাঁহার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং নাটোরের দেওয়ান দয়ারামের সাহায্যে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। দিঘাপতিয়ার সমস্ত সম্পত্তিই তখন দয়ারামের চেষ্টায় নাটোরের অধিকারে আসে। নাটোরের রাজপরিবার দয়ারামের বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হইয়া দিঘাপতিয়ার জমিদারী এবং আরও প্রচুর ভূসম্পত্তি দয়ারামকে উপহার দেন।

এই দয়ারামের বংশধরগণই দিঘাপতিয়ার রাজা নামে বাঙলা দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন।

বৎসাচার্য এবং পুঁটিয়া—পুঁটিয়ার জমিদার বংশ প্রাচীন ও বিখ্যাত। আকবরের রাজত্বকালে এই বংশের আদি পুরুষ বৎসাচার্য ধর্মসাধনার জন্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সেনাপতি মানসিংহ

বাঙলায় পাঠান সর্দারদের দমন করিতে আসিয়া বৎসাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া মানসিংহ মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে জমিদারী দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বৎসাচার্য উহা গ্রহণ করিতে দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন। তখন মানসিংহ অগত্যা ঐ জমিদারী দান করেন তাঁহার পুত্র পীতাম্বরকে। জাহাঙ্গীরের আমলে পুঁটিয়ার জমিদার রাজা উপাধিতে ভূষিত হন।

নন্দনগাছি নামক স্টেসন হইতে চার মাইল দূরে পুঁটিয়া অবস্থিত। এখানকার জমিদারগণের প্রতিষ্ঠিত শিবসাগর দীঘিটি মনোরম। ইহার পার্শ্বেই ভুবনেশ্বর মহাদেবের পঞ্চরত্ন মন্দির। গোবিন্দ সরোবরের তীরে কারুকার্য-খচিত গোবিন্দদেবের মন্দির সুন্দর।

পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরীও বদান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

কালাপাহাড়—কালাপাহাড়ের নাম বাঙলা দেশে সুপরিচিত। তাঁহার প্রথম জীবনের নাম ছিল কালাচাঁদ ভাদুড়ি। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। কিন্তু অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস! উত্তরকালে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া শত শত হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করিয়া হিন্দুদের প্রাণে নিদারুণ আঘাত দিয়াছিলেন।

কালাপাহাড়ের জন্মভূমি এই রাজসাহীতে।

রাজসাহী শহর—রাজসাহী এই জিলার সদর। ইহা পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। এই শহরটির সৃষ্টি হইয়াছে রামপুর এবং বোয়ালিয়া নামক দুইটি গ্রাম মিলিয়া। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে রামপুরে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজেরা কুঠি নির্মাণ করিয়া রেশমের ব্যবসা করিত। ওলন্দাজদের কুঠিটির নাম ছিল বড় কুঠি। তাঁহাদের অধিকারে অনেকগুলি কামান ছিল।

রাজসাহীর সরকারী কলেজ ও পুঁটিয়ার রাণীর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ দেখিবার মত। রাজসাহীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান

'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির' চিত্রশালা। উত্তর বঙ্গের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের মাল-মসলা, যেমন তাম্রশাসন, শিলালিপি, মূর্তি, মুদ্রা প্রভৃতি এই বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গৃহেই সযত্নে রক্ষিত আছে। কয়েক বৎসর হইল এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

পাহাড়পুর—পাহাড়পুর সম্বন্ধে পূর্বেই কিছুটা বলিয়াছি। ইহা রাজসাহী জিলার জামালগঞ্জ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে। বর্তমানে ইহা সামান্য একটি গ্রাম মাত্র। কিন্তু এখানে মাটি খুঁড়িয়া যে সব পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মূল্য অপরিমেয়।

পাহাড়পুরে যে ধরণের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত কম্বোজ ও যবদ্বীপের মন্দিরগুলির শিল্প ও স্থাপত্যের তুলনা করিলে স্পষ্টই মনে হয়, কম্বোজে ও যবদ্বীপে পাহাড়পুরের শিল্পের আদর্শই গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং বাঙলা যে এককালে পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতার আদর্শ বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিল এরূপ অনুমান করিলে সম্ভবত তাহা ভুল হইবে না।

পাবনা জেলা

পাবনা নামের উৎপত্তি—কথিত আছে, সেকালে এখানে পাবনা নামে এক কুখ্যাত দস্যুর আড্ডা ছিল। এই দস্যু পাবনার নাম হইতেই নাকি শহর পাবনার নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন পতিতপাবনী গঙ্গার নাম হইতেই নাকি পাবনার এই নামকরণ হইয়াছে।

পাবনা শহর—পাবনা শহরটি নিতান্তই ছোট। এখানে কোন রেল স্টেশন নাই। পাবনায় যাইতে হইলে ঈশ্বরদী স্টেসনে নামিয়া আঠারো মাইল বাসযোগে যাইতে হয়। পাবনার এড্ওয়ার্ড

কলেজটি বেশ বড়। শহরের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত জোড়া বাঙলার মন্দিরটি এক সময় দেখিবার মত ছিল। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। ভূমিকম্পের ফলে ইহার অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

পাবনার 'সৎসঙ্গ' এককালে একটি প্রসিদ্ধ ধর্ম ও শিল্পাশ্রমরূপে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রসিদ্ধ স্থান ও জ্ঞাতব্য বিষয়—বড়াল নদীর তীরস্থ **চাটমোহর** পাবনা জেলার একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে একটি অতি প্রাচীন মস্‌জিদ আছে। মস্‌জিদটির ভিতরকার প্রাচীর গাত্রে এবং মেঝেতে বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, এই মসজিদের মাল-মসলা সংগ্রহ করা হইয়াছে কোন হিন্দু মন্দির হইতে।

চাটমোহরের প্রায় আট মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত **হাঁড়িয়াল** নামক গ্রামটি এককালে শিল্প ও বাণিজ্যের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রেশম ও সূতী কাপড় ক্রয় করিয়া বাহিরে চালান দিবার জন্য এখানে একটি কুঠি নির্মাণ করিয়াছিল। এখানে জগন্নাথদেবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। হাঁড়িয়ালের প্রান্ত হইতে প্রসিদ্ধ **চলন-বিল** আরম্ভ হইয়াছে। এই বিলটি এককালে আয়তনে ৫২১ বর্গ মাইল ছিল। বর্তমানে পলি পড়িয়া বিলটি অনেক ভরাট হইয়া গিয়াছে। এখন ইহার আয়তন এক শ বর্গ মাইলের কিছু বেশী। আত্রাই নদীর জল এই বিলে আসিয়া পড়ে। চলন-বিলের পাশে পুরাতন ঘর বাড়ী, মন্দির প্রভৃতি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এককালে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ ছিল। হাঁড়িয়ালের মাইল চারেক দূরে **'সমাজ'** নামক স্থানে প্রাচীনকালের অনেকগুলি বৃহৎ পুকুর আছে। শোনা যায়, এখানে এককালে মুঘলদের কাছারি ছিল এবং মারিচপুর গ্রামে সেনানিবাস ছিল।

সিরাজগঞ্জ বন্দর—সিরাজগঞ্জ বন্দর পূর্ব পাকিস্তানের একটি প্রধান বন্দর এবং পাবনার একটি মহকুমা। ইহা যমুনার তীরে অবস্থিত। সিরাজগঞ্জ ঘাট হইতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়।

রংপুর জেলা

রংপুর শহর—রংপুর জেলার প্রধান শহর ও সদর রংপুর। ইহা ঘাঘট নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। কথিত আছে, ইহা ছিল কামরূপ-রাজ ভগদত্তের প্রমোদ-নগরী। তাই ইহার নাম হইয়াছে রঙ্গপুর বা রংপুর। সে যুগে রংপুর বাঙলার অংশ ছিল না, উহা ছিল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই জনশ্রুতি হয়ত সত্য হইতেও পারে। পরবর্তীকালে বাঙলার মুসলমান রাজারা রংপুর জয় করেন এবং উহা বাঙলার উত্তর সীমান্তে পরিণত হয়।

হবুচন্দ্র ও গবুচন্দ্র—

"স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ
অর্থ তার ভাবি' ভাবি' গবুচন্দ্র চুপ।"

রাজা হবুচন্দ্রের অদ্ভুত বিচার-পদ্ধতি এবং তাহার সুযোগ্য মন্ত্রীর উদ্ভট রকমের কল্পনা বাঙলা দেশে সকলেরই হাসিঠাট্টার খোরাক। সেই হবুচন্দ্র ছিলেন এই রংপুর জিলার উদয়পুরের রাজা।

ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে চরম অরাজকতা

বাঙলা দেশ যখন ইংরেজ অধিকারে আসে তখন এ অঞ্চলে শাসন-শৃঙ্খলা বলিয়া কিছু ছিল না। দেবী সিংহ নামে একজন দুর্দান্ত ইজারাদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হইল এবং চতুর্দিকে লুটপাট শুরু করিল। তাহাদের উপদ্রবের ভয়ে নিরীহ দরিদ্র প্রজারা গৃহ ছাড়িয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন

করিল। ইংরেজ সরকার বিপন্ন প্রজাদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না।

দেবী চৌধুরাণীর রঙ্গস্থল—এই দস্যুদল ভবানী পাঠক এবং মজনু শা নামে দুইজন দলপতির অধীনে দেশময় লুটপাট করিয়া বেড়াইত। আসল নেত্রী দেবী চৌধুরাণী বাস করিতেন বজরায়। তাঁহাকে লইয়া বাঙলা সাহিত্যের অমর উপন্যাস দেবী চৌধুরাণী রচিত হইযাছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই গ্রন্থখানি হইতে সেকালের বাঙলার বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ধারণা জন্মে।

সরকার অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে দেবী চৌধুরাণীকে দমন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও দেশের অশান্তি মেটে নাই। একদল সন্ন্যাসী এবং ফকির সে সময়ে দেশময় অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। ইহাদিগকে সায়েস্তা করিতে ইংরেজদিগকে রীতিমত বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাহারা আজ এখানে, কাল সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দস্যুতা করিত। তাহাদের হাতে থাকিত বন্দুক; সঙ্গে হাতী, উট, ঘোড়া সবই থাকিত। কাজেই তাহাদিগকে দমন করা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার।

নূতন শহর রংপুর--রংপুর শহরটি চার অংশে বিভক্ত—মাহিগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ধাপ ও লালবাগ। লালবাগ অংশটি স্টেসনের কাছেই অবস্থিত। এখানকার কারমাইকেল কলেজ ভবনটি সুদৃশ্য। কলেজটি পূর্ব বঙ্গের একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যামন্দির হিসাবে বিখ্যাত। রংপুরে প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন জগন্নাথ দেবের একটি মন্দির আছে। শহরের চারিদিকে প্রাচীন প্রাসাদোপম সৌধরাজি অধিবাসীদের পূর্বেকার ধন-সম্পদের পরিচয় দিতেছে। জৈন এবং শিখদের উপাসনা-মন্দির, জেলা বোর্ডের বাড়ী এবং উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ্ ভবনটি দেখিতে খুবই সুন্দর।

প্রাকৃতিক শোভা—রংপুর হইতে শীতের পরিষ্কার দিনে দূরস্থিত তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের অপূর্ব রূপ অতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। সে এক অপূর্ব, অবর্ণনীয় দৃশ্য।

তিস্তা—রংপুরের আর একটি প্রাকৃতিক সম্পদ্ তিস্তা বা ত্রিস্রোতা। পুরাণে গল্প আছে যে, পার্বতী কোন সময়ে দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া দানব কাতরভাবে শিবের কাছে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল প্রার্থনা করে। তখন মহাদেব ভক্তের প্রার্থনায় বিগলিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, পার্বতীর বক্ষ হইতে স্রোত প্রবাহিত হইয়া দানবের তৃষ্ণা নিবারণ করুক। সেই স্রোতই নাকি এই তিস্তা নদী বা ত্রিস্রোতা। তিস্তা ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মিশিয়াছে।* তিস্তার তীরে তিস্তা জংসন। ইহার নিকটে সিন্দুরমতীর মেলা নামে একটি মেলা বসে। এই সিন্দুরমতী যে কে ছিলেন তাহা অজ্ঞাত। ইহাকে লইয়া উত্তরবঙ্গে অনেক লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে।

কুড়িগ্রাম—ইহা রংপুর জিলাব একটি মহকুমা শহর। কুড়িগ্রামের এগারো মাইল দক্ষিণে বাহিরবঙ্গ নামক প্রসিদ্ধ মহাল। মুসলমান বিজয়ের পূর্বে এই অংশ কোচ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাহিরবঙ্গের নিকটে ওয়ারি নামক স্থানে বিখ্যাত গায়ক এবং সঙ্গীত-রচয়িতা গোপীচন্দ্রের বাস ছিল। গোপী-যন্ত্র বলিয়া যে বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত আছে তাহা নাকি গোপীচন্দ্রই প্রবর্তন করেন।

লালমণির হাট:—ইহা একটি বড় জংসন স্টেসন। এখানে একটি বড় রেলওয়ে উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে।

দিনাজপুর জেলা

দিনাজপুর শহর—ইহা দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমা, প্রধান শহর এবং রেলওযে জংসন। জনপ্রবাদ এই যে, দিনাজ বা দিনরাজ নামে কোনো ব্যক্তি দিনাজপুরের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহারই নাম অনুসারে স্থানটির নাম দিনাজপুর হইয়াছে। কাহারও

* তিস্তার প্রলয়ঙ্কর বন্যায় উত্তরবঙ্গ মাঝে মাঝেই বিধ্বস্ত হয়।

কাহারও মতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা গণেশ এই রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

পুনর্ভবা নদীতীরস্থ এই স্থানটি বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে এককালে প্রসিদ্ধ ছিল।

দিনাজপুরের রাজবাড়ীর প্রাসাদটি অতীব প্রাচীন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ইহার অনেক অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পরে অবশ্য সেগুলির সংস্কার করা হইয়াছে।

বাণগড় হইতে সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন কীর্তির ছোট-বড় মহামূল্যবান্ নিদর্শন এই রাজপ্রাসাদে সংরক্ষিত হইয়াছিল। প্রাসাদের সম্মুখে একাদশ শতাব্দীর একটি বৌদ্ধ চৈত্য। তাহাতে বুদ্ধের জীবনের চারিটি আশ্রমের কাহিনী চিত্রের সাহায্যে অঙ্কিত। নিকটেই একটি প্রাচীন শিব মন্দির ও কারুকার্যখচিত একটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভটি কষ্টি পাথরের তৈরী। এই স্তম্ভে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানা যায় ৮৮৮ শকাব্দে (৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) গৌড়ে যিনি রাজত্ব করিতেন তিনি কাম্বোজ বংশীয়। ঐতিহাসিকদের নিকট এই স্তম্ভটি অত্যন্ত মূল্যবান্।

বাণগড় হইতে দিনাজপুরে যে সব পুরাতত্ত্ব আনীত হইয়াছে তাহার মধ্যে পুরাতন পাথরে খোদাই-করা কয়েকটি চৌকাঠও দেখিবার মত। ইহার মধ্যে নাগদরওয়াজা নামক চৌকাঠটি দেখিয়া মনে হয়, ইহা যে মন্দিরের অংশ তাহার উচ্চতা ছিল অন্তত একশত ফুট।

দিনাজপুর শহর হইতে হিমালয়ের তুহিন গিরি শিখরের শুভ্রতুষার কিরীট দেখিতে পাওয়া যায়।

দিনাজপুর শহর হইতে মাইল চারেক দূরে সুবিখ্যাত রামসাগর সরোবর। দিনাজপুরের বারো মাইল উত্তরে কান্তনগরে একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। প্রবাদ এই যে, ইহা

মৎসরাজ বিরাটের দুর্গ ছিল। প্রায় এক মাইল জুড়িয়া এই দুর্গটির ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত।

কান্তনগরের কান্তজীর মন্দির একটি দেখিবার মত জিনিস। ইহার প্রাচীরে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী ছবি আঁকিয়া নিপুণ-ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

কুষ্টিয়া জেলা

পূর্বতন নদীয়া জেলার মেহেরপুর, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা, এই তিনটি মহকুমা লইয়া কুষ্টিয়া জেলা গঠিত হইয়াছে।

পদ্মানদী এই জেলাকে রাজসাহী ও পাবনা জেলা হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

সীমা—এই জেলার উত্তরে মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী ও পাবনা জেলা, পশ্চিমে নদীয়া জেলা, পূবে ফরিদপুর ও যশোহর জেলা এবং দক্ষিণে যশোহর জেলা।

উল্লেখযোগ্য স্থান

কুষ্টিয়া—কুষ্টিয়া শহর এই জেলার সদর। এখানকার মোহিনী মিল নামক কাপড়ের কলটির খ্যাতি সমগ্র ভারতময়। এই কলটির প্রতিষ্ঠাতা মোহিনী মোহন চক্রবর্তী।

দর্শনা—দর্শনা পাকিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেসন। রানাঘাট হইয়া পাকিস্তান যাইতে হইলে দর্শনাই পাকিস্তানের প্রথম রেলস্টেসন। এখান হইতে ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান শাখা উত্তর দিকে পোড়াদহ, ঈশ্বরদি, সান্তাহার ও পার্বতীপুর হইয়া হলদি-বাড়ী পর্যন্ত গিয়াছে। সম্প্রতি দর্শনা হইতে যশোহর পর্যন্ত একটি নূতন রেলপথ নির্মিত হইযাছে।

দর্শনায় একটি চিনির কল আছে।

খুলনা জেলা

খুলনার প্রাচীন নাম ছিল নয়াবাদ। ইহার খুলনা নামকরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটি শোনা যায়। ধনপতি সদাগরের দুই স্ত্রী ছিলেন, খুল্লনা আর লহনা। ধনপতি পত্নী খুল্লনার নামে এক কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেবীর মন্দিরের নাম রাখেন খুল্লনেশ্বরীর মন্দির। বেণীগঞ্জের কয়েক মাইল দূরে এই খুল্লনেশ্বরীর মন্দির। এই দেবী খুল্লনেশ্বরীর নাম অনুসারেই নাকি নয়াবাদের নাম খুলনা হইয়াছে।

খুলনা শহর : রূপসা ও ভৈরবের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত খুলনা শহর আধুনিক। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও মন্দ নয়। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের স্টিমার সার্ভিস আছে। খুলনার রেল স্টেশনটিও বেশ বড়।

এই শহরের গান্ধীপার্কটি দেখিতে খুবই সুন্দর। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামে এখানে একটি কাপড়ের মিল আছে।

সেনের বাজার : ভৈরবের অপর তীরে খুলনার ঠিক বিপরীত দিকে সেনের বাজার। জনপ্রবাদ এই যে, ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেন বংশের বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মণ সেন।

দৌলতপুর : দৌলতপুরও ভৈরবের উপর অবস্থিত। কয়েক বছর আগেও ইহা ছিল সাধারণ একটি গ্রাম, কিন্তু এখন ইহা একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সুপরিচিত। এখানকার প্রথম শ্রেণীর কলেজটির এক সময়ে যথেষ্ট সুনাম ছিল। তখন উহার নাম ছিল দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী। এখানে একটি কৃষি কলেজ এবং শিল্প-শিক্ষায়তন আছে।

দৌলতপুর হইতে বাঁশ, পাট, সুপারি, নারিকেল, শিমুল কাঠ, মাছ ও গুড় বাহিরে প্রচুর পরিমাণে চালান দেওয়া হয়।

মহেশ্বরপাশা—মহেশ্বরপাশা দৌলতপুরের সংলগ্ন গ্রাম। এখানে দুইশত বৎসরের প্রাচীন একটি মন্দিব আছে। ইহা জোড়-বাঙলা নামে পরিচিত।

সেনহাটি—সেনহাটির বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকেব বিশ্বাস, ইহারা আদি সেনবাজবংশ হইতে উদ্ভূত। এই গ্রামে কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সেনহাটির বৈদ্যগণ অতি উচ্চ শিক্ষিত বলিয়া বাঙলার সর্বত্র সম্মানিত।

ভরত ভায়না—এই গ্রামটি বুড়ীভদ্র নদীর সন্নিকটে অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন স্তূপ আছে। এখানকার লোকেরা এই স্তূপটিকে ভরত রাজার দেউল বলে। ইহারই নিকটে গৌবীখোলা নামক গ্রামে আব একটি ইটের ঢিবি আছে। উহা ভরত রাজার বাড়ী নামে পরিচিত। এই ভরত বাজা যে কে ছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না, তবে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে ভরত ভায়নার স্তূপটি বৌদ্ধ-যুগেরই হইবে। ইহা যে প্রাচীন বৌদ্ধ রীতিব নিদর্শন এরূপ মনে করার কারণ প্রাচীনকালে যশোহর খুলনা সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সমতটে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা বিদেশী পর্যটকগণও উল্লেখ করিয়াছেন।

বাগেরহাট—ইহা খুলনা জেলার অন্যতম মহকুমা শহর। ইহা ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে প্রচুর চাউল, সুপারি, নারিকেল ও মাছ বিভিন্ন অঞ্চলে চালান যায়।

বাগেরহাটের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহা-বিদ্যালয়। বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বাগেরহাটের অধিবাসী। এই কলেজটি তাঁহারই পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

বাগেরহাটেব শাড়ী এবং এখানকার উইভিং মিলের ছিটের কাপড়ের বেশ আদর আছে।

বাগেরহাটে পুরাকালের কীর্তিও কিছু কিছু আছে। এখানে গৌড়েশ্বর নসরৎ শাহের আমলের একটি মস্‌জিদ আছে। নসরৎ শাহের নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রাও এই বাগেরহাট হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাগেরহাটে খান জাহান আলির ও তাঁহার সময়ের কতকগুলি কীর্তি আছে। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল খান জাহান আলির দরগা। খান জাহান আলি ছিলেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের একজন ইসলাম ধর্মপ্রচারক। তিনি এই অঞ্চলে বাস করিতেন এবং বহু জলাশয় খনন করিয়া দেশবাসীর জলকষ্ট বিদূরিত করিয়াছিলেন।

শিব বাড়ী—বাগেরহাট হইতে চার মাইল দূরে শিব বাড়ী নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের শিবমন্দিরের শিব আসলে বুদ্ধ মূর্তি। মূর্তিটির মুখমণ্ডলে একটা শান্ত, সমাহিত ভাব। মূর্তির নীচে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধ মূর্তি ক্ষোদিত আছে। চারি পাশে বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা উৎকীর্ণ। জনশ্রুতি এই যে এই বুদ্ধমূর্তিটি খান জাহান আলির দরগার সম্মুখস্থ ঠাকুরদীঘি হইতে আবিষ্কৃত হয়। খান জাহান উহা জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। ব্রাহ্মণ উহা শিবমূর্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া যথানিয়মে উহার প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হইতে শিব-রূপেই উহার পূজা হইতে থাকে।

ঈশ্বরীপুর—ঈশ্বরীপুর গ্রামখানি ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল যশোহর। বাঙলার বারভুঞাদের মধ্যে যিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সেই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল এই যশোহরে। প্রাচীন যশোহর এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সেই দুর্গের মৃৎপ্রাকার এখনও আছে। এ ছাড়া প্রতাপের 'বারদুয়ারী' প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এবং তাঁহার মুসলমান কর্মচারীদের ভজনালয় 'টেঙা মস্‌জিদ' নামে একটি পুরাতন বৃহৎ মস্‌জিদও এখানে আছে।

প্রতাপ দেবী চণ্ডীর উপাসক ছিলেন। এই চণ্ডী যশোরেশ্বরী নামে খ্যাত। প্রতাপের সেই উপাস্যা দেবী চণ্ডীমূর্তি এখনও বর্তমান। এখানে চণ্ডভৈরব নামে আর একটি প্রাচীন বিগ্রহের মন্দির আছে। সম্রাট্ আকবর যখন মানসিংহকে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠান, তখন তিনি বিজয়ী হইবার মানসে এই চণ্ডভৈরবের মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

চালনা—পাকিস্তান সরকার চালনায় নূতন একটি বন্দর স্থাপন করিয়াছেন। এই বন্দর হইতে বিদেশে পাট চালান দেওয়া হয়।

যশোহর জেলা

যশোহর শহর :—এই শহরটি ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। ইহা প্রতাপের রাজধানী যশোহর নয়—সে যশোহর খুলনা জেলায়। যশোহরের খ্যাতি চিরুনির জন্য। এই চিরুনির আদর সর্বত্র।

ঝিনাইদহ :—ইহা নবগঙ্গার তীরে অবস্থিত একটি মহকুমা শহর। একসময়ে ইংরেজ নীলকরগণ এখানে নীল চাষ করিত। নীলকরদের কতকগুলি কুঠির ভগ্নাবশেষ এখনও ঝিনাইদহের এখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

সাহিত্য-তীর্থ সাগরদাঁড়ী—যে কবি মেঘনাধবধ মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, যিনি বাঙলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক সেই কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোহর জেলার কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্তী সাগরদাঁড়ী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদন এই কপোতাক্ষ নদীটিকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিতেন। পরিণত বয়সে যখন তিনি সুদূর ফ্রান্সে বাস করিতেছিলেন তখনও এই প্রিয় নদীটির কথা বারংবার তাঁহার মনে উদিত হইত। সেখানে বসিয়া এই নদীটি সম্বন্ধে তিনি একটি কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন ছাড়াও সাগরদাঁড়ীতে আর একজন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি মাইকেলের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু। এই মহিলা-কবির সাহিত্যিক মর্যাদা বড় কম নয়।

সাগরদাঁড়ী বাঙলা সাহিত্যের মহাতীর্থ।

কপিলমুনি—কপিলমুনি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে কপিলের নাম অনুসারে। এই কপিল মহর্ষি কপিল ন'ন। ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সাধক—পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবের ভ্রাতা। ভ্রাতার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তিনি দেশত্যাগ করিয়া এখানে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন সাধন-ভজনে অতিবাহিত করেন। তিনি এখানে একটি কালী মন্দির স্থাপন করেন। উহার নাম কপিলেশ্বরীর মন্দির।

কপিলমুনি বর্তমানে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার কাছেই আগ্রা গ্রামে কতকগুলি প্রাচীন ঢিপি আছে। এই স্তূপগুলি বৌদ্ধ-যুগের বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমিত হয়।

সীতারামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ—বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সীতারাম' রচিত হইয়াছে এই জেলার মহম্মদপুরের সীতারামের জীবনী অবলম্বনে। সীতারাম প্রথম জীবনে ছিলেন একজন সাধারণ ভূস্বামী। একদিন তিনি বিশেষ কার্যোপলক্ষে ঘোড়ায় চড়িয়া কোথাও যাইতেছেন। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার ঘোড়ার পা মাটির তলায় আটকাইয়া যায়। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ঘোড়ার পা মাটির তলা হইতে উঠানো সম্ভব হইল না। সীতারাম তখন বাধ্য হইয়া লোকজন দিয়া ঐ স্থানের মাটি খনন করাইলেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন ভূগর্ভস্থ এক মন্দিরের চূড়ায় তাঁহার ঘোড়ার পা আটকাইয়া গিয়াছে। আরও খনন করার পরে দেখিলেন, ঐ মন্দিরের দেবতা হইতেছেন লক্ষ্মীনারায়ণ। সীতারাম ভাবিলেন এই ঘটনার অন্তরালে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কোন শুভ ইঙ্গিত বর্তমান। তাই তিনি এখানেই বাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে অট্টালিকা নির্মাণ

করিলেন। দেশবাসী শীঘ্রই তাঁহার অসামান্য শৌর্য-বীর্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া অখণ্ড প্রতাপে শাসন করিতে লাগিলেন।

মহম্মদপুরে সীতারামের বহু কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। তাঁহার একটি দুর্গের ভগ্নাংশ, দোলমঞ্চ ও রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ, সিংহ দরওয়াজা, দশভুজার মন্দির এবং পঞ্চরত্নের মন্দির তাঁহার কীর্তির কিছুটা পরিচয় এখনও ঘোষণা করিতেছে। মহম্মদপুরের রামসাগর দীঘি এবং কৃষ্ণসাগর দীঘি তাঁহারই কীর্তি।

সীতারাম ছিলেন হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী। মুসলমান সেনাপতিদিগকে তিনি ভাই বলিয়া ডাকিতেন।

নড়াইল—যশোহরের অন্যতম মহকুমা শহর। এখানকার জমিদারদের এক সময়ে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

কালিয়া—খুলনা জেলার সেনহাটির ন্যায় কালিয়ার বৈদ্যগণও শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া বিখ্যাত। শিক্ষা-দীক্ষার দিক্ হইতে ইহারাও অত্যন্ত উন্নত বলিয়া বাঙলা দেশের সর্বত্র ইহাদের যথেষ্ট মর্যাদা।